জানা অজানা মহাফেজখানা

জানা অজানা মহাফেজখানা

উদয়ন মিত্র

অরুণা প্রকাশন

২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ এপ্রিল, ২০০০

প্রকাশক ঃ

শ্যামল ভট্টাচার্য্য
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন নং ঃ ২৩৫২ ৭৬৬৩/৯৩৩৯৮৩১২৮৫

লেজার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ

অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

ড. রামদুলাল বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বাঙালি জীবনের তো বটেই আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে রাজ্য মহাফেজখানায়। আমাদের দেশচেতনার নানা তরঙ্গ, সমাজ ও সময়ের ডাকে আমাদের পূর্বজদের সাড়া দেওয়ার সচেতনতার নানা পর্ব, আমাদের জ্ঞানচর্চা ও সত্যানুসন্ধানের বিরামহীনতার সাক্ষ্য তাদের চলনচিহ্ন রেখে গেছে মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নানা নথিপত্রে। অতীতনিষ্ঠা বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার অন্যতম উপায়। মহাফেজখানা-মনস্কতা সেই নিষ্ঠারই অন্যতম মাপকাঠি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা উদয়ন মিত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অনুরোধে এই রাজ্যের মহাফেজখানার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে মহাফেজখানার সংজ্ঞানির্ণয় থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য মহাফেজখানার গড়ে ওঠার বৃত্তান্ত, সেই গঠন ও বিকাশপর্বে নানা কৃতবিদ্য মানুষের কথা, মহাফেজখানায় গবেষণা করে যাঁরা এদেশের ইতিহাসচর্চাকে ঋদ্ধ করেছেন সেইসব বিদ্বজ্জনের কথা তথ্যনিষ্ঠভাবে লিখনবন্ধ করেছেন। গ্রন্থটির সঙ্গে সংযুক্ত হল দীর্ঘ পরিশিষ্টপর্ব। সেই পর্ব থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যেমন পাঠকের বিস্ময়বোধকে বিস্ফারিত করবে তেমনই মহাফেজখানার সংগঠনের নানা দিক বিষয়েও পাঠক অবহিত হতে পারবেন। এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন রাজ্য মহাফেজখানার অধিকর্তা অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। বাংলা আকাদেমির বিশেষ আপনজন এই কৃতবিদ্য মানুষটির স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সমগ্র গ্রন্থটির উপাদানে ও উপস্থাপনে গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, মহাফেজখানা-বিষয়ে তাঁর নিপুণ অধিকার এবং শ্রমনিবিড়তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। সাধারণ পাঠক যেমন আমাদের রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, সেখানে সংরক্ষিত বিপুলায়তন সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন, তেমনই প্রদর্শশালাবিদ্যার জ্ঞানার্থীদের কাছেও বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে এই গ্রন্থ।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

সূচি

ভূমিকা

অনেককাল আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *পাষাণের কথা* নামে একটা ছোট্ট বই লিখেছিলেন। লেখকের মতো তাঁর এই বইটাও বর্তমান প্রজন্মের অনেক পাঠকের কাছেই হয়তো বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মেদুর স্মৃতি। যে পাথুরে প্রমাণকে আশ্রয় করে তিনি নিজেই অনেক ভারী ভারী বই লিখেছিলেন, সেই পাথরেরও যে নিজের কিছু বলার আছে সেটা রাখালদাস উপলব্ধি করেছিলেন। এই আত্মকথনই ছিল *পাষাণের কথার* প্রধান উপজীব্য।

জানা অজানা মহাফেজখানা-র পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে হঠাৎ-ই যেন *পাষাণের কথা* নতুন করে মনে পড়ল। এ কথা সকলেই জানি যে মহাফেজখানা সরকারি নথিপত্রের একমাত্র সংগ্রহালয়। এখানে সরকারি নথি সংগৃহীত হয়, সংরক্ষিত হয়, গবেষকদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এইসব নথির সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে। সাধ্যমতো সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই অন্যান্য মহাফেজখানার মতো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 'আর্কাইভস'ও গড়ে উঠেছে। রক্ষণাবেক্ষণের এই কাজ সহজ নয়। তবু অনেক অসুবিধার মধ্যেও এখানকার আধিকারিক ও কর্মীরা প্রাচীন নথিপত্রগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যেহেতু, অন্যান্য রাজ্য মহাফেজখানার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের 'আর্কাইভস' অনেক পুরোনো, তাই সংরক্ষণের কাজটা এখানে অনেক দুরূহ। একটি বাড়িতে স্থান সংকুলান হয়নি, তাই তিনটে বাড়িতে ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় আড়াইশো বছরের বহু বিচিত্র সরকারি নথি। এইসব নথির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে একদিকে যেমন বাংলাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাহিনি, অন্যদিকে তেমনই এদেশে জনসমাজে সাম্রাজ্যবাদের অভিঘাতের কথিত-অকথিত নানা আলেখ্য। অতীতের বহু নির্ণায়ক ঘটনার নির্বাক অথচ বাঙ্ময় সাক্ষ্য হল এই সংগ্রহশালা। দীর্ঘকাল ধরে অনেক একনিষ্ঠ গবেষকই এখান থেকে সংগ্রহ করেছেন মণিমুক্তো। তাঁদের কারও কারও কথা উদয়ন মিত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। অনায়াসেই তার সঙ্গে যুক্ত করা যায় এদেশের অথবা বিদেশের আরও অনেক গবেষকদের নাম বা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা। স্বভাবসিদ্ধ পরিমিতিবোধে শ্রীমিত্র এ বিষয়ে বিস্তারে আলোচনা করেননি। হয়তো ভবিষ্যতে করবেন, কারণ এখানকার আধিকারিক হিসেবে গত ত্রিশ বছরে তিনি নিজেই অনেককে দেখেছেন। অন্যদের কথা পড়েছেন অথবা শুনেছেন। ইদানীং অবশ্য মহাফেজখানায় বসে শ্রমসাধ্য গবেষণা করার রেওয়াজটা কিছুটা কমে আসছে। তা ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির এবং গবেষণা সহায়কদের সাহায্যের ফলে নথিপত্র অনুসন্ধানের অনেক নতুন প্রথা-প্রকরণও আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে

আশার কথা, সকলেই এই স্রোতে গা ভাসাননি। আর যাঁরা উজানে চলেন, তাঁরাই তো সৃষ্টি করেন প্রকৃত ইতিহাস। তাঁদের কাছে মহাফেজখানা আজও অপরিহার্য।

অথচ যে মহাফেজখানা ইতিহাসের আকর, সে নিজেও তো ইতিহাস। উপযুক্ত জীবনীকারের হাতে পড়লে মহাফেজখানা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। উদয়ন মিত্রকে ধন্যবাদ। তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মহাফেজখানার সঙ্গে যুক্ত। কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্বে ধাপে ধাপে ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তাঁর গড়ে উঠেছে সখ্যের সম্পর্ক। তাঁর লেখা *জানা অজানা মহাফেজখানা* যেন পর্ব থেকে পর্বান্তরে সেই সম্পর্কেরই ইতিহাস। তিনি মহাফেজখানার জীবনীকার। কর্মজীবনের সায়াহ্নে এ যেন অতীতের স্মৃতিচারণ। তাঁর এই প্রকাশনা গভীর ভালোবাসার রসে জারিত। এই রচনা যদি বর্তমান প্রজন্মকে মহাফেজখানার দিকে আকৃষ্ট করে তবেই তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর
লেখ্যাগার শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬ ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাক্‌কথন

ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকারের স্থায়ী দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেসমস্ত রেকর্ডরুম বা 'রেকর্ড অফিস' গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ভারতে সেইসমস্ত প্রতিষ্ঠানই আর্কাইভস নামে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশে রেকর্ডরুম থেকে আর্কাইভস-এ উন্নীত হওয়ার মধ্যে শুধু সময়ের প্রশ্ন ছিল, কেন-না লোকচক্ষুর আড়ালে আর্কাইভসের মূল কাজটি ইতিমধ্যে করে ফেলেছিলেন একদল সাধারণ কর্মী। এঁরা নথি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু সরকারি দস্তাবেজের গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেননি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত এক ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠী কীভাবে এই দেশ শাসন করেছিল আর কীভাবেই বা এর অভিঘাতে আমাদের কৃষিভিত্তিক রক্ষণশীল সমাজ অনিবার্য পরিবর্তনের টানাপোড়েনে উত্তেজিত হয়ে উঠত তারই সুনির্দিষ্ট পরিচয় আছে এইসমস্ত নথিপত্রে। সরকারি দলিল দস্তাবেজে সমাজবন্ধ মানুষেরই ছবি থাকে। বর্তমান গ্রন্থ বাংলা সচিবালয়ের দলিল দস্তাবেজ থেকে এক আপাত-অজ্ঞাত 'শাখা' গড়ে ওঠার কাহিনি : সচিবালয়ের অজস্র অগোছালো অবিন্যস্ত হয়তো বা বিবর্ণ নথিপত্র সুবিন্যস্ত করে যেভাবে মহাফেজখানার আকার দেবার চেষ্টা করা হয় তারই পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। সূচনায় যে সমস্ত নথিপত্র প্রশাসনের প্রয়োজনে তৈরি হত, পরে সেই সমস্ত নথিপত্রই মানুষের সাংস্কৃতিক উৎস হয়ে ওঠে : প্রশাসনিক দলিল দস্তাবেজের গর্ভে রক্ষিত থাকে একটা জাতির সামগ্রিক পরিচয়। এই গ্রন্থে সেই পরিচয়ের সন্ধান করা হয়েছে।

১

গ্রন্থবিন্যাসের কথা লেখা যায়। সূচনায় আমি আর্কাইভসের অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। বিশিষ্ট লেখ্য বিশারদের দৃষ্টিকোণ থেকে আর্কাইভসকে দেখার চেষ্টা করেছি। 'রেকর্ড'-এর পরিচয় পালটিয়ে যাবার সঙ্গে যে আর্কাইভসের ধারণায় পরিবর্তন আসে সংজ্ঞা অংশে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি আমি। আর্কাইভসের সংশ্লিষ্ট বিষয় বা 'রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট'-এর মতন বহু-আলোচিত বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করিনি, সুযোগও ছিল না। আর্কাইভস নিয়ে আলোচনার পর আমি মূল লেখায় ফিরেছি। উনিশ শতকের প্রথম দশকেই ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র নিয়ে বাংলা দেশে প্রথম

'রেকর্ড অফিস' গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কোম্পানি প্রশাসকরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নথিপত্র তৈরি করতেন, সুন্দর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখাই হত ওই সমস্ত নথির প্রাথমিক শর্ত। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা ভবিষ্যতের কথা ভাবতেন, পরে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও। দলিল দস্তাবেজ বাদ দিয়ে প্রশাসন চলে না।

২

এই গ্রন্থের গঠনপর্বে কোম্পানির (১৭৫৭–১৮৫৮) ও ব্রিটিশরাজের (১৮৫৯–১৯৪৭) নথিপত্র নিয়ে কীভাবে অবিভক্ত বাংলার প্রথম 'রেকর্ডরুম' গড়ে উঠেছিল সে ইতিহাস লিখেছি। প্রথমে ব্রিটিশ রাজের তিন আমলা পরে বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী এই গড়ার কাজটি করেছিলেন। শ্রীনাথ অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক হিসেবে যে কাজ শুরু করেন তার অবসান হয় ১৯১৬'র নভেম্বরে কিপার হিসেবে রেকর্ডরুম থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার পর। শ্রীনাথ ছিলেন প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস।

শ্রীনাথের উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'রেকর্ডরুম' পরিচালনবিধি তৈরি। কয়েকজন উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় সহকারী আর কয়েকজন নথি সরবরাহকারীর সাহায্যে শ্রীনাথ রেকর্ডরুমের গঠনপর্ব সুষ্ঠুভাবে শেষ করেছিলেন। শ্রীনাথের উত্তরসূরিরা মূলত তাঁকেই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীনাথ জানতেন কীভাবে 'ছেঁড়া' কাগজ, 'বাতিল' কাগজ থেকে কাগজের ফুল তৈরি হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৯২০'র কালে, এই পর্বে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের উপর। এখানে ঐতিহাসিক ও চলতি শাখার কাজের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল নথিপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যায়ন, গবেষকদের কথা মনে রেখে নির্ঘণ্ট তৈরির মতন কাজ। এই সময়ে রেকর্ডরুমে গবেষকদের নিত্য উপস্থিতি লক্ষ করে তৈরি হল একগুচ্ছ নিয়মনীতি। এরই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ১৯২৮-এ মহাকরণের পঞ্চম অঞ্চলে (ব্লক ফাইভ) যেখানে সরকারি মুদ্রণের কাজ চলত, গড়ে তোলা হল ঐতিহাসিক শাখার গবেষণা কক্ষ। এখানকার দীর্ঘ বারান্দা ঘিরে এই কক্ষ তৈরি হল চারজন গবেষকদের জন্য (Political (Records) Deptt. Progs B, May 1928, No. 15)। আর এই গবেষণা কক্ষ থেকে বাংলা দেশে উনিশ শতক চর্চার সূচনা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, জে. সি. সিনহা, জে. কে. মজুমদারের 'উনিশ শতক চর্চা'র নমুনা এই সময়ের নথিপত্রে পাওয়া যাবে।

ওই পর্বে আলোচনা করেছি কীভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে অনিবার্যতা মেনে আর্কাইভস বা মহাফেজখানার ঐতিহাসিক শাখার জন্য কলেজ স্ট্রিটে বাড়ি কেনা হয়। মহাকরণের অপরিসর স্থান থেকে ঐতিহাসিক শাখা (১৭৫৮–১৯০০) নতুনভাবে তৈরি এই বাড়িতে স্থানান্তরিত হল ১৯৬০'র শুরুতে। ১৯৬১'র মধ্যে আর্কাইভসের ঐতিহাসিক শাখা গড়ার কাজ শেষ হল এখানে।

১৯৮০'র কালে সরকারি নথিপত্রের বাইরের জগতে অর্থাৎ বেসরকারি অঞ্চল থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করা হল : ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান এই সমস্ত

বেসরকারি দলিল দস্তাবেজ মহাফেজখানার সম্পদ বৃদ্ধি করল। ওই পর্বের শেষ একবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। বিশ শতকের শেষে কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে মহাফেজখানা বা আর্কাইভসের নতুন বাড়ি গড়ে উঠেছে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই বাড়িতে তৈরি হল আর্কাইভসের নতুন শাখা 'ফোটো বিভাগ'। আই. বি. শাখা থেকে পাওয়া বিশ শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি আর্কাইভসের চিরাচরিত কাজে নতুন মাত্রা যোগ করল। মহাফেজখানার পরিচিত জগতে বেসরকারি নথিপত্র, বিপ্লবীদের ছবি ও তাঁদের নিষিদ্ধ চিঠিপত্র বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য যোগ করে দিয়েছে।

তৃতীয় বা শেষ পর্বে কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের কিছু নথিপত্র দিয়ে আলোচনা করেছি। সময় সমাজ আর মানুষজন কীভাবে ভিনদেশি প্রশাসকদের চিন্তা ভাবনায় স্থান করে নিয়েছিল সরকারি নথির পাতায় তার খোঁজ করেছি। এই আলোচনার সময়সীমা ১৭৫৮–১৮৫৮ ও ১৮৫৯–১৯০০। বিশ শতকের অস্থির সময়ের ছবি আছে সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' ও আই. বি. শাখার নথিপত্রে। এই আলোচনা শুরু করেছি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে, শেষ করেছি তেভাগা আন্দোলনে এসে। 'গোপন' বলেই রাজনৈতিক ও আই. বি. শাখার নথিপত্রের তথ্য নির্দেশিকা দিতে পারিনি। ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে আমি কিছু উল্লেখযোগ্য নথির কথা লিখেছি—এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ। সমাজচিত্র সবসময়েই অসম্পূর্ণ থেকে যায় : অসম্পূর্ণ চিত্রও পূর্ণ থেকে নিতে হয়। এবং সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অংশ লিখেছি কীভাবে নথিপত্রের হস্তান্তরণের সময়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছিল সেই কাহিনি।

৩

এই গ্রন্থে রেকর্ডরুম ও মহাফেজখানা একসঙ্গে ব্যবহার করেছি আমি। রেকর্ডরুম নামে পরিচিত হয়েও প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে 'ওই' রেকর্ডরুম একই সঙ্গে বৌদ্ধিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আধুনিক আর্কাইভস বা মহাফেজখানার মাঝামাঝি জায়গায় স্থান করে নিয়েছিল। একই মুদ্রার একদিকে 'রেকর্ডরুম' অন্যদিকে 'মহাফেজখানা'র ছবি দেখা যায় কখনো-কখনো। সূচনা থেকে, তাই লেখা যায় ঔপনিবেশিক রেকর্ডরুমের রং পালটাতে শুরু করেছিল, রক্ষণশীল ধারণার লক্ষ্মণরেখা অতিক্রমের চেষ্টা করে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এসে 'রেকর্ডরুম' আর্কাইভস হল . বাংলা বাঙালির সুখপাঠ্য ইতিহাসের উৎসমুখ।

৪

এই গ্রন্থের তথ্য সম্বন্ধে দু-এক কথা লেখা যায়, শুরুতে রাজনৈতিক পরে এপ্রিল ১৯৩৭'র পর স্বরাষ্ট্র (রেকর্ডরুম) দপ্তরের মূলত অস্থায়ী 'বি' শ্রেণির নথি থেকে এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিতান্ত গুরুত্বহীন

নথি 'সি' ফাইলেও তথ্যের খোঁজ করেছি। রাজ্য মহাফেজখানা নিয়ে লেখা কোনো গ্রন্থ নেই, আমি তাই বাধ্য হয়েছি সরকারি নথির উপর নির্ভর করতে। এই সমস্ত নথিপত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আদৌ স্পষ্ট ছিল না আগে, ফলে যে তথ্যের খোঁজ মিলেছে সেটাই নতুনের তকমা পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে মূল নথির অভাবে ফাইল রেজিস্টার দেখতে হয়েছে। এখানে কোনো বিবরণ না থাকলেও বিশেষ বিশেষ নথি সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। অতীত সন্ধানের জন্য বা ফেলে আসা মানুষজন আর তাদের দিনক্ষণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে এক ধরনের রোমাঞ্চ জাগে।

৫

পরিশেষে বলা যায় আঠারো-উনিশ শতকের সাধারণ ও বিশ শতকের গোপন নথিপত্র বিষয়ে মূল আলোচনায় উল্লেখ করেছি। বিশ শতকের বাংলা সচিবালয়ের সাধারণ নথিপত্র নিয়ে আমি কিছু লিখিনি। এই সময়ের কয়েকটি চমকলাগা নথি পরিশিষ্ট অংশে যোগ করে সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করলাম।

অসংখ্য মণিমাণিক্যের মধ্যে থেকে পছন্দের নথিটি খুঁজে পাওয়া কঠিন : নথি নির্বাচনে সেই সমস্যায় আমাকে পড়তে হয়েছে। বর্তমান পরিশিষ্টের প্রথম নথিটিতে এক যুবকের চাকরি খোঁজার সংবাদ আছে, শেষের নথিটিতে আছে আমাদের পরিচিত কলকাতার চিরন্তন অন্ধকার জগতের ছবি। মহাফেজখানা আলো-আঁধারে জড়িয়ে থাকে সতত।

সংজ্ঞার খোঁজে

সরকারি বা বেসরকারি নথিপত্র বা দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ খুব কম। যাঁর হাতে তৈরি হয় কোনো মূল্যবান নথি তিনিও শেষ পর্যন্ত উদাসীন হয়ে যান তাঁরই তৈরি নথি সম্বন্ধে, অলস মুহূর্তে তিনিও বলে থাকেন কী সব বাজে কাগজ! বোধকবি প্রত্যেক দশজনের মধ্যে সাতজনই এই সমস্ত আপাত মূল্যহীন কাগজপত্র বিষয়ে চূড়ান্ত রকমের উদাসীন। তাঁরা অনায়াসেই বলেন কী লাভ এই সমস্ত কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করে? সমাজ-ইতিহাস সম্বন্ধে এক ধরনের বিপজ্জনক অজ্ঞানতা এমন ধারণার পিছনে কাজ করে থাকে।

ওই অজ্ঞানতা উদাসীনতার জন্য আমরা অনেক সময়ে ধ্বংস করে ফেলি দেশ-দশের অনেক মূল্যবান নথিপত্র, আমাদের অবহেলায় নষ্ট হয় সমাজ-ইতিহাসের উপাদান, হারিয়ে যায় অতীতের উৎস মুখ। অথচ ধূলি ধূসর অবহেলা আর অযত্নে পড়ে থাকা কিছু কিছু দলিল দস্তাবেজ আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেই সময়ে যে সময় আমরা ফেলে এসেছি, আমরা খোঁজ নিতে পারি সেই জগতের যে জগৎ দেখিনি কখনও। ফেলে আসা সময়, অচেনা মানুষ বা ইতিহাসের শব্দ, বাক্য ধরা থাকে বিবর্ণ দলিলপত্রে বান্ডিলে— মহাফেজখানায়।

১

'আর্কাইভস' নিয়ে আলোচনার আগে আমরা জেনে নেব কেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সরকার কী এমন সংস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য বা চলতি প্রশাসনের সঙ্গে এর কী কোনো সম্পর্ক থাকে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা খুঁজে পাব আর্কাইভস বা মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ।

আমরা জানি প্রশাসন সচল রাখতে নথি বা দলিলপত্রের প্রয়োজন হয় নিত্যদিন; প্রতিক্ষণে, নিপুণভাবে প্রশাসন চালানোর জন্য প্রত্যেক প্রশাসকই চান নিখুঁত নথি যেখানে উল্লেখ থাকবে: (১) বিষয় ও (২) নথি শনাক্তকরণ সংখ্যা। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা চলে প্রশাসনিক দক্ষতা প্রতিফলিত হয় বিভাগীয় নথির পূর্ণতায়। প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই তৈরি অজস্র নথিপত্রের মধ্যে যে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ভবিষ্যতে প্রশাসনের প্রয়োজনে লাগবে বলে মনে হয় অর্থাৎ যেখানে প্রতিফলিত হবে সরকারি নিয়মনীতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার, সেই সমস্ত নথিপত্র

আলাদা করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এই সমস্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে একটা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ ছবি। এই অর্থে এই সমস্ত দলিলপত্র সামাজিক ও প্রশাসনিক দর্পণ বিশেষ : যে দর্পণ একজন সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার করেন অতীতচর্চার প্রয়োজনে, একজন প্রশাসক ব্যবহার করেন প্রশাসনিক কারণে। পৃথিবীর যে কোনো দেশে আর্কাইভস বা মহাফেজখানা গড়ে তোলার মূলে এই প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আমাদের কাছে ফরাসি জাতীয় মহাফেজখানা যথার্থ উদাহরণ হতে পারে। ফরাসি বিপ্লবের উত্তাল সময়ে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে জাতীয় সভার (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) নথিপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রশ্ন শুধু উঠেছিল তাই-ই নয় বুরবোঁ শাসকদের নথিপত্র জাতীয় সম্পদ হিসেবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিপ্লবের সূচনায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভার 'আর্কাইভস' ১৭৯০-এর সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের পূর্ণাঙ্গ আর্কাইভসের মর্যাদা পায়। ফরাসি সম্রাটকে হত্যা করে জনগণের অনুশোচনা ছিল না, সে দিনের জরুরি প্রশ্ন ছিল ফরাসি নথিপত্র রক্ষা করা। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার উপাদান সংরক্ষণ করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিপ্লবীরা তৈরি করেছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠিত আর্কাইভসে।[১] ফরাসিদের জাতীয় সংগ্রহালয়ের উদাহরণ দিয়েছি, ঔপনিবেশিক যুগে আমাদের দেশের কথা বলা চলে। সাধারণ মানুষের অধিকার, অবশ্যই সরকারের অধিকার, সুরক্ষার জন্য এতদ্ বিষয়ক দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়। ১৮২০ সালে কলকাতায় কোম্পানির শাসক গোষ্ঠী যে 'জেনারেল রেকর্ড অফিস' গড়ে তুলেছিল তার কারণ ছিল জমিদার কৃষক, সরকার ও সাধারণ মানুষের অধিকারের রক্ষা কবচ—রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ রক্ষার ব্যবস্থা করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উত্তর রাজস্ব বিভাগের নথিপত্রে এই সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর অধিকারের লক্ষ্মণরেখা ঠিক করা আছে।

সরাসরি লেখা যায় সরকার নথি সংগ্রহালয় বা আর্কাইভস গড়ে তুলতে দায়বন্ধ। এই দায়বন্ধতা নিজের কাছে, দেশ আর দশের কাছে। প্রশাসন সচল রাখতে বা প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হয়, অতীত থেকে উদাহরণ নিতে হয়, বর্তমান অতীত থেকে তার রসদ জোগাড় করে। ফলত সরকার নিজেরই স্বার্থে সব বিভাগের নথি দলিলপত্র নিয়ে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা নাকি ঠিক অর্থে হবে সমস্ত সরকারি বিভাগের মিলন কেন্দ্র : সরকারের সমস্ত বিভাগ নিয়েই 'এক' আর্কাইভস জন্ম নেয়।

২

'আর্কাইভস' বলব কাকে ?

'আর্কাইভস'-এর অর্থ : (১) প্রতিষ্ঠান, (২) স্থায়ী দলিল বা নথিপত্র। প্রতিষ্ঠানের কথা থাক, নথির কথা লিখি। সরাসরি বলা যায় স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথি বা দলিলপত্রই 'আর্কাইভস'-এর মর্যাদা পায়। ভবিষ্যৎ সমাজ মানুষের প্রয়োজনে যে নথি লাগবে সেই নথিই আর্কাইভস। অর্থাৎ মরণশীল মানুষের অবিনশ্বর কর্মকাণ্ডের লিখিত বিবরণ আর্কাইভস।

এবং রেকর্ডস 'আর্কাইভস'-এ উন্নীত হয় নথিপত্রের স্থায়িত্ব যা অমরত্বের প্রেক্ষিতে। সব 'রেকর্ডস' 'আর্কাইভস' নয়। কোনো প্রশাসকই জানতে পারেন না তাঁর তৈরি দলিলপত্রের ভবিষ্যৎ কি হবে? আজকের নথি কাল কি কাজে লাগবে এমনতরো প্রশ্ন এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে 'আর্কাইভস'-এর শিকড়ের সন্ধান করতে হয়। আর্কাইভস-এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। আমি 'আর্কাইভস' অর্থে লিখেছি স্থায়ী নথি। অন্যদিকে 'রেকর্ড' মানে দলিল বা লেখ্য। আর্কাইভস-এর অর্থ দলিল কেন হবে? রেকর্ড ও আর্কাইভস-এর অর্থ কখনোই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। যে দলিলে কোনো স্থায়ী মূল্য নেই সেই দলিলের কথা কে মনে রাখে? আবার স্থায়ী নথির কথা কে ভোলে? স্থায়ী নথি না থাকলে 'ইতিহাস' কোথায় পেতাম আমরা?

ওই সূত্র ধরে 'আর্কাইভস' বাংলায় মানে কি লেখ্যাগার হবে? লেখ্যাগার শব্দ ভাঙলে আমরা পাব লেখ্য+আগার বা গৃহ, ঘর-এর মতন দুটো শব্দ যার অর্থ 'নথি-গৃহ'। আর্কাইভস-এর ব্যাপকতা এই ঘরে মানায় না। আরবি শব্দ মহাফেজখানার আভিজাত্যের সঙ্গে আর্কাইভস মানিয়ে যায়। এই গ্রন্থে লেখ্যাগারের পরিবর্তে মহাফেজখানা ব্যবহার করব।

৩

শিকড়ের সন্ধানে

যেহেতু 'আর্কাইভস'-এর উৎপত্তি 'রেকর্ড' থেকে ঠিক সেই কারণে এই শব্দের উপর নজর দেওয়া যায়। লাতিন শব্দ বিশ্লেষণ করলে আমরা পেতে পারি RE+COR বা RECORDIS লাতিন শব্দ 'RE'-এর অর্থ পুনরায়, বারংবার। 'COR'-এর অর্থ হৃদয়, CORDIS মানে মন। রেকর্ডারি'র অর্থ মনে রাখা। মানুষের মনই তার স্মৃতির আধার। অক্সফোর্ড অভিধানে (১৮৩৩) রেকর্ডের একাধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। ওই সমস্ত অর্থের বর্ণনায় লেখা যায় 'রেকর্ড এমন এক আধার যেখানে সংরক্ষণের জন্য কিছু লেখা থাকে। এক বিশিষ্ট লেখ্যবিদ জানিয়েছেন যে 'রেকর্ড'-এর তালিকায় পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, কাগজ, ম্যাপ, ছবি এবং প্রামাণ্য নিদর্শন রাখা চলে। 'রেকর্ড'-এর প্রাক্ শর্ত হিসেবে আমরা পাই একজন স্রষ্টা এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, ইনি একজন ব্যক্তি হতে পারেন, হতে পারে কোনো পরিবার (পারিবারিক দলিল বা রেকর্ড), কোনো প্রতিষ্ঠান (সরকারি বা বে-সরকারি), বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রেকর্ড বা নথি তৈরি হয়, উদ্দেশ্য নেই অথচ নথি তৈরি হয়েছে এমন হয় না। এই নথির বিষয়বস্তু ঠিক করে দেবে কোন নথি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।[২] এখানেই মেলে 'আর্কাইভস'-এর ইঙ্গিত।

প্রতিদিনের সরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক 'মন' বা নথি তৈরি হয় যা শুরুতে থাকে চলতি (কারেন্ট) পরে হয় অ-চলতি (ননকারেন্ট)। এই সমস্ত অ-চলতি নথিপত্রের চরিত্রই ঠিক করে দেয় নথিপত্রের স্থায়িত্ব বা জীবনসীমা। মূল্যহীন, সাধারণ বা অতি সাধারণ মানের নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয় না। স্মরণযোগ্য নথির জন্য তৈরি হয় মহাফেজখানা। নির্ভর বা স্মরণযোগ্য নথিও যথোপযুক্ত স্থান এই দুইয়ে মিলে তৈরি হয়

আর্কাইভস বা যাকে বলছি মহাফেজখানা। গ্রিক শব্দ আরকি (Arkhe) থেকে ইংরেজি শব্দ আর্কাইভস-এর উৎপত্তি। 'আরকি'র একাধিক অর্থ · (১) সূচনা, প্রথম, কারণ উৎপত্তি (২) শক্তি, সার্বভৌমত্ব (৩) বিচারালয়, দপ্তর ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের মধ্য 'দপ্তরই' 'আর্কাইভস'-এর নিকটতম 'অর্থ'। গ্রিক আর্কিয়ন (Archeion) ইংরেজি ভাষায় 'আর্কাইভস' হয়েছে। আবার লাতিন শব্দ 'আর্কিভিয়াম' (Archivium) 'আর্কাইভস'-এর সমার্থক অর্থাৎ 'আর্কিয়ন', 'আর্কিভিয়াম' ও 'আর্কাইভস' শব্দ ত্রয়ীর অর্থ এক।[৩]

আঠারো-উনিশ শতক পর্যন্ত 'আর্কাইভস'কে দেখা হত প্রাচীন নথিপত্রের সংগ্রহালয় হিসেবে। ১৭৭০ সালে স্যামুয়েল জনসন 'আর্কাইভস'-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন আর্কাইভস সেই স্থান যেখানে প্রাচীন রচনা সম্ভার রাখা হয়। 'আর্কাইভস'-এর অর্থ অবশ্যই পালটিয়ে যায় বিশ শতকের সূচনা থেকে। এই সময় বলা হল আর্কাইভস বলতে (১) নথিপত্র ও (২) নথিপত্র সংরক্ষণের স্থান বোঝায়। অক্সফোর্ড অভিধানে আর্কাইভস-এর দুই অর্থই করা হয়েছে। খ্যাত অখ্যাত সব অভিধানেই আর্কাইভস-এর অর্থ মেনে নেওয়া হয়েছে।[৪]

মহাফেজখানার ধ্রুপদি পরিচয়

বিশ্ব মহাফেজখানার ইতিহাসে সতত স্মরণীয় কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে আর্কাইভস বা মহাফেজখানার ব্যাখ্যায় কি বলা হয়েছে। এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর্কাইভস-এর অর্থের ওপর। আমরা এই 'অর্থ' ব্যাখ্যা করব। এবং আমরা এই ব্যাখ্যা থেকে জেনে নেব কোন পদ্ধতিতে স্থায়ী লেখ্য অজস্র নথিপত্রের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। শুরু করা যায় ডাচ ত্রয়ী লেখ্য বিশারদের মতামত থেকে। ওই ডাচ ত্রয়ী হলেন এস. মুলার (১৮৪৮–১৯২১), জে. এ. ফিথ (১৮৫৮–১৯১৩) এবং আর. ফ্রুইন (১৮৫৭–১৯৩৫)। এই তিন লেখ্য বিশারদ তাঁদের দেখা প্রশাসনের প্রেক্ষিতে 'আর্কাইভস'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বোধকরি মহাফেজখানার ইতিহাসে প্রথম ধ্রুপদি বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে। উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯৮) এঁরা মহাফেজখানা সংক্রান্ত তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে আমেরিকা এক বিশেষজ্ঞ আর্থার এইচ লিভিট ওই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ *ম্যানুয়াল ফর দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ডেসক্রিপসন অভ আর্কাইভস* প্রকাশ করেন।[৫] ডাচ 'আরচিফ'-এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন সমস্ত প্রকার লিখিত উপাদান, মুদ্রিত তথ্য, নকশা ইত্যাদি প্রশাসনিক প্রয়োজনে যা সৃষ্টি হয় বা অন্যের কাছ থেকে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই গৃহীত হয় এবং শেষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা হয়। ডাচ 'আরচিফ' ইংরেজি 'আর্কাইভস'-এর সমার্থক শব্দ।

ওই প্রকাশনার চব্বিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯২২ সালে ব্রিটিশ লেখ্য বিশারদ স্যার হিলারি জেনকিনসন প্রকাশ করলেন তাঁর গ্রন্থ *ম্যানুয়াল অভ আর্কাইভস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*। জেনকিনসনের এই গ্রন্থ মহাফেজখানা সংক্রান্ত আলোচনায় নতুন দিগন্ত খুলে দিলেও তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা অনেকাংশে রক্ষণশীল।[৬]

জেনকিনসন তাঁর গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন আর্কাইভস প্রশাসনিক কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এবং প্রশাসনের স্বার্থেই প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোনো দায়িত্ববান ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা এঁদের আইনানুগ উত্তরসূরিরা প্রশাসনিক তথ্য হিসাবে রক্ষা করেন। জেনকিনসনের ওই সংজ্ঞায় প্রশাসনের (সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থায়) স্বার্থরক্ষাই আর্কাইভস-এর পরিচয়ের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশাসন নথি তৈরি ও সংরক্ষণ করে প্রশাসনেরই স্বার্থে।[৭] জেনকিনসনের ওই গ্রন্থ প্রকাশের ছ'বছর পর অর্থাৎ ১৯২৮ সালে ইতালির লেখ্য বিশারদ ইউজেনিয়ো কাসানোভা (১৮৬৭--১৯৫১) প্রকাশ করলেন তাঁর *আর্কিভিস্তিকা*। কাসানোভা লিখেছেন আর্কাইভস সুশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত দলিল দস্তাবেজ যা কোনো প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় এবং ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়।[৮] জেনকিনসনের সঙ্গে কাসানোভার পার্থক্য লক্ষণীয়।

পূর্বোক্ত ওলন্দাজত্রয়ী বা ব্রিটিশ ও ইতালির লেখ্য বিশেষজ্ঞদের তুলনায় জার্মান লেখ্যবিদ এডলফ ব্রেনেক[৯] (১৮৭৫—১৯৪৬)-এর আর্কাইভস সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা অবশ্যই স্পষ্ট বলে মনে হবে। ব্রেনেক-এর আর্কাইভস সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থের আকারে প্রকাশ হয় ১৯৫৩ সালে। ব্রেনেক তাঁর আলোচনায় আমাদের জানিয়েছেন আর্কাইভস প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত হয় এবং অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

১৯৫৬ সালে লেখ্য বিশেষজ্ঞ টি. আর. শেলেনবার্গ প্রকাশ করলেন তাঁর গ্রন্থ *মডার্ন আর্কাইভস : প্রিন্সিপিলস অ্যান্ড টেকনিক*। শেলেনবার্গের এই গ্রন্থ 'আর্কাইভস'-এর ভাবনায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল।[১০] জেনকিনসনের তুলনায় শেলেনবার্গের 'আর্কাইভস' ভাবনা অনেক পরিচ্ছন্ন ও উদার বলা যেতে পারে।

শেলেনবার্গের মতে আর্কাইভস বলতে আমরা বুঝি সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র যা গবেষণা বা অন্য প্রয়োজনে লাগবে এবং যা ইতিমধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা পড়েছে বা সেখানে স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।[১১] শেলেনবার্গ আর্কাইভস নিয়ে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করলে আমাদের মনে হবে যে প্রশাসনিক লক্ষ্যের সামনে নথি তৈরি হয়, সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যখন নির্দিষ্ট ওই লক্ষ্যের সঙ্গে অন্য মাত্রা যা 'আদার ভ্যালুজ' যুক্ত হয়ে পড়ে তখন সেই নথি অমরত্ব পায়। দীর্ঘদিন আগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নথিটি তৈরি হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য'র কথা মনে থাকে না কারোরই।

ওই সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলি অবশ্যই আর্কাইভস চেনাবার বা অভিনব এই প্রতিষ্ঠাকে অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট। কোনো সংজ্ঞাই অবশ্য স্থায়ী হতে পারে না। যুগের সঙ্গে প্রশাসনিক অনিবার্যতা মেনে আর্কাইভস-এর অর্থ পালটিয়ে যায়। স্যার হিলারি জেনকিনসন মনে করতেন (১) আর্কাইভস গড়ে ওঠে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং (২) স্রষ্টারা বা এর আইনানুগ উত্তরসূরিরা যা রক্ষা করবেন। জেনকিনসন প্রশাসন ভিন্ন অন্য কোনো প্রয়োজন স্বীকার করেননি। অন্যদিকে শেলেনবার্গ আমাদের জানিয়েছেন (১) স্রষ্টারাই

স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের রক্ষক হবেন এমন কথা নেই, (২) আর্কাইভস নামক প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত নথিপত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। সর্বোপরি এই সমস্ত নথিপত্রের দ্বিবিধ প্রয়োজনের কথা শেলেনবার্গ উল্লেখ করেছেন : এই প্রয়োজন প্রশাসন ও গবেষণায়। জেনকিনসনের ভাবনায় প্রশাসনিক প্রয়োজন ভিন্ন সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের অন্য মূল্য বা 'আদার ভ্যালুজ' স্থান পায়নি। শেলেনবার্গের সংজ্ঞার পরবর্তী দশকগুলিতে আর্কাইভস-এর অর্থ নতুনভাবে ব্যাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব ব্যাখ্যাই যে আমাদের কাছে সমানভাবে আদৃত হয়েছে এমন বলা না গেলেও আমরা লিখতে পারি সমস্ত ব্যাখ্যারই অভিন্ন অংশ ছিল যেমন :

১. আর্কাইভস অচলতি স্থায়ী সংরক্ষণযোগ্য নথি

২. আর্কাইভস-এর স্রষ্টা বা আইনানুগ উত্তরাধিকারীরা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন

৩. ভবিষ্যৎ প্রশাসন ও অন্য কারণে।

আমেরিকার আর এক লেখ্য বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুক ১৯৮৬ সালে আর্কাইভস-এর আলোচনায় নথিপত্রে আগ্রহী ব্যক্তিদের জানিয়েছিলেন যে আর্কাইভস-এর অভ্যন্তর থেকেই তথ্যের বিকাশ ঘটে থাকে। অর্থাৎ একদিন যে কারণে কোনো নথির সৃষ্টি হয়েছিল, সময় সে কারণ ভুলিয়ে দিয়ে অন্য তথ্য উৎপন্ন হয় মহাফেজখানায়। মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্তদের হাতে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। কুক তাঁর আলোচনায় এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। শেলেনবার্গের 'আদার ভ্যালুজ'-এর কথা মনে পড়ে।

ওলন্দাজ ত্রয়ী থেকে মাইকেল কুক পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আর্কাইভস বা স্থায়ী নথিপত্রের আলোচনায় আমরা মূলত ঘুরেছি চিরাচরিত ধারণার মধ্যে। আমাদের ভাবনায় স্পষ্টভাবে 'আর্কাইভস'-এর নতুন কোনো আধার উঠে আসেনি। আমাদের মনে অবশ্য এই প্রশ্ন ওঠে, বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিবর্ণ দলিল দস্তাবেজের মায়াজালে মহাফেজখানা কি আবদ্ধ থাকবে ? আমরা কি চিরকাল সংকুচিত করে রাখব দলিল দস্তাবেজের বিবর্ণ জগৎটাকে ? ১৯৯৩-৯৪ সালে আমেরিকার লেখ্য বিশেষজ্ঞদের প্রচারিত 'দ্য ডাইরেক্টরি অভ আর্কাইভাল এডুকেশন'-এর সংজ্ঞায় অভিনবত্ব ছিল না, কিন্তু লেখ্য বৈচিত্র্য নির্ণয়ে মৌলিকত্ব পাওয়া গেল।[১২] ওই আলোচনায় বলা হয়েছে 'লেখ্য' সম্পদ বলতে শুধু চিরাচরিত দলিল দস্তাবেজ বোঝায় না, এর জগৎ বিরাট হতে পারে। আধুনিক এই নথি সংগ্রহালয়ের মধ্যে অনায়াসেই স্থান করে নিতে পারে : (১) ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি (২) সরকারি দলিল দস্তাবেজ (৩) মুদ্রিত তথ্য (৪) সংগীত, লোক সংগীত, কথ্য অপ্রচলিত শব্দ, স্থানীয় কথকতা (৫) মানচিত্র (৬) চলচ্চিত্র, ছবি/চিত্রাঙ্কন, পট (৭) ভিডিও টেপ ইত্যাদি।[১৩] এই সমস্ত উপাদান থেকে বোঝা যায় আধুনিক মহাফেজখানা কি হতে পারে, শুধু বিবর্ণ দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কোনো মহাফেজখানাই ঋদ্ধ হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে 'রেকর্ড'-এর অর্থ পালটিয়ে যায়, গেছেও; উদাহরণ নিতে যেতে পারি আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশ

১৯৮৩'র ১৫ আগস্টে গৃহীত বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা সংক্রান্ত 'অর্ডিন্যান্স'-এ বলা হয়েছে 'পাবলিক রেকর্ড' বলতে বোঝাবে যে কোনো পাণ্ডুলিপি, অনুলিপি, ছবি, চার্ট, প্ল্যান, ফিল্‌ম, টেপ, ভিডিয়ো টেপ ইত্যাদি অর্থাৎ যা প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে, গ্রহণ করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হবে এমন সব কিছুই।[১৪]

গণপ্রজাতন্ত্রী চিন

গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে ১৯৮৭'র ৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের ২২তম প্লেনারি অধিবেশনে গৃহীত 'আর্কাইভাল ল'-এ 'আর্কাইভাল মেটেরিয়াল' বলতে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল—যেমন লিখিত রচনা, ছবি, নকশা, দৃশ্য—প্রাপ্ত তথ্যাদি যার সংরক্ষণ মূল্য আছে এবং যা রাষ্ট্র বা কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষ রাজনৈতিক সামরিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে যুক্ত থেকে সরাসরি সৃষ্টি করেন, করেছিলেন।[১৫] আমাদের দেশ দেখা যাক।

ভারতবর্ষ · পাবলিক রেকর্ড অ্যাক্ট

১৯৯৩ সালে জাতীয় অভিলেখালয়ের জন্য গৃহীত ওই আইনে 'পাবলিক রেকর্ড' বলতে বোঝানো হয়েছে : (১) যে কোনো দলিল, পাণ্ডুলিপি, নথি (২) 'মাইক্রোফিল্‌ম', 'মাইক্রোফিস' এবং কোনো নথি/দলিলের হুবহু প্রতিরূপ ও (৩) 'কম্পিউটার' বা অন্য উপায়ে সৃষ্ট তথ্য ইত্যাদি।[১৬] বিস্তারিতভাবে আমাদের ও অন্য দেশের নজির তুলে এই আলোচনা করা সম্ভব না। শুধু বলা চলে একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভাবনা চিন্তার অনেক স্তর অতিক্রম করে এসেও যদি মহাফেজখানা ও এর সম্পদ নিয়ে শুধু ঐতিহ্য আশ্রয়ী চেতনার জগতে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখি তা হলে ওই জগতের অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অধরা থেকে যাবে। আমরা জানতে পারব না মহাফেজখানার স্বরূপ কি হতে পারে আমাদের জানা জগৎটার বাইরে ; আমরা সচেতন হলে লেখ্য সংস্কৃতির জগৎটা ঋদ্ধ হতে পারে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মণি-মাণিক্য খুঁজে নিয়ে। কোনো গানের কলি বা মুখে মুখে চলে আসা প্রবচন ধরে আমরা অনায়াসেই আমাদের শিকড়ের সন্ধান করতে পারি।

আমাদের বিশ-শতকের রাজনৈতিক উত্থান পতন নিয়ে সরকারি নথির পাতায় যে তথ্য পাওয়া যায় তারই পরিপূরক তথ্য পাওয়া যায় সেই সময়ের গান, কবিতা, ইস্তাহারে। বিদেশি হত্যার দায়ে ধৃত ক্ষুদিরামের ফাঁসির কাহিনি সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বাঁকুড়ার অখ্যাত পীতাম্বর দাস ক্ষুদিরামের স্মরণে যে গান লিখেছিলেন সরকারি তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মনে হয় 'রেকর্ড' কখনো-কখনো বিপজ্জনক হতে পারে। সরকার এটা জানত বলেই এ-গান নিষিদ্ধ হয়েছিল। বন্দেমাতরম বা এই গানের মতন আরও অনেক গান পরাধীন ভারতের জনচিত্তকে আলোড়িত করে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায়

ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ক্ষুদিরামের গান বা বন্দেমাতরম অনায়াসেই মহাফেজখানায় স্থান করে নিতে পারে।

মহাফেজখানার চিরাচরিত জগতে গান, কবিতা, ছবি আর মৌখিক ইতিহাস মিলেমিশে এক হয়। হাজারো স্মৃতি নিয়ে মহাফেজখানা গড়ে ওঠে, ইউনেস্কো যাকে বলে 'বিশ্ব স্মৃতি ভাণ্ডার'।[১৭] এই মহাফেজখানার গর্ভে থাকে আমাদের পূর্বসূরিদের কৃতকর্মের কাহিনি, পরাধীন মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা ব্যর্থতা বা সাফল্যের জন্য উল্লাস। এই স্মৃতি ভাণ্ডারের সামনে এক সংরক্ষকের ভূমিকা কি হতে পারে ? একজনের বর্ণনায় যা পেয়েছি : 'As sentinels, faithfully guarding, standing watch over the houses of kings, Let us archivists, likewise be watchful of our forefathers' most precious things.'[১৮]

মহাফেজখানার নথিপত্রের বৈশিষ্ট্য

স্থায়ী নথিপত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য এর নিরপেক্ষতা। কেন না এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে কেউ-ই কোনো প্রশ্ন তুলতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেয়াল খুশি মতন চিন্তা-ভাবনায় প্রাণিত হয়ে এই সমস্ত নথি তৈরি করেন না। দেশ, দশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যে নথি তৈরি করা হয়েছে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে কারোরই প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না। ইতিহাসের স্বীকৃত তথ্য হিসেবে এই সমস্ত নথিপত্রের মূল্য দীর্ঘ সময়ের মধ্য স্থির হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানীরা জানেন '...they (archives) can not tell him but the truth.'

নিরপেক্ষ বলেই, ওই সমস্ত নথিপত্রের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কারোরই মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। স্থায়ী নথিপত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর নির্ভরযোগ্যতা। এই ক্ষেত্রে স্রষ্টারাই ঠিক করে দেন এই নির্ভরযোগ্যতার মান। যাঁরা এই সমস্ত নথিপত্র সৃষ্টি করেন তাঁরা চান না কোনো কারণেই এই সমস্ত নথিপত্রের মৌলিকত্ব ধ্বংস হোক। কোনো নথির কোনো অংশ এমনকি কোনো শব্দের হেরফের ঘটানো কখনও যায় না। মূল দলিলের সংশোধন করবেন কে ? কেন-না এটাই ঠিক। এক নিরবচ্ছিন্ন মৌলিকত্বের জন্য এই সমস্ত নথিপত্র দেশের নিম্নতম আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা হয়। ফলত প্রশাসনিক স্বার্থ ও ঐতিহাসিক মূল্য এই দুয়েরই প্রেক্ষিতে মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না। প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠায় এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ প্রশাসক ও ইতিহাসবিদদের হাতে একই সঙ্গে শানিত অস্ত্রের মতন কাজ করে। তবু প্রশ্ন থাকে · প্রশ্নটা এই : কখনো- কখনো নথিপত্রের মূল লেখা বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়, সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট স্বার্থে দিন তারিখ পালটানো হয়। কীভাবে এমন হয় ? এই অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর অবস্থা তৈরি হয় নথিপত্রের স্থান ও মালিকানা বদলের সময়।

আমরা জানি মহাফেজখানার নথিপত্রের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা এর স্রষ্টা নন, যাঁরা স্রষ্টা তাঁরাও শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত নথিপত্রের দায়িত্বে থাকেন না। অজস্র নথিপত্রের মধ্যে থেকে যখন কিছু নথি স্থায়ী লেখ্য সম্পদে উন্নীত হয় তখন এর অভিভাবকদের বদল ঘটে, সংরক্ষণযোগ্য স্থায়ী নথির হয়তো স্থান বদলও ঘটে থাকে। এই স্থান ও অভিভাবক

বদলের সময় নথিপত্রের মৌলিকত্ব অনেক সময় নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা হয়, নিতান্তই সংকীর্ণ স্বার্থে। অনেক তথ্য চোখের আড়াল থেকে পালটিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়।

ওইরকম চেষ্টা অবশ্য ব্যতিক্রমী নজির হিসেবে গণ্য করা হয। এর জন্যে মহাফেজখানা ও এর নথিপত্রের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। এবং এই কারণে এই সমস্ত নথিপত্রের নিরাপত্তার উপর নজর দিতে হয়। ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য এর স্থায়ী সত্য অস্বীকার করা যায না। মহাফেজখানা ও স্থাযী নথিপত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এর অনন্যতা। যে ঘটনা যে নথিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না এবং নথিরও। এই কারণে মহাফেজখানাব নথিপত্র নজিরহীন। আবার মহাফেজখানার নথিপত্র বিভিন্নতা নিযেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক প্রবহমান ঘটনাবলির নিরবচ্ছিন্নতা বিভিন্ন স্তরে ধরা পড়ে পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরি করে এবং এটাই মহাফেজখানার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হতে পারে।[১১]

৪

প্রশাসন ও মহাফেজখানা

কেন মহাফেজখানা বা আর্কাইভস গড়ে ওঠে আর কেনই বা অজস্র দলিল দস্তাবেজের মধ্য থেকে কিছু নথির স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি সে-কথা লিখেছি। শুরুতে প্রশাসনিক অনিবার্যতা, পরে সামাজিক অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে সংরক্ষণযোগ্য নথি নিয়েই মহাফেজখানার আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে।

সমাজের স্বার্থে, স্পষ্ট করে বলা চলে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে মহাফেজখানা ও মহাফেজখানা সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। আর সময়, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এই কর্মবিন্যাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে পড়ি। অতীতকে জানা-বোঝার প্রয়োজনে 'মহাফেজখানা' গড়ে উঠে তাব অফুরান ভাণ্ডার সমাজের কাছে মুক্ত করে দেয। প্রশাসনের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাফেজখানার ও সাধারণের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। প্রশাসনের সৃষ্ট স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র নিয়েই মহাফেজখানা ভাবে এবং সমাজ ভাবনার সূত্র মহাফেজখানা থেকে পাওয়া যায়। প্রশাসনের দায়িত্ব সামাজিক মঙ্গলের স্বার্থে নথিপত্র তৈরি করা। মহাফেজখানার দায়িত্ব হল সেই নথি নির্দিষ্ট সময়কালের পরে সমাজের সামনে তুলে ধরা। ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা মহাফেজখানার তৎপরতায় সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা জেনে যান। এবং অতীত প্রশাসনের স্বচ্ছতা মহাফেজখানাই বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পারে।

আমি লিখেছি মহাফেজখানা ঠিক অর্থে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের সম্মিলিত বিভাগ; যেখানে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়, সব নদী যেমন সমুদ্রে মিশে তৈরি করে বিশাল জলাশয় তেমনই সরকারের সব বিভাগের নথি নিয়ে তৈরি হয় সরকারেরই বিশাল সংরক্ষণাগার। ফেলে আসা দিনের টুকরো-টুকরো ছবি দিয়ে সৃষ্টি হয় এক বিশাল সামাজিক 'ক্যানভাস'।

মহাফেজখানার তথ্য দেখে অতীত প্রশাসন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষজন কৌতূহলী হয়ে পড়ে, প্রশাসনের ওপর সাধারণের আস্থা বাড়ে মহাফেজখানার সম্পদ/বৈভব দেখে। মহাফেজখানা সম্বন্ধে কৌতূহলী মানুষজন পুরোনো নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারেন প্রশাসন কোনো কিছুই গোপন করতে চায় না। তিরিশ-চল্লিশ বা আরও বছর আগে প্রশাসন কীভাবে সাধারণ মানুষজনের স্বার্থে কাজ করেছিল তার হিসেব পাওয়া যায় পুরোনো সব নথিপত্র থেকে। এইভাবে দেখলে সর্বজনীন স্বার্থের প্রেক্ষিতে সব সময়েই মহফেজখানাকে এক বিশাল সামাজিক দর্পণ বলে মনে হবে।

মহাফেজখানার সমস্ত নথিই আমাদেব জন্য নির্দিষ্ট করা সময় কাল বা শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানের সাঁকো বিশেষ। এই সমস্ত নথির সাঁকো ধরে আমরা ফিরে যেতে পারি বর্তমান থেকে দূর অতীতে যেখানে ছিলাম না আমরা। পুরোনো নথিই আমাদের কখনো-কখনো জানিয়ে দেয় আজকের যে সমস্যা নিয়ে এখন আমরা বিব্রত, অতীতে কীভাবে সেই সমস্যা আমাদেব পূর্বসূরিরা সমাধান করেছিলেন। বর্তমান প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ কীভাবে আপাতবাতিল নথির সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা যায় তার হদিস এই পুরোনো নথিই দিতে পারে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই মহাফেজখানা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, যা ঠিক হয় না। প্রশাসনের মূল লক্ষ্যই হল সাধারণের স্বার্থে কাজ করা। 'ক্লোজড' নথি থেকে বর্তমান সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—'আর্কাইভস' এখানে রেফারেন্স একজন প্রশাসকের কাছে। এর অন্য দিকও আছে। সব সময়ে অতীতের ওপর নির্ভর করে থাকলে কাজের স্পৃহা বা উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে প্রশাসনকে সতর্ক হয়ে 'ক্লোজড' নথির সাহায্য নিতে হয়, কেন-না অনেক সময় অতীত রোমন্থন বর্তমান সমস্যা সমাধানের পথে অন্তরায় হয়ে পড়ে। শেষে লেখা যায় মহাফেজখানার বিপুল সম্পদকে আমরা দেখতে পারি (১) সক্রিয় ও (২) নিষ্ক্রিয় তথ্য হিসেবে। সক্রিয় তথ্য আমাদের সামনে প্রোজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে কাজ করে যা আমাদের সতত সামাজিক মঙ্গালে প্রাণিত করে। এই সমস্ত তথ্য তখনই নিষ্ক্রিয় তথ্যে পরিণত হয় যখন তা 'বাজে, বাতিল' কাগজ হিসাবে দেখতে শুরু করি আমরা। অন্যভাবে বলা যায় এই সমস্ত তথ্য 'নিষ্ক্রিয়' কেন-না বর্তমান সময়ের গর্ভ থেকে এর উৎপত্তি হয়নি, মহাফেজখানার সম্পদ দূর অতীতের গর্ভে নিষ্ক্রিয় থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মহাফেজখানা বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্রে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে তারা আপাতদৃষ্টিতে অব্যবহার্য নথিপত্র যা প্রশাসনের কাজে লাগবে না সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহে প্রস্তুত। 'অতীত' এইভাবে মহাফেজখানায় স্থানান্তরিত হয়। মহাফেজখানার ভূমিকা এখানে কোনো 'অছি'র মতন যেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে অতীত খুঁড়ে বর্তমানের 'খনিজ সম্পদ' আহরণ করা হবে। প্রশাসন বর্তমানের প্রয়োজনে যে নথি তৈরি করে মহাফেজখানা তিরিশ-পঞ্চাশ বছর পর অতীত খুঁজতে সেই প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ওপর আলো ফেলে।

সাংগঠনিক দিক থেকে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও মহাফেজখানার সম্পর্ক 'কর্ম বিভাজনের' ওপর নির্ভর করে থাকে অর্থাৎ মহাফেজখানা প্রশাসনের নথিপত্র সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করে তৃতীয় পক্ষের হাতে তুলে দেয়। প্রশাসন ও মহাফেজখানার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ গবেষক অর্থাৎ যাঁরা অতীতসন্ধানী। মহাফেজখানার এই তৃতীয়পক্ষের জন্য নথিপত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়। তৈরি হয় নথিপত্র ব্যবহারবিধি (রেফারেন্স মিডিয়া) এবং এইভাবেই মহাফেজখানার দ্বিবিধ চরিত্র (প্রশাসনের ও গবেষকের স্বার্থে) ঠিক হয়ে পড়ে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও তাদের মহাফেজখানা সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। ফলত প্রশাসনিক বিভাগ, মহাফেজখানা আর গবেষকদের নিয়ে যে বলয় গড়ে ওঠে সেখানেই পাওয়া যায় সরকারি বে-সরকারি কর্মকাণ্ডের চলমান ছবি। বর্তমান অতীতের সাঁকো ধরে ভবিষ্যতে পৌঁছে যায়, মহাফেজখানার অবস্থান প্রশাসন ও সমাজের মধ্যবর্তী স্থানে।

আপাতদৃষ্টিতে মূল্যহীন তাৎক্ষণিক প্রয়োজন শূন্য নথিপত্র মহাফেজখানার নিরাপদ আশ্রয়ে নতুনভাবে পরিচিত হয় এবং এই স্থান পরিচিত হয় '. Irreplaceable as an interface between both sides, administration and citizens.' সমাজ প্রশাসনের মিলন স্থান না থাকলে আমরা কোথায় খুঁজতাম বঙ্গভঙ্গের অনুপুঙ্খ ইতিহাস?

সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক

আদৌ চিন্তা না করে সরাসরি লেখা যায় ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মহাফেজখানায় প্রায় সমস্ত নথিই প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ রাজের তৈরি। সতেরো-আঠারো শতকের ফরাসি, পোর্তুগিজ, ডাচ প্রভৃতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেরও কিছু কিছু কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায়। বাণিজ্য বিস্তার, অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাস্ত হয়ে এই দেশ থেকে ফিরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক মহাফেজখানায় রয়ে গিয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানায় (লেখ্যাগারে) চুঁচুড়া নিয়ে ১০ খণ্ডের (১৭০২–১৮২৭) ডাচ পট্টা আর শ্রীরামপুরে (ফ্রেডরিক নগর) দিনেমারদের ৭৫ খণ্ডের (১৮০৪–১৮৪৫) দলিলপত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।[১] ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে পোর্তুগিজরা সর্বপ্রথম এ দেশে আসে, তারা অবশ্য পশ্চিম ভারতের গোয়া দমন দিউযের বাইরে যেতে পারেনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের নথি সংগ্রহালযগুলির সূচনা হয পরে স্বাভাবিক পথে ব্রিটিশ রাজ্যের নথিপত্রে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। আঠারো-উনিশ শতকে সারা দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও পরে সেই সাফল্যকে স্থায়িত্ব দিতে সারা ভারত জুড়ে যে প্রশাসনিক কাঠামো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজ গড়ে তুলেছিল তারই ছত্রছায়ায় আমাদের মহাফেজখানাগুলির প্রাথমিক সূচনা বলা চলে। সহজ ভাষায় লেখা চলে প্রথমে অর্থনৈতিক পরে রাজনৈতিক প্রয়োজনে দরকার হয়েছিল অজস্র দলিল দস্তাবেজ বা নানা বিষয়ের নথিপত্র, আর বড়ো দাযিত্ব নিয়ে, অতি সচেতন সতর্কভাবে, অখ্যাত অজ্ঞাত রাইটারদের তৈরি এই সমস্ত নথিপত্র, সঠিক অর্থেই সোনার খনি বিশেষ। আমাদের আঠারো-উনিশ-বিশ শতকের বাংলা বাঙালির সুখ-দুঃখের ইতিহাস এই সমস্ত নথির ছত্রে-ছত্রে খুঁজলে পাওয়া যায়।

সতেরো-আঠারো শতকে ভিনদেশি এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের সুনিপুণ প্রশাসনিক বলয গড়ে তুললেও তাদের শুরুর নথিপত্র আমাদের হাতে নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবচেয়ে পুরোনো নথির সন্ধান মেলে বোম্বাই সংগ্রহশালায়। এখানে ১৬৩০-এর ২৬ জুলাই লেখা একটি চিঠি সংরক্ষিত।[২] অন্যদিকে মাদ্রাজ সংগ্রহালয়ের

প্রাচীনতম নথিটির সময় ১৬৭০, তারিখ উল্লেখ নেই এখানে।[৩] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার ক্ষেত্রে জানুয়ারি ৪—৭, ১৭৫৮ সালে সবচেয়ে পুরোনো দলিলের সময়।[৪] আমরা ১৭৫৮-উত্তর নথিপত্রের খোঁজ খবর নিতে পারি।

কাল, সময় নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাক। মূল বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। শুরু থেকে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে কোম্পানি দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল . ১) সুষ্ঠু সংরক্ষণ, ২) পরিচ্ছন্নতা। কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠী বারংবার এ-দুটি বিষয়ে কলকাতা প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সুষ্ঠু ও সতর্কভাবে নথিপত্র সংরক্ষণ করা যেমন অপরিহার্য তেমনই জরুরি নথিপত্র তৈরিতে পরিচ্ছন্নতার। মার্চ ২৫, ১৭৫৭তে লন্ডন থেকে এক চিঠিতে কলকাতার প্রশাসকদের জানানো হয় দলিল দস্তাবেজে হাতের লেখা কেমন হবে। কোম্পানি অভিজ্ঞ পরিচালকেরা জানতেন অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর বর্তমানের মতন ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে বা করতে পারে। হাতের লেখার পাঠোদ্ধার যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেই নথির মূল্য কে দেবে? ফলত এমন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মনে রেখে এই তারিখের চিঠিতে নির্দেশ এসেছিল হাতের লেখা হবে '... in full, plain and round.' কখনোই loose নয়।[৫] এই নির্দেশ শুরুতে মানা হয়নি অন্তত কোম্পানির কলকাতা প্রশাসকরা এই নির্দেশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি প্রথমে। অস্পষ্ট অগোছালো হাতের লেখায় বিব্রত পরিচালক গোষ্ঠী ওই চিঠির এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ মার্চ ৩, ১৭৫৮তে আর এক চিঠিতে কলকাতা প্রশাসকদের জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন '... your consultations for these several years past wrote in such a vile manner as not to be legible.'[৬] এই চিঠিতে একটু ক্ষোভের সঙ্গে লেখা হয় কোম্পানির কলকাতা দপ্তরে সব কিছুই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে, এখানে নির্ঘণ্ট তৈরি হয় না, প্রস্তুত হয় না 'অফিস রেজিস্টার' হাতের লেখা ও পাঠোদ্ধারের অযোগ্য। কোম্পানির কলকাতা দপ্তরকে সতর্ক করা ভিন্ন অন্য রাস্তা ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কোম্পানির কলকাতা শাখার তুলনায় মাদ্রাজের অবস্থা উন্নতমানের ছিল। বিশেষ করে মহাফেজখানা সম্পৃক্ত বিষয়ে তাদের কর্মকাণ্ড যথার্থই তারিফযোগ্য ছিল। কোম্পানির মাদ্রাজ দপ্তরে যেভাবে সরকারি নথিপত্রের নির্ঘণ্ট তৈরি করা হত তা যে কলকাতার পক্ষে অনুকরণযোগ্য তাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।[৭]

বাংলা বিভাগে মহাফেজখানার সূচনা

কীভাবে বাংলা সরকার ১৯১০ সালে বাংলা বিভাগে লেখ্য প্রশাসন গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের এক ঝলক দৃষ্টি দেওয়া উচিত আঠারো-উনিশ শতকের বিভাগীয় সংগ্রহালয়ের দিকে। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রধান বা কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় গড়ে ওঠার আগে বিভাগীয় সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল। পরে বোঝা গিয়েছিল ভিন্ন-ভিন্নভাবে শাখা সংগ্রহালয় গড়ে তোলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় স্তরে সমস্ত বিভাগের সংরক্ষণযোগ্য অ-চলতি (নন কারেন্ট) নথি নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রহালয় গড়ে তোলা জরুরি। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে ১৯১০ সালে যে সংগ্রহালয়

গড়ে উঠেছিল তার অন্তত একশো বছরেরও আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাবলিক ও সিক্রেট দপ্তরে বিভাগীয় সংগ্রহ কক্ষ তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শৈলেন ঘোষ তাঁর *ইন্ডিয়ান আর্কাইভস* গ্রন্থে।[৮] বর্তমানে এই দুই দপ্তরের নথিপত্র দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ে। আমি অন্য সংগ্রহালয় নিয়ে আলোচনা করব।

জেনারেল রেকর্ড অফিস

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আঠারো শতকের সাতের দশক অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের সময় থেকে এই বাণিজ্যিক লেনদেনের পাশে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। পাঁচশালা, দশশালা ও শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী বাংলা দেশের কৃষিভিত্তিক সমাজে বড়ো ধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে ক্ষমতার যে অভিনব বিন্যাস ঘটেছিল তার মূলে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

কোম্পানি যুগে ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় তথ্য ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ। এই কারণে এই ধরনের দলিল দস্তাবেজের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। জমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো পক্ষই তাদের স্বার্থরক্ষায় এই সমস্ত নথিপত্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হত। যেমন একজন ভূস্বামী সরকারের অন্যায় চাহিদা প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হত যদি জানত সরকারি নথিতে তার অধিকার নথিবদ্ধ আছে, তেমনই কোনো ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বভোগীর শোষণের বিরুদ্ধে একজন কৃষক সরকারি দলিলের আশ্রয় থেকে লড়াই করতে পারত। আর শাসকশ্রেণি সব সময়েই জানতে পারত বাংলা বিভাগের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার বাৎসরিক শস্য উৎপাদন, খাজনা আদায়ের হার এমনকি এই উপার্জনের জন্য তার খরচের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়।

প্রশাসন চালাতে গেলে প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে রাখা সব সময়েই জরুরি। আঠারো শতকের সাতের দশক থেকে ঐতিহ্যআশ্রয়ী কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজে যে পালা বদলের সূচনা হয় তার যে নিখুঁত বর্ণনা আছে এই সময়ের রাজস্ব পর্ষদ ও রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে, কোম্পানির পদস্থ কর্তা ব্যক্তিরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এই কারণে এই সমস্ত নথিপত্রের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যবহার করার উপায় নির্ধারণ করা প্রশাসনের কাছে জরুরি হয়ে দেখা দেয় উনিশ শতকের প্রথম থেকে। রাজস্ব পর্ষদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আর. রক-ই প্রথম যিনি এ-বিষয়ে সরকারকে অবহিত করেন। রকেরই উৎসাহ ও আগ্রহে এই সমস্ত নথিপত্র নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলার প্রথম 'নথিশালা' বা জেনারেল রেকর্ড অফিস বা মহাফেজখানা। আমরা রকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

রকের বক্তব্য

১৮১৫ সালের ১৩ জুন আর. রক ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযথ

সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে তৈরি করেন এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে রক জানিয়েছিলেন কেন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। রক সরকারকে বাংলা বিভাগের জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আধিকারিকের অধীনে এই দপ্তর গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন। রকের প্রস্তাব ছিল বাংলা বিভাগের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত দলিল দস্তাবেজ এই আধিকারিকের অধীনে সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করা।[৯] রকের প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল ওই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে সরকারি স্বার্থ বা ঔপনিবেশিক অধিকার সুরক্ষিত করা।

রাজস্ব ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র সংরক্ষণ ও এর জন্যে প্রস্তাবিত নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলা নিয়ে মার্চ ১৭, ১৮২০তে রাজস্ব দপ্তর তৈরি করে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই দীর্ঘ প্রতিবেদনে রাজস্ব দপ্তর ক্ষোভের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিল যে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা দপ্তরের নথিপত্র সংরক্ষণে খুব সামান্যই নজর দেওয়া হয়েছে এবং ফলে সরকারি ও ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং যথোপযুক্ত নথি সংগ্রহালয় স্থাপন করা খুবই দরকার।[১০] ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব নথিপত্র সম্বন্ধে রাজস্ব দপ্তরের ইতিবাচক আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা বিভাগে এই তারিখ থেকেই ভূমি-রাজস্ব নথি সংগ্রহালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এই দপ্তরের নাম হয় 'জেনারেল রেকর্ড অফিস'। এমনই বিভাগ বোম্বেতে গড়ে উঠেছিল ১৮২১ সালে।

রাজস্ব দপ্তরের ওই প্রতিবেদনের শুরুতে লেখা হয়েছে এই দপ্তরের সাফল্য বা উপযোগিতা প্রধানত নির্ভর করবে মূলত বিভিন্ন জেলায় যেভাবে নথিপত্র রাখা হয় তার ওপর। বিশ্লেষণধর্মী ভঙ্গিতে রাজস্ব দপ্তর লিখেছিল বিভিন্ন জেলায় যে পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ভূমি-রাজস্ব নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে 'জেনারেল অফিস'-এ তারই প্রতিফলন ঘটবে। রাজস্ব দপ্তর গুরুত্ব দিয়েছিল এখানে মূলত দুটি বিশেষ শব্দ 'accuracy' ও 'regularity'র ওপর। এই দপ্তর মনে করেছিল জেলা স্তরে সুষ্ঠুভাবে এবং নিয়ম করে নথিপত্র সংরক্ষণ করা হলে কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে যথাযথভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা হবে না।[১১]

রাজস্ব দপ্তরের ওই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ ছিল মূলত এক ধরনের নির্দেশিকা। যেমন জেলা স্তরের এমনই এক নির্দেশিকায় আমরা জানতে পারি সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে 'জেনারেল রেকর্ড' দপ্তরে জমা দিতে হবে, তৈরি করতে হবে বিভিন্ন প্রতিবেদন, চিঠির সারাংশ, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় বা এই 'জেনারেল রেকর্ড' দপ্তরে স্থানান্তরিত করার জন্য। জেলার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সম্বন্ধে বলা হল : 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের প্রামাণিক অনুলিপি এইভাবেই সংরক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে।'[১২]

১৮২০ সালের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই অভিনব, ওই নথি সংগ্রহালয়ের বিরাট দায়দায়িত্ব ও কাজের ভার শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের একার তদারকি বা দেখভালের বিষয় হতে পারে না, এই প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি করার মতন তদারকি

সংস্থারও প্রয়োজন আছে, সেই সময়কার প্রশাসকদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

সুতরাং 'জেনারেল রেকর্ড' দপ্তরের সহায়ক সংস্থা হিসেবে সারা বাংলায় গড়ে উঠল মুখ্য ও আঞ্চলিক নথিপর্ষদ ('প্রেসিডেন্সি কমিটি অভ রেকর্ডস' ও 'রিজিয়োন্যাল মফস্‌সল কমিটিস') ; ১৮২০ সালে বাংলা বিভাগের সীমা বিস্তৃত ছিল সুদূর দিল্লি পর্যন্ত। এই দুই নথি পর্ষদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন ধরনের নথিপত্রের তালিকা তৈরি করে সুষ্ঠু রক্ষণের ব্যবস্থা করা।[১৩]

প্রেসিডেন্সি বা মুখ্য নথি পর্ষদের কাজের সীমার মধ্যে ছিল (১) সদর দেওয়ানি আদালত, (২) বিভিন্ন রাজস্ব গণন বিষয়ক নথিপত্রের দেখভাল করা, অন্যদিকে আঞ্চলিক নথিপর্ষদ আঞ্চলিক বিচারালয় ও জেলা সমাহর্তা দপ্তরের নথিপত্রের ওপর নজর রাখত। আজকের বিভিন্ন মহাফেজখানা বা অভিলেখালয়ের বিচিত্র কর্মবিন্যাসের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ বৈপ্লবিক মনে হতে পারে। ফলত যে দায়িত্ব এই দুই পর্ষদের হাতে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কাজের সীমানা যেভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাতে প্রমাণ হয় ১৮২০'র ওই ব্যবস্থা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল।

স্থায়ী নথিপর্ষদ : জেলা নথিপর্ষদ[১৪]

মুখ্য এবং আঞ্চলিক নথিপর্ষদ গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ১৮২০'র দশকে এক ভিন- দেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণে বড়ো ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা চলে ওই সরকারি সচেতনতা পরোক্ষে আমাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জগৎটাকে প্রসারিত করেছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থের পটভূমিতে এই প্রচেষ্টা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল বাংলা সামাজিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য এক উৎস।

১৮২০ সালের ১৭ মার্চ স্থায়ী নথি সংগ্রহালয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গড়ে তোলা হয়েছিল 'কমিটি অভ রেকর্ডস' বা নথি পর্ষদ। এই পর্ষদের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল। আর অন্য সদস্যরা ছিলেন ১) রাজস্ব পর্ষদের কনিষ্ঠ সদস্য, ২) সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক, ৩) বিচার বিভাগের সচিব, ৪) রাজস্ব বিভাগের সচিব, ৫) আইন বিশেষজ্ঞ। ওই পর্ষদ কেন গঠন করা হয় ? সরকারি প্রতিবেদন থেকে যা আমরা জেনেছি : ১) প্রধান নথি সংগ্রহালয়ের কাজ দেখভাল ২) মফস্‌সল নথি সংগ্রহালয়ের জন্য সাধারণ নিয়মনীতি তৈরি ৩) একই নিয়মনীতি অনুসরণ করে মফস্‌সল ও জেলা সংগ্রহালয়ের নথিপত্রের তালিকা, সারাংশ তৈরি করে প্রধান সংগ্রহালয়ের হস্তান্তরণের ব্যবস্থা করাই ছিল এই স্থায়ী পর্ষদের প্রধান ও মৌলিক কর্তব্য। ওই পর্ষদের তাৎক্ষণিক দায়িত্বের মধ্যে ছিল ভূমি, ভূ-সম্পত্তি, ভূমির ভোগ দখল ও খাজনার হার সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। পর্ষদের সদস্যদের বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ধরনের তথ্য সংবলিত নথিপত্রের খোঁজ নেওয়া। পর্ষদ সদস্যদের নিয়োগপত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে যে তাঁদের এই বর্তমান

নিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হল, 'For the preparation and preservation of public records at the presidency.' এই পর্ষদের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হল জেলা পর্ষদ বা 'ডিস্ট্রিক্ট কমিটি'। জেলা পর্ষদগুলি সরাসরিভাবে মুখ্য পর্ষদ বা প্রেসিডেন্সি কমিটির অধীনে ছিল। স্থায়ী পর্ষদের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পর্ষদগুলিকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৫]

ওই সমস্ত জেলা পর্ষদগুলি গঠিত হয়েছিল জেলা বিচারপতি ও জেলা সমাহর্তাদের (কালেক্টর) নিয়ে। ১৮২০ সালের ১৭ মার্চের এক প্রতিবেদনে চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, বেনারস ও রায়বেরিলিতে জেলা পর্ষদ গঠনের সংবাদ আমরা জানতে পারি। এঁদের দায়িত্ব ছিল : ১) নিজ নিজ জেলার নথিপত্রের বর্তমান অবস্থার খোঁজ রাখা, ২) মুখ্য নথিপর্ষদের নির্দেশ অনুসারে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ সংকলন করা ও ৩) মুখ্য নথিপর্ষদকে বর্তমান নথিপত্রের অপূর্ণতা পূরণ করার জন্য যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া।[১৬]

১৮২০ ও পরবর্তী সময়ে বাংলা বিভাগে সরকারি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মহকুমা, জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরে যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় তার নজির পরে খুব কম মিলেছিল। যে প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মুখ্য নথিপর্ষদ কাজ শুরু করেছিল তা কেবল অভিনবই ছিল না, জটিলও ছিল। গ্রামীণ কৃষি সমাজের কাঠামোগত বিন্যাস ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা এই পর্ষদের দায়িত্বে ছিল। গ্রামাঞ্চলে বংশ পরম্পরায় চলে আসা স্মৃতিকথাও এই সংগ্রহের তালিকায় ছিল। ১৮২০'র প্রতিবেদনে লেখা আছে ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠী বুঝতে ভুল করেনি আমাদের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের অনেক অলিখিত তথ্য, উপাদান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। লিখিত আর অলিখিত তথ্যের মেলবন্ধনে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজের ছবি।

মুখ্য নথিপর্ষদের দাযিত্ব শুধু তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঠিক করা ছিল না, তথ্যের প্রকাশনাও এই সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব ছিল। ওই প্রকাশনা কেন ? ওই প্রতিবেদনে লেখা হযেছে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত প্রকাশিত নির্বাচিত অংশ ও বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা ও মফস্সল আদালতে সেই প্রকাশনা বণ্টন করে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন চালাতে সাহায্য করা ও যে আইনের ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে কোম্পানির আধিকারিকদের পরিচয় করানোই ছিল এই প্রকাশনার লক্ষ্য। আগস্ট ১৮২০তে লেখা নথিপর্ষদের এক দীর্ঘ শ্বেতপত্রে নির্দিষ্ট করে বলা হল যে এই পর্ষদ কী করতে চায়।[১৭]

মহকুমা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ (প্রেসিডেন্সি), বা কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণের প্রশ্নে এক ধরনের দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সরকারের এই সিদ্ধান্তে। কোন ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন নিয়ম কোথায় প্রয়োগ করা যায় এমন চিন্তাভাবনা বাংলা দেশের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ইতিহাসের পালাবদলের সন্ধিক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল।

সংক্ষেপে আমরা লিখতে পারি নথিপর্ষদের প্রস্তাবিত কাজের মধ্যে ছিল :

১. জেলা ও বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা,
২. সন, তারিখ ও বর্ণমালা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় নথিবন্ধ করা,
৩. প্রেসিডেন্সি দপ্তরে নির্ঘণ্টের অনুলিপি তৈরি করা,
৪. 'মালগুজারি', 'লাখেরাজ' সম্পত্তির ভিন্ন-ভিন্ন নিবন্ধ পুস্তক তৈরি করা,
৫. প্রতিটি মহলের পরিচয় নিবন্ধ পুস্তকে বর্ণমালা অনুযায়ী নথিবন্ধ করা,
৬. গ্রামের জমির মালিকের অধিকার (রাইট)-এর বর্ণনা ভিন্ন-ভিন্ন নিবন্ধ পুস্তকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ইত্যাদি।[১৮]

ওই সমস্ত প্রস্তাবনায় কোম্পানির সেই সময়কার ভূ-সম্পত্তির কাঠামোগত বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই আমরা। প্রশাসনিক দিক থেকে বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়ে পড়েছিল এই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়। এখানে সরকারের অধিকারের সীমানা যেমন জানতে পারত একজন আধিকারিক তেমনই প্রতিপক্ষের অধিকারও তাদের দৃষ্টি বলয়ে ছিল। আর শুরুতে যে ব্যবস্থা প্রশাসনের স্বার্থ সুরক্ষিত করেছিল, পরবর্তী পর্যায়ে সেই ব্যবস্থাই গবেষকদের স্বার্থরক্ষার কবচকুণ্ডল হয়ে পড়ে। প্রতিটি সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানার বৈশিষ্ট্য এইখানে।

কয়েকটি আঞ্চলিক নথিপর্ষদের পরিচয়

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনে বাংলা বিভাগে এই সময় পঁয়তাল্লিশটি আঞ্চলিক নথিপর্ষদ গড়ে ওঠে। উত্তরে আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস থেকে পূর্বভারতে সুদূর সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব নথিপত্রের দেখভাল করাই ছিল এই সমস্ত আঞ্চলিক পর্ষদগুলির কাজ। বিভিন্ন পর্ষদের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এই সমস্ত অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদির সংরক্ষণে তারা কী ধরনের কাজ করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানায় 'প্রেসিডেন্সি কমিটি'র ওপর যে বিপুল নথিপত্র সংরক্ষিত আছে তার ওপর চোখ রাখলে আমরা বুঝতে পারব ওই সমস্ত আঞ্চলিক পর্ষদগুলি কী কাজ করেছিল বা এই কাজ করতে তাদের কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই ধরনের কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের একই সঙ্গে ফারসি, বাংলা ও হিন্দুস্থানি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে হত।

উল্লিখিত সময়ে প্রেসিডেন্সি কমিটি বা মুখ্য নথিপর্ষদের নথিপত্রে পাওয়া যায় যে ভাষা সমস্যা অনেক সময়েই বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের তালিকা প্রস্তুতের কালে বড়ো রকমের সমস্যা তৈরি করেছিল। মূল শব্দের পরিচয় বা সেই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা না থাকলে নির্ঘণ্ট, তালিকা প্রস্তুত বা তার সারাংশ তৈরি খুব কঠিন হয়ে উঠত সে বিষয়ে বারংবার এই সময়ের নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নথিপর্ষদের কর্মচারীদের ইংরেজি জ্ঞানের অভাবও পীড়াদায়ক হয়ে উঠত, উদাহরণ দেওয়া যায়।

উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরে সংগ্রহালয়ের মূল সমস্যা ছিল ইংরেজি জানা কর্মীর অভাব। মুখ্য নথিপর্ষদের প্রধান আই. ফ্রেজারকে এই অঞ্চলের কালেক্টর এই সমস্যার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় শতকে এই অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন হয়নি, স্বাভাবিক কারণে ইংরেজি জানা লোকের অভাব প্রশাসনিক কাজে প্রকট হয়ে পড়েছিল।[১৯] বাংলা বিভাগের সর্বত্র এই সমস্যা ছিল। স্থানভেদে সমস্যা চরিত্র ছিল ভিন্ন ধরনের। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা জানার অভাব যে সমস্যা তৈরি করেছিল তেমনই বাংলা দেশের যশোহর সংগ্রহালয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল অন্য ধরনের।

১৮২৬ সালে যশোহর নথিপর্ষদ নিবন্ধকের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি '...the general Index, Malgoozari Mahal registers as well the index register contain innumerable inaccuracies in the conversion of name.' তাঁর প্রস্তাব ছিল এই সমস্ত ভুল সংশোধন করে সব পুস্তকই নতুন করে লেখা উচিত।[২০]

যশোহর নথি সংগ্রহালয়ের ওই ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বীকার করেছিলেন বাংলা ও ফারসি ভাষায় তাঁর জ্ঞান যৎসামান্য এবং এই কারণে বাংলা ও ফারসি শব্দের যথাযথ অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই আধিকারিক যা লিখেছেন '...a mahal in the Malgoozari Register is Dyee, but in the Bengalee it is spelt. 'দেড়ী' which I would convert in to 'deree'.' তাঁর প্রশ্ন কোনটা ঠিক? যশোহরের মতন হুগলি নথিপর্ষদের অবস্থা একই ছিল। মূল ফারসি শব্দ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করাই ছিল প্রকৃত সমস্যা। তবুও নানান অসুবিধা ও সমস্যার মধ্যে বেনারস ও আগ্রার নথিপর্ষদ উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেছিল, মুখ্য নথিপর্ষদের প্রতিবেদনে সে-কথা স্পষ্ট করে বলা আছে।[২১]

লিখতে বাধা নেই আঞ্চলিক শব্দের সঠিক প্রয়োগ ও ফারসি, ইংরাজিতে ওই সমস্ত শব্দের যথাযথ অনুবাদের সমস্যা শুরু থেকেই বাংলা বিভাগের নথি সংগ্রহালয়গুলির সামনে বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। মুখ্য নথিপর্ষদ একাধিকবার ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল প্রত্যাশা মতন সবকিছু হয়নি।[২২]

পূর্বোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮২৭-২৮ সালে হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিভিন্ন আঞ্চলিক নথিপর্ষদের দপ্তরে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। এই সময়ে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ফারসি, বাংলা ভাষার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করা হত যা নাকি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮২৯ সালে সরকার আর্থিক কারণে মুখ্য নথিপর্ষদ ও অন্যান্য সমভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিল।[২৩]

আর্থিক কারণ ভিন্ন আমি লিখেছি বহুলাংশে ভাষা সমস্যাজনিত কারণে বিভিন্ন নথি সংগ্রহালয় ১৮২৭-২৮-এর পর চরম সংকটে পড়েছিল। রাজ্য মহাফেজখানায় রক্ষিত 'প্রেসিডেন্সি কমিটি অভ রেকর্ডস'-এর নথিপত্রে এর প্রমাণ মিলবে। একই সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা ও ফারসি শব্দের যথাযথ অর্থ জানা অনেক কর্মীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংরেজি

থেকে ফারসিতে বা ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল। কৃষি, ভূমি সম্পর্কিত শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা বা অর্থও অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। ফলত এই ধরনের বৌদ্ধিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারের ওই আর্থিক সংকট। পর-পর ক'বছরের ঘাটতি বাজেটে বিব্রত সরকারের কাছে 'জেনারেল রেকর্ড অফিস' ও সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজ সংক্রান্ত পর্ষদ শাখা ও প্রশাখার অবসান ঘটানো ভিন্ন অন্য বিকল্প ছিল না। 'জেনারেল রেকর্ড অফিস' লুপ্ত হলেও, তবু এর স্থায়ী প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। প্রায় তিরিশ বছর পর কোম্পানি রাজত্বের শেষে আর ব্রিটিশ রাজের সূচনায় নতুন করে সরকারি দলিল দস্তাবেজ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হল।

১৮৬০ সালের আগস্টে 'সিভিল ফিনান্স কমিশন'-এর সচিব ডব্লিউ. এস. হলসে, বাংলা সরকারের সচিবকে লেখা চিঠিতে অপ্রয়োজনীয় ও ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্র ধ্বংস ও সংরক্ষণ করা সম্বন্ধে এই সরকারের মতামত চান। হলসে সমস্ত প্রকার দলিল দস্তাবেজের পরিবর্তে পরিসংখ্যানগত ও ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হলসে'র বক্তব্য ছিল সমস্ত প্রকার দলিলপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে শুধু যে ভবিষ্যতে স্থানাভাব ঘটবে তা নয়, অকারণে আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গঠন করা হল 'রেকর্ড কমিটি', হলসে'র ওই বিশেষ বিজ্ঞপ্তির ঠিক এক বছর পর।[২৪]

'রেকর্ড কমিটি' সরকারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে দীর্ঘ সময় শেষে স্বীকৃত ঐতিহাসিক ও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষণের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কমিটি ঠিক যা বলেছিল : '...the greater portion of the papers had passed into that of purely historical and statistical interest... such of original documents should be preserved in a single muniment room.'[২৫]

'রেকর্ড কমিশন' সরকারি নথির মূল্যায়নে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল। কিন্তু এই সংগ্রহালয় বা 'মুনিমেন্ট রুম'-এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ১৮৯১ পর্যন্ত—যে বছর গড়ে তোলা হয় কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয়। অন্যদিকে দ্বিধা না রেখে বলা চলে, ১৮৬০'র পর বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছিল মহাফেজখানা, বিশ শতকের সূচনায় আমাদের অবহেলিত নথিপত্রের জগৎটা নতুন মাত্রা পায় : সরকারি নথিপত্রের ধূসর বিবর্ণ পৃথিবীটা দ্রুত পালটাতে শুরু করে, সেই পরিবর্তনের কথা লিখব।

প্রথম পর্ব

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব (১৯০৪–১৯০৯)

উনিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা বিভাগে রাজস্ব দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ নিয়ে যে 'জেনারেল রেকর্ড অফিস' গড়ে উঠেছিল সেই প্রতিষ্ঠানই ছিল কোম্পানি আমলের প্রথম নথি সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানা যা নানা কারণে স্থায়ী হতে পারেনি। স্থায়ী হলে বাংলা দেশের মহাফেজখানার ইতিহাসে অন্য মাত্রা যুক্ত হত।

অন্যদিকে লক্ষণীয় সচেতনতার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় বা 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুম', আর বাংলা সচিবালয়ের দলিল দস্তাবেজের ওপর ধুলোর আস্তরণ নিশ্চিতভাবে ঘনীভূত হতে থাকল। অবস্থা অবশ্য পালটিয়ে যেতে থাকে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে।

ওই সময় অর্থাৎ ১৯০১-০২ থেকে বাংলা বিভাগের প্রতিটি ছোটো বড়ো জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরের নথিপত্র সুবিন্যস্ত করার কাজ শুরু হয়। নথিপত্রের শ্রেণিকরণ করে সংরক্ষণ করা হতে থাকে জেলা রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায়। কোম্পানি আমলের দলিলপত্র ও আধুনিককালের তিন চার বছরের পুরোনো নথিপত্র নিয়ে ওই সমস্ত জেলা রেকর্ডরুম গোছানো শুরু হয়।[১] বাংলা বিভাগের প্রায় প্রত্যেক জেলায়, নিজস্ব পরিকাঠামো অনুযায়ী ছোটো-বড়ো রেকর্ডরুম থাকলেও প্রাদেশিক স্তরে কোনো রেকর্ডরুম ছিল না। এই রেকর্ডরুম গড়ার কাজ শুরু হয় ১৯০৪ সাল থেকে। প্রাক্ প্রস্তুতি পর্ব অবশ্যই ছিল।

উল্লেখ্য বাংলা সচিবালয়ের স্বাধীন নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলায় কেন্দ্রের ইতিবাচক ভূমিকার কথা লেখা যায়। কেন্দ্রই বাংলা সরকারকে প্রাণিত করেছিল এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে। এপ্রিল ১৪, ১৯০৩ সালে বাংলা সরকারকে লেখা কেন্দ্রীয় সরকারের এক চিঠিতে বাংলা সরকারের সচিবালয় ও জেলাস্তরের নথিপত্রের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়। ওই চিঠিতে কলকাতার একই বাড়িতে বাংলা সচিবালয়ের সমস্ত নথিপত্র কেন্দ্রীভূত করে 'রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট' গড়ে তোলা ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে বাংলা সরকারের মতামত ও পরামর্শ চাওয়া হয়।[২]

এই চিঠির উত্তরে বাংলা সরকার জানিয়েছিল যে সম্পূর্ণ উত্তর (Complete Reply) দেওয়ার মতন তথ্য তাদের হাতে নেই, যদিও বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করে প্রাক্ ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।[৩] আমরা এই উত্তর থেকে জানতে পারি কার্যত কোম্পানি আমলের নথিপত্রের মূল্যায়ন,

নির্ঘণ্ট প্রস্তুত ও নথিপত্রের যথাযথ তালিকা তৈরি করে প্রাদেশিক সরকারের নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি আমলের কলকাতা ও মফস্‌সলের সমস্ত নথিপত্র পরিদর্শন করে যথাযথ প্রতিবেদন প্রস্তুতের প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয় পদস্থ আধিকারিক এ. পি. ম্যাদিম্যান'কে। ম্যাদিম্যান এই দায়িত্বে ছিলেন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি ১৬ থেকে জুন ২০ পর্যন্ত। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব রাজস্ব পর্ষদের সচিবকে লিখেছিলেন 'All resonable facilities may be afforded to Muddiman.'[৪] অল্প সময়ের মধ্যে এই আধিকারিক যে কাজ করেছিলেন তা শুধু গুরুত্বপূর্ণই ছিল না, কোম্পানি আমলের নথিপত্রের হালহকিকত সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি ম্যাদিম্যানের প্রতিবেদন থেকে।

১

ম্যাদিম্যান যা করেছিলেন

ম্যাদিম্যান কোম্পানি আমলের নথিপত্রের পাণ্ডুলিপি আকারে কার্যবিবরণী খণ্ড ও নির্ঘণ্ট তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনিই প্রথম মুর্শিদাবাদ রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মেদিনীপুরের কোম্পানি আমলের পুরোনো দলিল দস্তাবেজ (এনসিয়েন্ট ইংলিশ রেকর্ডস) প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ম্যাদিম্যানের গৃহীত ব্যবস্থা সর্বাংশে কেন্দ্রের সমর্থন পায়নি।[৫]

বাংলার সরকার থেকে বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছিল যে, ম্যাদিম্যান যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা যথাসময়ে সম্পূর্ণ হবে, বিভিন্ন দপ্তরের 'প্রসিডিংস ভল্যুম'-এর তালিকা তৈরি করে সুবিন্যস্ত করা হবে, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের ওপর যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা যথাসময়ে সম্পাদনা করা হবে। ম্যাদিম্যানের মূল পরিকল্পনা ছিল—

১. 'এনসিয়েন্ট রেকর্ডস' হিসাবে ছড়িয়ে থাকা নথিপত্রের সন্ধান,

২. ওই সমস্ত নথিপত্রের বর্গীকরণ ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা,

৩. অপ্রয়োজনীয় নথিপত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা করা। এই ধরনের নথিপত্রের মধ্যে ছিল চিঠির খসড়া, অতিরিক্ত প্রসিডিংস ইত্যাদি।[৬]

ওই সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র থেকে আলাদা করার ব্যবস্থা করে অবশ্যই সংরক্ষণের কাজে শৃঙ্খলা আনা হয়। স্থানাভাবের কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরিও ছিল। ম্যাদিম্যানের পর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারের অন্য দুই আধিকারিক, যথাক্রমে এস. এ. হিগন্যাল ও ব্র্যাডলে বার্ট-কে। এস. হিগন্যাল এই দায়িত্বে ছিলেন এপ্রিল ১ থেকে মে ২২, ১৯০৫ পর্যন্ত।[৭]

হিগন্যাল ম্যাদিম্যানের নির্দিষ্ট পথেই নির্ঘণ্ট প্রস্তুত সংক্রান্ত কিছু কাজ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য না হলেও পূর্বসূরির পথের বাইরে যাননি তিনি।

ওই দুজন বিশেষ আধিকারিকের পর প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম সংস্কারের কাজ কিছুদিন স্থগিত ছিল। এরপর দায়িত্বে আসেন ব্রাডলে বার্ট। বার্ট এই পদে ছিলেন জানুয়ারি ২ থেকে এপ্রিল ১, ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। এই সময় বার্ট সরকারের প্রশাসনিক প্রতিবেদন লিখতে ব্যস্ত ছিলেন, রেকর্ডরুম সংক্রান্ত কাজ ছিল তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব।[৮]

বার্ট তাঁর ওই চার মাসের কার্যকলাপের মধ্যে যে সমস্ত সুপারিশ করেন তা অবশ্যই প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কাঠামোগত বিন্যাসের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বার্টের সুপারিশের মধ্যে পাওয়া যায়—

১. ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলা সচিবালয় ও রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র নিয়ে ঐতিহাসিক নথি সংগ্রহালয় গড়ে তোলা,

২. নথিপত্রের ব্যবহার মাধ্যম হিসেবে 'প্রেস লিস্ট' তৈরি,

৩. গুরুত্বহীন নথিপত্র ধ্বংস,

৪. ক্যাটালগ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা,

৫. নথিপত্র যথাযথভাবে সারানো (মেন্ডিং) ও বাঁধানোর (বাইন্ডিং)-এর ব্যবস্থা করা।

বার্টের প্রস্তাব ছিল নথি সংগ্রহালয় কক্ষের 'র‍্যাকগুলি' এমনভাবে সাজাতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাওয়া যায়। বার্টের ভাষায় '...alternation of the racks ... so to give more light and air...'[৯]

বার্টের প্রস্তাবগুলির প্রতিটিই ভবিষ্যৎ নথি রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা গড়ার পথে বড়ো ধরনের অগ্রগতি ছিল। তবু এসবের মধ্যে অন্যতম বোধকরি ঐতিহাসিক সংগ্রহ কক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব। বার্টের এই প্রস্তাব তাঁর উত্তরসূরিরা বাতিল করতে পারেননি, যেমন তাঁরা বার্টের 'প্রেস লিস্ট' প্রীতি মানেননি।

১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সচিবালয়ের বিপুল সংখ্যক নথিপত্রের মূল্যায়ন, সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করার পর বাংলা সরকারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রস্তাবিত রেকর্ডরুমের জন্য স্থায়ী কোনো আধিকারিক নিয়োগ না করে শুধু অস্থায়ীভাবে অল্প দিনের জন্য নিযুক্ত কোনো আধিকারিক দিয়ে এই ধরনের সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হবে না। ফলত নানা সমস্যায় দীর্ণ পীড়িত তথাকথিত এই রেকর্ডরুমের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য দরকার ছিল একজন স্থায়ী আধিকারিক।

উপর্যুক্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে জানুয়ারি ১৯০৯ সালের প্রথম ছ'মাসের জন্য বিশেষ আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয় 'বেঙ্গল ফর্মস' বিভাগের আধিকারিক শ্রীনাথ চক্রবর্তীকে। শ্রীনাথের সময়ে এই সংগ্রহালয়ের অসমাপ্ত বিষয়গুলি ছিল :

১. ব্রাডলে বার্টের প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক নথি সংগ্রহালয় গড়া,

২. ওই সংগ্রহালয়ের জন্য যথোপযুক্ত স্থান সন্ধান,

৩. সচিবালয় ও পর্ষদের নথিপত্রের সংযুক্তিকরণ,

৪. ক্যাটালগ তৈরি করা,

৫. অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাগজপত্র ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেওয়া,

৬. সংরক্ষণ কাজে (বাঁধাই ও সারানো) গুরুত্ব দেওয়া,

৭. নথিপত্রের 'প্রেসলিস্ট' সংক্ষিপ্তসার (ক্যালেন্ডার) ও নির্ঘণ্ট তৈরি করা।[১০]

প্রথমে ছ'মাসের জন্য নিয়োগ করা হলেও পরবর্তীকালে শ্রীনাথকে এই শাখায় পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলত একশো বছরের পুরোনো নথিপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তাবিত এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটির ব্যাবহারিক শাখার দিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন যা তাঁর পূর্বসূরিরা করেননি। তিনি বুঝেছিলেন দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো না গড়ে তুললে প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম গড়ে উঠবে না।

২

শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা

শ্রীনাথ 'রেকর্ডরুম' গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁর অধীনস্থ কর্মীদের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেন। প্রত্যেক কর্মীই জানতেন এই নতুন আধিকারিকের অধীনে তাঁকে কোন কাজ কখন শেষ করতে হবে। কর্মীদের ওপর শ্রীনাথের পরোক্ষ চাপ ছিল যেহেতু শ্রীনাথ জানতেন তাঁর নিয়োগ ছ'মাসের জন্য, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে।

শ্রীনাথ তাঁর প্রতিবেদন সরকারকে পাঠান ১৫ মে ১৯০৯ সালে। তবু তিনি জুন পর্যন্ত কী কাজ করতে চেয়েছিলেন তার হিসেব সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। জুন ১৯০৯ পর্যন্ত শ্রীনাথের কাজের মধ্যে ছিল :

(১) মূল-নথিপত্র পরীক্ষা, (২) প্রসিডিংস-এর সাহায্য নিয়ে হারিয়ে যাওয়া মূল নথির অনুলিপি প্রস্তুত, (৩) অতিরিক্ত অনাবশ্যক দলিলপত্র ধ্বংস, (৪) নথিপত্রের তালিকা তৈরি, (৫) বর্ণমালা অনুসারে বিষয়ভিত্তিক একত্রিত নির্ঘণ্ট (কনসোলিডেটেড ইনডেক্স) করা ইত্যাদি।[১১]

জুন ১৯০৯ পর্যন্ত বাংলা সচিবালয়ের মোট বিভাগ দপ্তরের সংখ্যা ছিল সাত। রাজস্ব, রাজনৈতিক, নিয়োগ, বিচার, সাধারণ, অর্থ ও স্বায়ত্তশাসন। আর ছিল অজস্র ছোটো বড়ো শাখা। এই সাতটি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখার বিপুল নথিপত্রের সংরক্ষণের কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন শ্রীনাথ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন। এই কঠিন কাজের কথা মনে রেখে শ্রীনাথ অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন।[১১ক]

নিজের ওপর গভীর আস্থা রেখে শ্রীনাথ বাংলা সচিবালয়ের 'রেকর্ডরুম' গড়তে চেয়েছিলেন। কাজের গুরুত্ব ও চরিত্র বুঝে তিনি ধীরে চলার নীতি নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সচিবালয়ের তথাকথিত 'রেকর্ডরুম' কী অবস্থায় আছে! এই সময় তিনি এখানে এমন কোনো নথির সন্ধান পাননি যেখানে সব কাগজপত্র ঠিক অবস্থায় ছিল, হয় এক নথির চিঠি অন্য নথিতে রাখা হয়েছে, না হয় হারিয়ে গেছে বা ক্রমিক সংখ্যা মেলে না। এমন অবস্থায় ধৈর্য ধরে সমস্ত নথির পরীক্ষার দরকার—শ্রীনাথের বুঝতে ভুল হয়নি। কেন-না শ্রীনাথ মনে করতেন '...If we want to hurry up the matter,

the work, will not be properly done.' দ্রুত কাজ করতে চেয়েও শ্রীনাথ প্রয়োজনের তুলনায় একদিনও বেশি নিতে চাননি।[১২] আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে 'রেকর্ডরুম' গঠন পর্বে শ্রীনাথ সাধারণ কর্মীদের ওপর বেশি নির্ভর করেছিলেন, মাস মাহিনা অনুযায়ী শ্রীনাথ এদের দায়িত্ব ঠিক করে দিয়েছিলেন।[১৩] যেমন :

১. ত্রিশ টাকা মাস মাহিনার কর্মীর দায়িত্ব ছিল প্রতিটি নথি পরীক্ষা করা, নথি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখা, কোন নথি সারানো বা পরিচর্যার দরকার তা ঠিক করা,

২. দপ্তরিদের মাসিক বেতন ছিল বারো টাকা, এঁদের দায়িত্ব ছিল—নথিপত্র সারানো, বাঁধানো, অন্যদিকে অনুলিপিকার (কপিস্ট)দের কাজ ছিল প্রসিডিংস থেকে হারিয়ে যাওয়া নথির (মূলপত্র বা ও সি) অনুলিপি তৈরি করা।

৩. পঞ্চাশ টাকা বেতনের করণিকদের দায়িত্ব ছিল অনেক। এদের প্রধান কাজ ছিল পূর্বোক্ত শ্রেণির কর্মীদের কাজের তদারকি করা ও অনুলিপিকারদের কাজের ওপর বিশেষ নজর রাখা।[১৪] সংগ্রহ কক্ষের 'র‍্যাক'গুলিতে নথিপত্র ঠিক মতো সাজানো আছে কিনা তার তদারকি এঁরাই করতেন। ক্যাটালগ তৈরির ভার ছিল এঁদের। এঁরা ঠিক করতেন কোন নথি অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। ফলত পঞ্চাশ টাকা মাস মাহিনার করণিকদের দায়দায়িত্ব বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পাবি এই সংগ্রহালয় গড়ে তোলার প্রাথমিক দাযিত্ব এঁরাই পালন করেছিলেন। সচিবালয়ের নথিপত্র গুরুত্বপূর্ণ বলেই শ্রীনাথ মনে করেছিলেন স্বল্প বেতনের করণিক নিয়োগ করে এই কাজ করানোর ঝুঁকি নিলে তা হবে 'আন সেফ'।[১৫]

শ্রীনাথের ওই প্রতিবেদনের আকর্ষণীয় অংশ ছিল সচিবালযের সেই সময়ের সাতটি বিভাগের জন্য 'একত্রিত নির্ঘণ্ট' তৈরির প্রস্তাব। এই দায়িত্ব শ্রীনাথ তিরিশ টাকা বেতনের তিনজন ও পঞ্চাশ টাকা বেতনের চারজন করণিকের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

জুলাই ১৯০৯ সাল থেকে চার বছরের জন্য ওই 'নির্ঘণ্ট' তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রস্তাব ছিল শ্রীনাথের। প্রস্তাবিত এই নির্ঘণ্টের সময়সীমা নির্ধারিত হয় ১৮৫৯–১৯০৯ সালের মধ্যে। প্রতিটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, এবং প্রত্যেক খণ্ড একাধিক অংশে বিভক্ত করে শ্রীনাথ তাঁর 'কনসোলিডেটেড ইনডেক্স'-এর কাঠামোগত বিন্যাসের প্রস্তাব রেখেছিলেন।[১৬] অন্যদিকে কোম্পানি আমলের নথিপত্রের (১৭৭১–১৮৫৮) একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত সম্বন্ধে শ্রীনাথ খুব উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর কাছে এই কাজ ছিল খুবই কঠিন। শ্রীনাথ তবুও প্রস্তাব করেছিলেন যে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হবে প্রথমে বাৎসরিক, পরে একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। শেষ পর্যন্ত বাৎসরিক নির্ঘণ্টই তৈরি হয়েছিল 'একত্রিত' নয়।[১৭]

ওই সময় নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের জন্য শ্রীনাথ একশো পঞ্চাশ টাকা মাস মাহিনার প্রধান সহায়ক ও সত্তর টাকা বেতনের পাঁচজন করণিক নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীনাথ মনে করতেন স্বল্প বেতনের কর্মীদের দিয়ে এই কাজ হবে না।[১৮] শ্রীনাথের

বক্তব্য অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে তিনি কী ধরনের গুরুত্ব দিয়ে 'রেকর্ডরুমে'র নথিপত্র ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের পথ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিজের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রীনাথ বুঝেছিলেন যে কাজ তিনি শুরু করেছেন এবং ভবিষ্যতে যদি সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় তা হলে দরকার হবে দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো যার ওপর নির্ভর করে এই দপ্তরের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

শ্রীনাথের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁকে বিশেষ আধিকারিক হিসেবে একই সঙ্গে রাজস্ব পর্ষদ ও সচিবালয়ের সংগ্রহালয় গঠনের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এবং ওই দায়িত্ব যে যথেষ্ট কঠিন সরকারকে এ বিষয়ে সরাসরি তাঁর অভিমত জানিয়ে চমকপ্রদ প্রস্তাব ছিল : 'treat this as a special establishment under the special officer...' বিশেষ আধিকারিকের 'রেকর্ডরুম' পরিচালনায় তিনি নিত্যদিনের খরচ বাবদ মাসিক ১০০ টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। বিশেষ আধিকারিক বিশেষ স্বীকৃতি চেয়েছিলেন বলা যেতে পারে।[১৯]

শ্রীনাথের প্রস্তাব : অবর সচিবের মূল্যায়ন

শ্রীনাথ ওই প্রস্তাব রাজনৈতিক দপ্তরে পাঠান মে ১৫, ১৯০৯ সালে। এই দপ্তরের অবর সচিব বি. এ. কলিন্স ওই প্রস্তাবের ওপর তাঁর মতামত দিয়ে মুখ্য সচিবকে পাঠিয়েছিলেন ২৭ মে ১৯০৯ অর্থাৎ ঠিক বারোদিন পর। কলিন্স তাঁর পর্যবেক্ষণে শ্রীনাথের বক্তব্যের গঠনমূলক সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন, 'রেকর্ডরুম' নিয়ে সরকারের জরুরি কাজ কী হতে পারে।[২০]

কলিন্স তাঁর প্রতিবেদনে মূলত গুরুত্ব দিয়েছিলেন ১) ঐতিহাসিক শাখা গড়ে তোলা ও ২) বিশেষ আধিকারিক নিযোগের উপর। দলিল দস্তাবেজ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির। একজন উচ্চপদস্থ আই. সি. এস. প্রশাসকের সঙ্গে এক সাধারণ অস্থায়ী কর্মীর হাতে-কলমে কাজ করে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে পরে নজর দেব, বর্তমানে আলোচনা করা যেতে পারে ঐতিহাসিক শাখা ও স্থায়ী আধিকারিকের সমস্যা নিয়ে।[২১]

ঐতিহাসিক শাখা

ব্রাডলে বার্টের প্রস্তাব মতো 'রেকর্ডরুমে'র ঐতিহাসিক শাখা গড়ে তোলার প্রধান অন্তরায় ছিল যথোপযুক্ত স্থানের। কোথায় হতে পারত এমন শাখা? মহাকরণের কোন অঞ্চলে এমন শাখা গড়ে উঠতে পারত সে বিষয়ে কলিন্সের ধারণা ছিল না। মহাকরণ তিনি চিনতেন না ভালোভাবে, কলিন্স জানিয়েছিলেন। একসময় মহাকরণের নিকটবর্তী ৩ নং কয়লাঘাটায় এই শাখা গড়ে তোলা নিয়ে ভাবনাচিন্তাও হয়েছিল। মহাকরণে বা কয়লাঘাটায় মনোমতো ঘরের সন্ধান না পেয়ে হতাশ কলিন্স

লিখেছিলেন '...It is a pity that we can not get a room at once.'[২২]

কলিন্সের বক্তব্যের ওই অংশের ওপর মুখ্য সচিব যে 'নোট' রাখেন সেখান থেকে আমরা জেনেছি মহাকরণের যে অঞ্চলে 'প্রেস' ছিল সেখানে এই শাখা গড়ে তোলা যেতে পারে। সুতরাং '...removal of the press be the main subject If we can get it out there will be no difficulty about the historical record room.'[২৩]

স্থায়ী আধিকারিক বা কিপার অভ রেকর্ডস

কলিন্সই প্রথম যিনি প্রস্তাবিত রেকর্ডরুমের জন্য স্থায়ী আধিকারিক বা কিপার নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এটা যে জরুরি এ বিষয়ে কলিন্সের যুক্তিও ছিল। কলিন্স লিখছেন একজন 'অস্থায়ী' আধিকারিক যখন জানেন যে তাঁর চাকরির মেয়াদ তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্যে শেষ হয়ে আসবে তখন তিনি যে খুব মনোযোগী হয়ে কাজ শেষ করবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্যদিকে একজন স্থায়ী আধিকারিক সব সময়েই চাইবেন তাঁর কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে মানসিক শান্তি পেতে। অস্থায়ী আধিকারিকের ওপর যে খুব নির্ভর করা যায় না কলিন্সের লেখায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাঁদের দায়বদ্ধতা থাকে না। কলিন্স জেলা মহাফেজখানার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন জেলা মহাফেজখানার দায়িত্বে থাকেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মতন আধিকারিক। এই আধিকারিক নিয়মিত তাঁর 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা পরিদর্শনে যান। এর পাশে অভিভাবকহীন সচিবালয়ের 'মহাফেজখানা' বা 'রেকর্ডরুম' দেখে কলিন্স লিখলেন : '...It seems a strange anomaly that our record room should be left without any supervision whatever...'[২৪]

সচিবালয়ের সংগ্রহালয় বা রেকর্ডরুমের জন্য স্থায়ী আধিকারিক পদের যৌক্তিকতা প্রমাণে কলিন্স কেন্দ্রীয় রেকর্ডরুমের উদাহরণ টেনেছিলেন। এখানকার স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের প্রেক্ষিতে একজন স্থায়ী কিপার অফ রেকর্ডস পদ দাবি করে কলিন্স লিখলেন একজন স্থায়ী কিপার যদি নিযুক্ত হন তা হলে তাঁর হাতেই এখানকার সমস্ত নথিপত্রের দায়ভার থাকবে। কলিন্স 'নিশ্চিত'ভাবে মনে করতেন একজন দায়িত্ববান আধিকারিক সচিবালযের সমস্ত দলিল দস্তাবেজের দায়িত্ব নেবেন, যিনি দায়বদ্ধ থাকবেন রেকর্ডরুমের কাছে। মুখ্য সচিব কলিন্সের এই প্রস্তাবের ওপর লিখলেন '...We want a steady reliable man with brain.'[২৫]

মুখ্যসচিবের বক্তব্য

১. রেকর্ডরুম পুনর্বাসনের কাজ খুব বেশি হয়নি,

২. বিশেষ আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে পুনর্গঠনের কাজ অকারণে যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়, বর্তমান প্রশাসনের মেযাদ ও শ্রীনাথের চাকুরির কাল বাড়ানো হবে,

৩. শ্রীনাথ চক্রবর্তীর প্রস্তাব মতো বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো বৃদ্ধি সম্ভব নয়,

৪. ঐতিহাসিক শাখা বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত যথোপযুক্ত স্থান পাওয়া যাচ্ছে, ইত্যাদি।[২৬]

মুখ্যসচিবের ওই বক্তব্যে বোঝা যায় তখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক শাখার জন্য মহাকরণ বা অন্য কোথাও কোনো স্থান পাওয়া যায়নি। অথচ এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মে'র শেষ থেকে জুনের শুরু পর্যন্ত সচিবদের একাধিক আলোচনায় এই প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। এমন একটি আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় :[২৭]

১. রাজস্ব পর্ষদকে অনুরোধ করা হবে যতদিন উপযুক্ত কোনো স্থান পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন পর্ষদের সংগ্রহালয়ে ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ করতে,

২. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এমন স্থানের সন্ধান করা যেতে পারে, কলকাতার যে কোনো অঞ্চলে ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ঘর খোঁজাই ছিল সরকারের মূল লক্ষ্য,

৩. প্রসিডিংস ভল্যুম পাওয়া গেলে হারানো নথির অনুলিপি প্রস্তুতের দরকার হবে না, ইত্যাদি।

এবার আমরা দেখব রাজস্ব পর্ষদের প্রতিক্রিয়া। পর্ষদের এক সদস্য এফ. এ. স্ল্যাক জুন ৭-এ মুখ্যসচিবকে লেখা এক চিঠিতে জানতে চাইলেন :[২৮]

ক. ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য কি পরিমাণ (বর্গফুটের মাপে) জায়গা লাগবে এবং কতদিনের জন্য, ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল পর্ষদ কক্ষে ঐতিহাসিক নথিপত্র রাখা হলে এর জন্যে ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং পর্ষদের কিপারের অধীনেই থাকবেন প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক কক্ষের সাধারণ কর্মীরা। অর্থাৎ এই কর্মীরা পর্ষদকিপারের নির্দেশ মেনে চলবেন।

মুখ্যসচিব রাজস্ব পর্ষদের ওই বক্তব্য তাঁর অবর সচিব বি. এ. কলিন্সকে যথাসময়ে পাঠান এবং অবর সচিব লিখলেন :[২৯]

১. প্রাক্ ১৮৫৮ সালের অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ধ্বংস করা হলে বর্তমানের চাহিদা মতন সংরক্ষণ স্থানের পরিমাণ হ্রাস পাবে,

২. কতদিন পর্ষদের ঘরের প্রয়োজন হবে তা বলা যায় না, যতদিন ঐতিহাসিক কক্ষ গড়ে তোলার মতন ঘর অন্য কোথাও না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এই ঘরের প্রয়োজন হয়। মহাকরণ থেকে 'প্রেস' অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করলে এখানেই ঐতিহাসিক শাখা গড়া যেতে পারে,

৩. পর্ষদকক্ষে সচিবালয়ের কর্মীদের প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন এই কর্মীরা পর্ষদকিপারের নির্দেশ মেনে চলবেন ঠিকই কিন্তু রেকর্ডরুমের বিশেষ আধিকারিকের অধীনেই তাঁরা নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ করবেন। কলিন্সের বক্তব্য তাঁর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেয়েছিল।[৩০]

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা লিখতে পারি সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের ঐতিহাসিক শাখার সূচনা হয়েছিল রাজস্ব পর্ষদের ঘরে ১৯০৯ সালে জুন মাসে।

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯০৯-এর মধ্যে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার প্রস্তাবিত

কর্মকাণ্ড নিয়ে পরপর তিনটি প্রতিবেদন তৈরি হয়। এই তিনটি প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও অভিন্ন ছিল। রেকর্ডরুমের গঠন নথিপত্রের বিন্যাস ও দলিল দস্তাবেজ ব্যবহারের উপায়বিধি (রেফারেন্স মিডিয়া) তৈরি। প্রতিটি প্রতিবেদনের অবশ্য নিজস্বতা ছিল। সংক্ষেপে এই তিনটি প্রতিবেদনে নজর দেওয়া যেতে পারে।

আগস্ট ১৯০৯ : এম. সি. ম্যালপিনের বক্তব্য

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক ম্যালপিন তাঁর প্রতিবেদনে সামগ্রিকভাবে রেকর্ড রুমের গঠনবিন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ম্যালপিনের অভিনবত্ব এখানে যে তিনিই প্রথম যিনি রেকর্ডরুমের ঐতিহাসিক শাখার পাশে সাধারণ শাখাও গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন। এই সাধারণ নথিকক্ষই পরে 'কারেন্ট সেকসান' নামে পরিচিত হয়।

ম্যালপিন তাঁর ওই প্রতিবেদনে যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর নজর দিয়েছিলেন সেগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে আমি লিখেছি। এর মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক নথিকক্ষের স্থান ঠিক করা, নথিপত্রে বিন্যাস ও একত্রিত নির্ঘণ্টের মতো বিষয়। তখনও এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আর হয়নি বলেই ম্যালপিন লিখেছেন এ সবই ছিল 'Unfinished work বা অসমাপ্ত কাজ।'[৩১]

ম্যালপিন তাঁর প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সংগ্রহ কক্ষের সংরক্ষিত নথিপত্রের সময়কাল নির্ধারণ করেন : প্রাক্ বিদ্রোহ ও বিদ্রোহোত্তর কাল হিসাবে। প্রাক্ বিদ্রোহ কালের নথিপত্রের সময়সীমা ম্যালপিন অবশ্য ঠিক করেন ১৮৫৮ পর্যন্ত। অন্যদিকে বিদ্রোহোত্তর কাল শুরু হয় ১৮৫৯ সালে, শেষ হয় ১৮৮৮ সালে।[৩২] মনে হয় প্রশাসনিক কারণে ম্যালপিন ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত নথিপত্র প্রাক্ বিদ্রোহ কালের মধ্যে ধরেছিলেন। আসলে এই বছরেই কোম্পানি রাজত্বের শেষ হয়।

ওই রেকর্ডরুম পুনর্গঠনে ম্যালপিন দু-ধরনের কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন . এক গোষ্ঠীর হাতে থাকবে নথিপত্রের সুষ্ঠু বিন্যাস আর অপর গোষ্ঠীর জন্য ঠিক করা হয়েছিল নির্ঘণ্ট তৈরির মতন কাজ। আর এই দু-ধরনের কাজের জন্য তেতাল্লিশ জন্য কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব রাখেন ম্যালপিন। তেইশজন নথিপত্রের বিন্যাস আর কুড়িজনকে নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব ছিল।[৩৩]

নথি সংগ্রহালয়ের ব্যবহার মাধ্যম হিসাবে ম্যালপিন কনসোলিডেটেড ইনডেক্স বা একত্রিত নির্ঘণ্টের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কারণে নির্ঘণ্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল '..It would certainly be a great boon for facilities of reference.'[৩৪]

ম্যালপিনের প্রস্তাবের ওপর নজর দিলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল! নথিপত্রের সুষ্ঠু বিন্যাসের পাশে নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন পরপর সাজানো দলিল দস্তাবেজ মূল্যহীন হয়ে পড়বে যদি কোনো নথির সন্ধান পাওয়া না যায়— প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সহায়িকার অভাবে। ম্যালপিন তাঁর প্রস্তাবনায় বিশেষ

আধিকারিকের পদটি স্থায়ী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদিও শর্তাধীনে। তিনি জানিয়েছিলেন যদি প্রেস লিস্টের মতন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাহলে বিশেষ আধিকারিকের পদটি স্থায়ী করা দরকার।[৩৫] কেন ম্যালপিন এমন শর্তের কথা বলেছিলেন তা বোঝা যায় না।

অক্টোবর ১৯০৯ : শ্রীনাথ চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ[৩৬]

এম. সি. ম্যালপিনের উপযুক্ত প্রতিবেদনের ওপব শ্রীনাথ চক্রবর্তী অক্টোবর ১৯০৯ সালে তাঁর বক্তব্য জানালেন। এই প্রতিবেদনে শ্রীনাথ নথিপত্রের বিন্যাস, সংরক্ষণ (রিপেয়ার, মেন্ডিং, ফ্লাটেনিং) নির্ঘণ্ট প্রস্তুত ইত্যাদি নিযে মতামত জানান একটু বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে। নথিপত্র সংগ্রহের মতন সংরক্ষণের প্রশ্নটিও সমান গুরুত্ব পেযেছিল শ্রীনাথের কাছে।

প্রাক্ বিদ্রোহ যুগে নথিপত্র সারানোর (মেন্ডিং) দাযিত্ব শ্রীনাথ প্রথমে দুজন দপ্তরির হাতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে দেখা গেল এই কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে যখন কোনো নথি খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে তখন সেই খণ্ডিত অংশগুলির যথাযথ সংযুক্তিকরণের কাজ একজন দপ্তরির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের অভাবের জন্য। এই ধরনের কাজে ইংরেজি জানা করণিক ও সাধারণ দপ্তরিদের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব রাখেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী। শ্রীনাথের ভাষায় '...to get the mending done by the clerks and daftaris jointly, so that there might not be any mistake or wrong joining of torn parts.'[৩৭] ম্যালপিন ওই কাজ শুধু দপ্তরিদের দিয়ে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনাথের এই প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নথিপত্রের পরিচয় সম্পর্কিত অংশটি। নথির পরিচয় যদি যথাযথভাবে উল্লেখ করা থাকে (বিভাগ, মাস, বছর ও 'এ', 'বি' হিসেবে) তাহলে সেই নথির স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হবে। নথিপত্রের পরিচয়ে 'এ', 'বি'-এর উল্লেখ সম্বন্ধে শ্রীনাথ আমাদের জানিয়েছেন '...the insertion of the letter 'A' or 'B' is necessary to indicate class of the proceedings and it's omission will give rise to confusion and wrong proceeding will be put up by the record suppliers.'[৩৮]

এই পরিচযে অর্থাৎ 'এ' 'বি' দেখে বোঝা যাবে কোন বাণ্ডিলে কোন ধরনের নথি আছে।

শ্রীনাথের প্রতিবেদনে যেভাবে ছোটো বড়ো বিষয়ের উপর নজব দেওয়া হয়েছিল সেখানে সরকারি নথিপত্র ও প্রস্তাবিত রেকর্ডরুম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। শ্রীনাথের পেশাদারি জ্ঞান ছিল না, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন কোন পদ্ধতি, প্রথা অনুসরণ করলে নথিপত্রের ধূলি-ধূসর জগৎটা ঝকঝকে হবে। ধ্বংসের কাজে ও শৃঙ্খলা আনা যায় আর এটা সম্ভব হয় যদি অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ধ্বংস করার কাজে ভারপ্রাপ্ত করণিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৩৯]

শ্রীনাথ তাঁর ওই প্রতিবেদনে রেকর্ডরুম গঠন ম্যালপিনের লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। ক্ষুব্ধ শ্রীনাথ ম্যালপিনের প্রস্তাবের উপর লিখেছেন, যদি এর ফলে রেকর্ডরুম গঠনের কাজে অসুবিধা দেখা দেয় তা হলে তিনি এর দায় নেবেন না। শ্রীনাথের ভাষায় '.. I may not be held responsible hereafter for any alleged dereliction of duty on my part.'[৪০]

তবু ম্যালপিন ও শ্রীনাথের বক্তব্যে গুণগত ফারাক ছিল না। উভয়েই তাঁদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রস্তাবিত 'রেকর্ডরুম' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কোন কাজ তিন বা চারজন করণিক করবেন বা তাঁকে কত জন পিয়োন বা দপ্তরি সাহায্য করবেন এটা জানা আমাদের পক্ষে খুব জরুরি নয়, আমাদের জানা এটা জরুরি যে বাংলা সচিবালয়ের অধীনে এই অভিনব প্রশাসনিক শাখা গড়ে তোলা নিয়ে যথার্থ গঠনমূলক আলোচনা শুরু হয়েছিল শ্রীনাথের সময় থেকেই, বিতর্ক ছিল কর্মী সংখ্যা নিয়ে, সন্দেহ ছিল না মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমের গুরুত্ব নিয়ে।

শ্রীনাথের ব্যক্তিগত দাবি

ওই প্রতিবেদনে শ্রীনাথের নিজের কথা, নিজের চাকরি জীবনের কথা ও মাস মাহিনার উল্লেখ করে সম্ভবত নিজের ক্ষোভ-বেদনা, যা বলি না কেন, প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীনাথের বক্তব্য থেকে আমরা জেনেছি কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ের কিপারের মাস মাহিনা ছিল ১২০০ টাকা, অথচ শ্রীনাথের কাজের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কিপারের কাজের মধ্যে কোনো গুণগত ফারাক ছিল না। শ্রীনাথের আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে তিন আধিকারিক এই কাজ করেছিলেন তাঁদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা মাসিক ৯০০ ও ১২০০ টাকার মধ্যে ছিল; ক্ষুব্ধ শ্রীনাথ সরকারকে জানিয়েছিলেন '... I may naturally expect to get a decent pay in my present appointment.'[৪১] শ্রীনাথের ক্ষোভ অবশ্য দূর হয়েছিল।

ডিসেম্বর ১৯০৯ : অবর সচিব বি. এ. কলিন্সের মূল্যায়ন

ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে রেকর্ডরুম গঠনে সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করেন রাজনৈতিক দপ্তরের অবর সচিব বি. এ. কলিন্স। ইতিমধ্যে অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথ চক্রবর্তীর চাকরির মেয়াদ জানুয়ারি ১৫, ১৯১০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

কলিন্সের ওই প্রতিবেদনে ঐতিহাসিক ও সাধারণ শাখা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও এখানে আমরা নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান পাই না। নথিপত্রের বিন্যাস, সংরক্ষণ ও নথি ব্যবহার মাধ্যম বা একত্রিত নির্ঘণ্টের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কলিন্স যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সঙ্গে শ্রীনাথের খুব বেশি ফারাক ছিল না।

ফলত কলিন্সের প্রতিবেদনে প্রাধান্য পেয়েছিল (১) স্থায়ীপদে কিপার নিয়োগ ও (২) রেকর্ডরুমের প্রস্তাবিত রূপরেখার মতন দুটি বিষয়। আমরা আলোচনা করতে পারি।[৪২]

স্থায়ী কিপার অভ রেকর্ড নিয়োগ

কলিন্স তাঁর প্রতিবেদনে দৃঢ়ভাবে রেকর্ডকিপার নিয়োগের প্রস্তাব রেখেছিলেন। কেন এই নিয়োগ জরুরি এর কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা না করেও লেখা যায় কিপারহীন ওই অবস্থা চূড়ান্ত রকমের হতাশার বেশি ছিল না। অস্থায়ী আধিকারিক নথিপত্রের মূল্যায়ন ও ঘর গোছানোর দায় নিয়েছিলেন, রেকর্ডরুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল একজন সাধারণ নিম্নবর্গীয় করণিকের। এই সংগ্রহকক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো নিয়মাবলি ছিল না। যার ফলে ১৮৫৯–১৮৭২ সালের মধ্যে অনেক দলিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কলিন্সের বক্তব্য লক্ষ করার মতন : '...What rules there have been neglected, the records are in confusion & large numbers are missing...'[৪৩]

কলিন্স তাঁর ওই সমালোচনায় মফস্‌সলের রেকর্ডরুমের প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন। তিনি জানাতে ভোলেননি যে, এখানকার মহাফেজখানাগুলির অবস্থা সচিবালয়ের বর্তমান রেকর্ডরুমের তুলনায় উন্নত।

সুতরাং ওই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার প্রেক্ষিতে কলিন্স লিখেছেন রেকর্ডরুমের পুনর্গঠন বা সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি। অন্যদিকে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন যতদিন স্বল্প বেতনের করণিকের সাহায্যে এই সংগ্রহশালা পরিচালিত হতে থাকবে ততদিন এখানকার বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। কলিন্স ঠিক যা লিখেছেন : '...As long as we employ clearks on low pay for the work... we shall return to the old confusion.' [৪৪]

ফলত ওই বিশৃঙ্খলা দূর কবার জন্য কলিন্স একজন বিশ্বস্ত স্বাধীনচেতা উচ্চ বেতনের কর্মী নিয়োগের, যে পদের নাম হতে পারে 'কিপার অভ রেকর্ডস', দাবি রাখলেন। এবং এই পদের জন্য কলিন্স, ম্যালপিনের মতন বিশেষ অস্থায়ী আধিকারিক শ্রীনাথ চক্রবর্তীর কথা ভেবেছিলেন। শ্রীনাথের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে কলিন্স জানালেন '...He is quite competent to draw up proper rules for the management of the Record Room.. '[৪৫] শ্রীনাথের জন্য কলিন্স উচ্চ বেতনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

রেকর্ডরুম : প্রস্তাবিত রূপরেখা

কলিন্স তাঁর প্রতিবেদনের সঙ্গে মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম-এর প্রস্তাবিত রূপরেখা সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাবিত রূপরেখা বা রেকর্ডরুমের কাঠামোগত বিন্যাসে আমরা যে সমস্ত পদের কথা জেনেছি তার মধ্যে ছিলেন, রেকর্ডকিপার, সহকারী কিপার ও বিভিন্ন বেতনের প্রত্যক্ষভাবে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্মী উচ্চ ও নিম্ন পদের করণিক বা সহকারী। এই করণিকরাই নির্ঘন্ট, একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের কাজ করতেন। আমাদের লিখতে বাধা নেই এই সমস্ত নিম্ন বেতনের সাধারণ কর্মীরাই বেকর্ডরুমের সূচনা পর্বে ঘরগোছানোর কাজটি নিপুণভাবে

করেছিলেন। আভিজাত্যহীন ও ব্রিটিশ আমলাদের কাছে সতত সমালোচিত বিভিন্ন মাস মাহিনার বাবুদের ঘিরেই ব্রিটিশ রাজের মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম গড়ে উঠেছিল—এমন দাবি করা যেতে পারে।

কলিঙ্গের ডিসেম্বরের প্রস্তাবগুলি যথারীতি মুখ্যসচিবের অনুমোদন নিয়ে বিভাগীয় সচিবদের মধ্যে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় ৮ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে। বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে আলোচনার পর মুখ্যসচিব তাঁর প্রস্তাব বাংলা প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে পাঠান ২১ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে। মুখ্যসচিব তাঁর প্রস্তাবনায় জানিয়েছিলেন : ১) 'এ' শ্রেণিভুক্ত নথি মুদ্রিত হবে। ২) 'বি' শ্রেণির নথি মুদ্রিত হবে না, কিন্তু স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সময়ভিত্তিক বিভাজন করতে হবে। ৩) 'সি' শ্রেণির নথিপত্র তিন বছর পর ধ্বংস করে ফেলতে হবে রেকর্ডরুমে না পাঠিয়ে।[৪৬] মুখ্যসচিবের প্রস্তাব গ্রহণে প্রাদেশিক শাসনকর্তার আপত্তি ছিল না। প্রশাসনিক নিয়মনীতি মেনে মুখ্যসচিব প্রাদেশিক শাসনকর্তার সম্মতির কথা প্রশাসনকে জানান ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ তারিখে। এবং এইভাবে শেষ হল রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে বঙ্গীয় মহাফেজখানা বা 'রেকর্ডরুম' গঠনের প্রথম অধ্যায়।

শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি : ১৯১০

১৯১০ সালে কেন্দ্রের কাছে প্রাদেশিক সরকারের জন্য স্থায়ী রেকর্ডকিপার পদে বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথ চক্রবর্তীর নিয়োগের প্রস্তাব অবশ্যই 'রেকর্ডরুম'-এর বিবর্তনের ইতিহাসে দিকচিহ্ন হয়ে থাকতে পারে। জাত্যভিমানী ইংরেজ শাসককুল সদ্য গঠিত একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চপদে এক ভারতীয়কে নিয়োগ করে তাঁর দক্ষতা স্বীকার করে নিয়েছিল। শ্রীনাথের পরিবর্তে কোনো ইংরেজ তনয় এই পদ পেতে পারতেন, পাননি কেন-না ইংরেজ প্রশাসকরা বিশেষ আধিকারিক শ্রীনাথের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। শ্রীনাথ চক্রবর্তী কর্মজীবন শুরু করেন নদিয়ার স্মল কোর্টে তৃতীয় করণিক হিসেবে। এই পদে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রীনাথ ১৮৯৪তে নদিয়ার সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ সালে শ্রীনাথ বাংলা সরকারের সেনসাস কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী নিযুক্ত হন। জনগণনার কাজ শেষ হলে শ্রীনাথ চব্বিশ পরগনার আলিপুরে প্রধান করণিক পদে ফিরে আসেন। শ্রীনাথ এই সময় সতত সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করতেন—সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

১৯০৫-এ শ্রীনাথকে বাংলা সরকারের ফর্মস বিভাগে বিশেষ আধিকারিকের পদ দেওয়া হয়। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে শ্রীনাথকে রাজনৈতিক দপ্তরের সদ্যগঠিত রেকর্ড শাখার বিশেষ আধিকারিকের অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে শ্রীনাথ বাংলা সরকারের 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানার প্রথম কিপার পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন।

বাংলার এক জেলা আদালতের সাধারণ অখ্যাত করণিক থেকে বাংলা সচিবালযের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরভুক্ত এক শাখার প্রধান (কিপার) হিসেবে শ্রীনাথের এই অনায়াস উত্তরণ অবশ্যই তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছে। খুব কাছ থেকে ইংরেজ প্রশাসকগোষ্ঠী এক নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনে শ্রীনাথের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন, আর এই কারণেই কিপার পদে শ্রীনাথই ছিলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষদের প্রথম পছন্দ। ১৫ জানুয়ারি, ১৯১০ শ্রীনাথের বিশেষ আধিকারিক হিসাবে এক বছরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।[১] প্রশাসনিক জটিলতার জন্য পরের দিন অর্থাৎ জানুয়ারি ১৬ তারিখে তিনি এই নতুন পদে যোগ দিতে পারেননি। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর শ্রীনাথ এই পদে যোগ দেন যা কার্যকরী হয় জানুয়ারি ১৫ থেকে। অর্থাৎ শ্রীনাথের চাকুরিকাল নিরবচ্ছিন্ন থেকে যায়। এই পদে তাঁর মাস মাহিনা হল ৩৫০ টাকা।[২]

কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ মনে না রেখে আমরা লিখতে পারি জানুয়ারি ১৫, ১৯১০ সালে শ্রীনাথের ওই নিয়োগের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখার প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের সূচনা হয়। এতদিন ধরে মলিন নথিপত্র নিয়ে অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিকরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন এবার তার অবসান হল। নতুন পদে যোগ দিয়ে শ্রীনাথ জেনে গেলেন এবার তাঁকে বেশ কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, দুরূহ কিছু কাজ করতে হবে, তাঁকে তৈরি করতে হবে এমন কিছু নিয়মনীতি যার উপর এই রেকর্ডরুম দাঁড়িয়ে থাকবে।

১৯১০ সালে বাংলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে ভবিষ্যতের পালা বদলের ইঙ্গিত দিয়েছিল এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা। বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী, সরকারের সমস্ত নথিপত্রের ধারকবাহক হিসেবে চেয়েছিলেন অভিনব এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলতে। তিনি জানতেন নথিপত্রের ধূসর জগৎটাকে ঝকঝকে করা যায় যদি একে নিয়ন্ত্রণ করার মতন নিয়মনীতি থাকে, নিয়মনীতিহীন প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব খুব বেশিদিন হয় না। সুতরাং কিপার শ্রীনাথের প্রথম কাজ ছিল সদ্য গঠিত এই সংস্থার জন্য কিছু নিয়মনীতি তৈরি করা।

সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে, ওই সমস্ত নিয়মাবলি গ্রহণ করা হয় বাংলা সচিবালয়ের রেকর্ডরুম পরিচালনার জন্য। এই সমস্ত নিয়মাবলি অবশ্যই বাংলা সরকারের অভিনব এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল, আমরা আলোচনা করতে পারি।

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি[৩]

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি ন'টি অংশে বিভক্ত ছিল। যেমন : ১) প্রাপ্ত নথিপত্রের শ্রেণিবিভাগ ও সংগ্রহালয়ের ওই সমস্ত নথিপত্রের বিন্যাস (অ্যারেঞ্জমেন্ট), ২) সংগ্রহালয়ে নথিপত্রের স্থানান্তরণ, ৩) চাহিদা (রিকিউজিশন) পত্র অনুযায়ী নথিপত্র সরবরাহ, ৪) সরবরাহ করা নথির প্রত্যর্পণ, ৫) 'বি' শ্রেণিভুক্ত নথিপত্রের পর্যায়ভিত্তিক ধ্বংস, ৬) সংগ্রহালয়ের দায়িত্ব, ৭) মাসিক কার্যবিবরণী (মান্থলি প্রসিডিংস), ৮) বিবিধ নিবন্ধ পুস্তক ও নথিপত্র (মিসলেনিয়াস রেজিস্টার ও ফাইলস), ৯) নথিপত্রের অনুলিপি/তথ্য জনগণ ও আদালতে সরবরাহ ইত্যাদি। আমরা এই সমস্ত নিয়মাবলির গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর নজর দিতে পারি। ওই সমস্ত নিয়মনীতি থেকে আমরা বুঝতে পারি এ সব কিছুই মূলত প্রশাসনের দিকে নজর রেখে তৈরি হয়েছিল। এক রক্ষণশীল আদর্শ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের প্রাণিত করেছিল এই ধরনের এক অভিনব, সাধারণ পাঠকদের যেখানে কোনো অধিকার থাকবে না, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। বিস্তারিতভাবে ওই সমস্ত বিধি নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই এখানে আমি শুধুমাত্র এক, দুই, ছয় ও নয় বিধি আলোচনা করব।

অংশ

যে ধরনের নথিপত্র/দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হবে ১) 'এ' শ্রেণিভুক্ত

সরকারি কার্যবিবরণী, ২) ওই শ্রেণিভুক্ত অতিরিক্ত কার্যবিবরণী, ৩) 'বি' শ্রেণিভুক্ত কার্যবিবরণী, ৪) সরকারের প্রতিটি দপ্তরের মাসিক কার্যবিবরণী, ৫) গৃহীত নথিপত্রের বাৎসরিক নির্ঘণ্ট, ৬) ডায়েরি, ৭) প্রেরিত চিঠিপত্রের তালিকাবন্ধ পুস্তক, ৮) ফাইল বুক, ৯) সরকারের গণদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র যেমন স্থায়ী কর্মীদের বেতন বিল ও সমধর্মী নিবন্ধ পুস্তক ও ১০) দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর সরকারের গোপন সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত শ্রেণির নথিপত্র ভিন্ন অন্য কোনো ধরনের দলিল দস্তাবেজ বিভাগীয় সচিব বা অবর সচিবের অনুমতি ভিন্ন রেকর্ডরুমে রক্ষিত হবে না।

অংশ : ২

এখানে আলোচনা করা আছে কোন মাসের কোন তারিখে কোন বিভাগ/দপ্তর থেকে রেকর্ডরুমে নথিপত্র পাঠাতে হবে। সারণি দিয়ে আমরা রেকর্ডরুমে নথিপত্র স্থানান্তরণের মাস, দিন উল্লেখ করতে পারি।

বিভাগ	মাস	দিন
জেনারেল	এপ্রিল	প্রথম সপ্তাহ
রাজস্ব	মে	...
অর্থ	জুন	...
পুর	জুলাই	...
রাজনৈতিক	আগস্ট	...
নিয়োগ	সেপ্টেম্বর	...
বিচার	অক্টোবর	...

নথি পাঠানোর দিনক্ষণ পরে পালটিয়ে গেলেও বলা যায় ১৯১০-এ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার ঘর গোছানোর কাজ সাড়া জাগিয়ে শুরু হয়েছিল।

ওই নিয়মাবলির তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হয় চাহিদা অনুযায়ী নথি সরবরাহ সম্পর্কিত বিষয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রেকর্ডরুম ব্যবহারের সময়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই ব্যবস্থা সংশোধন করা হয়েছিল স্বাধীন মহাফেজখানার প্রয়োজন অনুযায়ী।

অংশ : ৬

ওই সমস্ত নিয়মাবলির মধ্যে অন্যতম হল সংগ্রহালয়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দায় সম্পর্কিত নির্দেশাবলি যা 'চার্জ অভ দ্য রেকর্ডরুম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এই নির্দেশাবলির কয়েকটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে বলা হয়েছে :

১. 'রেকর্ডরুম'-এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন আধিকারিকের যিনি 'কিপার অভ রেকর্ডস' (কিপার বলব এরপর) নামে পরিচিত হবেন, প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে রাজনৈতিক দপ্তরের অবর সচিবের অধীনেই কাজ করতে হবে। এই দপ্তরের নিবন্ধকের কোনো

কর্তৃত্বই ছিল না এই সংগ্রহালয়ের ওপর,

২. রেকর্ডরুমে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে এঁর অধীনেই থাকবেন,

৩. সচিবালয়ের 'গেজেটেড' আধিকারিক ভিন্ন এই সংগ্রহালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন এমন কোনো কর্মচারী কিপারের অনুমতি ব্যতিরেকে রেকর্ডরুমে প্রবেশের অধিকার পাবেন না, আবার

৪. সচিবালয়ের কোনো কর্মী বা প্রধান করণিক ছুটির পর অথবা ঘোষিত ছুটির দিনে কিপারের অনুমতি না নিয়ে রেকর্ডরুমে যেতে পারবেন না,

৫. রেকর্ডরুমের সঙ্গে যুক্ত নন এমন কোনো ব্যক্তি সংগ্রহালয়ে রক্ষিত নথি দেখতে বা ওখান থেকে কোনো নথি নিয়ে যেতে পারবেন না,

৬. মূলত কিপারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে নথিপত্রের দেখভাল করা, নিয়মিত নথিপত্র পরিচ্ছন্ন রাখা ও নথিপত্র সু-সংরক্ষিত করার প্রাথমিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি।

কিপারকে নথিপত্র সম্পর্কে রাজনৈতিক দপ্তরের মাসিক প্রতিবেদন পাঠাতে হত। যে সমস্ত বিষয় এই প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকত :

১. রেকর্ডরুমের সাধারণ অবস্থা,

২. ভবিষ্যতে নথিপত্রের সংরক্ষণযোগ্য স্থানের পরিমাণ,

৩. কোন সাল পর্যন্ত নথিপত্র সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও এই সমস্ত নথিপত্রের নির্ঘণ্ট তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে,

৪. প্রত্যেক বিভাগে সংরক্ষিত নথিপত্রের পরিমাণ ও ওই সমস্ত দলিলপত্র স্থানান্তরণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

৫. নথি সরবরাহের তিন মাসের মধ্যে সেই নথি প্রত্যর্পণের যে নিয়ম আছে তা কতদূর অনুসরণ করা হয়েছে বা কী পরিমাণ 'বি' তালিকাভুক্ত নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছে ইত্যাদি।

অংশ : ৯

ওই সমস্ত নিয়মাবলির নবম বা শেষ অংশে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে জনগণের সরকারি নথি দেখার বা অনুলিপি নেওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু সরকারি অনুমোদন নিয়ে এই আইন শিথিল করা যেত। ইতিহাসের প্রকৃত ছাত্রের জন্য সরকারি তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করা বিষয়ে ওই নিয়মে বলা হয়েছে : 'The rule with the permission of Government be relaxed in the case of bonafide student of history who may wish to collect any information from the old records of Government in connection with compilation of a book of historical importance.'

ওই নিয়মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে তথ্য বা অনুলিপি সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীকে পারিশ্রমিক বা 'সার্চিং ফি' দিতে হত। এর পরিমাণ ছিল মাসিক ৬০ টাকা। প্রস্তাবিত তথ্যের মুদ্রণ বাবদ জন্য প্রতি ১০০ শব্দের

জন্য আবেদনকারীকে দু'আনা হিসেবে সরকারি কোশাগারে জমা দিতে হত।

শেষে ওই নিয়মাবলিতে বলা হয়েছিল আদালতের নির্দেশ অনুরোধ সত্ত্বেও আদালতে নথি পাঠানো বা না পাঠানো সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ আদালত সরকারি নথি পাঠানো 'রেকর্ডরুম'-এর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না।

১৯১০ সালের ওই সমস্ত নিয়মাবলি ঔপনিবেশিক সরকারের 'রেকর্ডরুম' প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে গঠনমূলক ভাবনাচিন্তার ফসল। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, শাখা থেকে অ-চলতি নথিপত্র স্থানান্তরণের পর ধাপে ধাপে সুপরিকল্পিতভাবে 'রেকর্ডরুম' যেভাবে সাজানো হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে ওই নির্দেশাবলিতে। অবশ্যই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'রেকর্ডরুমে'র সাংগঠনিক দিকের উপর।

দ্বিতীয়ত, ওই সমস্ত নিয়মাবলিতে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নথিপত্রের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার উপর, শেষে বলা হয়েছে গবেষকদের কথা। ১৯১০ সালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক সরকারের পক্ষে এমনতরো সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি ছিল। প্রশাসনকে মসৃণ বা অতীতের কোনো সিদ্ধান্তের নজির টেনে বর্তমান প্রশাসনকে বেগবান করার জন্য সরকারি নথিপত্র সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা যে জরুরি এটা বুঝতে ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো অসুবিধে হয়নি ১৯১০ সালে, প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯১০ সালে 'রেকর্ডরুম' প্রশাসনিক অনিবার্যতার কারণেই গড়ে উঠেছিল।

মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম ও প্রশাসনিক বিভাগ একে অপরের পরিপূরক ছিল : রেকর্ডরুমে যেমন সরকারের স্থায়ী সংরক্ষণযোগ্য নথি পাঠাতে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি বাধ্য থাকত, তেমনই 'রেকর্ডরুম' ওই সমস্ত নথিপত্রের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সুনিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রয়োজন মেটাতে তৈরি থাকত। ফলত পারস্পরিক সহযোগিতার কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে ১৯১০ সালের রেকর্ডরুম নিযমাবলিতে। এক অর্থে সচিবালযের প্রতিটি বিভাগ ও বেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার পারস্পরিক সহযোগিতার দলিল ছিল ১৯১০ সালের ওই সমস্ত নিয়মাবলি।

শ্রীনাথের সংস্কার পর্ব : ১৯১০–১৯১৬

১৯১০ সালের 'রেকর্ডরুম' পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলি রাজনৈতিক দপ্তরের সদ্য গঠিত এই শাখার ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের পক্ষে অনিবার্য ছিল। আবাব এই সমস্ত নিয়ম বিধি যথাযথ অনুসরণ করে 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা গড়ে তোলার প্রয়াস বাংলা সচিবালয়ের বিরাট বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। সচিবালয়ের সমস্ত বিভাগ আর এই সমস্ত বিভাগের একাধিক শাখা-প্রশাখার মিলন কেন্দ্র হল এই 'রেকর্ডরুম'। এখানে বড়ো ছোটো সব বিভাগ, শাখার নানান ধরনের মূল্যবান দলিল বা নথিপত্র পাওয়া যেত। এককভাবে কোনো বিভাগই প্রধান বা গৌণ ছিল না—প্রাধান্য দেওয়া হয় ছোটো বিভাগের বড়ো নথিটিকে।

১৯১০ সালের ওই সমস্ত নিয়মাবলির স্রষ্টা ছিলেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী। বাংলা সবকারের প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন এই ধরনের নিয়মাবলি সদ্য গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য। অজস্র দলিলপত্রের ধূসর জগৎটাকে গ্রহণযোগ্য কবাব জন্য দরকার ছিল কিছু লিখিত নির্দেশ. দলিল দস্তাবেজের কাগজি জগৎটাকে শাসন কবাব জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু নিয়মনীতি, কেন-না বহু মূল্যবান নথিটি কোথা থেকে আসছে, বা কোথায় যাচ্ছে আর কাজের শেষে কীভাবে আবার তা যথাস্থানে ফিরে যাবে অর্থাৎ নথিটির অনিবার্য 'সঞ্চরণ' জানার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত নিয়মনীতির।

'রেকর্ডরুম'-এর সমস্ত ক্ষমতার উৎস ছিলেন কিপার : একদিকে তিনি ছিলেন সমস্ত সবকারি দলিল দস্তাবেজের রক্ষক, অন্যদিকে 'রেকর্ডরুম' প্রশাসনের তিনিই ছিলেন পরিচালক। চলতি ও অ-চলতি জগতের নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে কিপারের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার জগৎ গড়ে উঠেছিল একই সঙ্গে।

কিপার পদে নিযুক্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যে শ্রীনাথ রেকর্ডরুম গঠনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৯১১ সালে তৈরি এই প্রতিবেদনে শ্রীনাথ বিশেষ আধিকারিক হিসেবে ১৯০৯ সালে রেকর্ডরুমে যে সমস্ত অসুবিধে লক্ষ করেছিলেন বর্তমান প্রতিবেদনের মুখবন্ধ হিসেবে শ্রীনাথ সে সমস্ত উল্লেখ করেছিলেন।

১৯০৯ সালে বিশেষ আধিকারিক হিসাবে শ্রীনাথ রেকর্ডরুম-এ লক্ষ করেছিলেন :

১. কোনো দায়িত্ববান কর্মী স্থানান্তরিত নথিপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করেন না।

২. ব্যবহার করার পর অনেক সময় নথিপত্র যথাযথ বাণ্ডিলে রাখার ব্যবস্থা

নেওয়া হয় না।

৩. স্বল্প বেতনের ও অর্ধ শিক্ষিত দলিল বা নথিপত্র সরবরাহকারীরা নথিপত্র পুনর্বহালের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন না বা করেন না যার ফলে দেখা যায় অনেক সময়েই ওই সব নথিপত্র ভুল বান্ডিলে রাখা হয় অথবা ঠিক বান্ডিলে না রাখতে পেরে রেকর্ডরুমের র‍্যাকের ওপর স্তূপাকারে রাখা হয়।

৪. চাহিদা অনুযায়ী নথিপত্র সরবরাহের জন্য যে নিবন্ধ পুস্তকের দরকার হয় তার অভাবে (ক) কোন বিভাগে কোন নথি পাঠানো হয়েছে বা (খ) কোন বিভাগ থেকে কোন নথি ফেরত আসেনি তার হদিস পাওয়া যায় না।

৫. বিভিন্ন বিভাগের নথিপত্র পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে প্রয়োজনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ কোনো নথি থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত ওই সমস্ত নথিতে রাখা হয়নি, রেকর্ডরুমে হয়তো বা ওই সমস্ত 'কাগজ' আর ফিরে আসেনি। ১৮৬২-৬৩ সালের অনেক নথি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়।

ওই অব্যবস্থার ওপর শ্রীনাথ যে মন্তব্য করেছেন : 'In this way many important & valuable papers have been lost for ever' শ্রীনাথ আরও লক্ষ করেছিলেন:

৬. নথিপত্রের কোনো তালিকা নেই।

৭. প্রতিদিন নথিপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (Dusting) করার জন্য ব্যবস্থা নেই।

৮. কোনো 'রেকর্ড ক্যাটালগ' নেই।

৯. একই 'প্রসিডিংস'-এর অতিরিক্ত খণ্ড রেকর্ডরুমে রেখে দিয়ে অপ্রয়োজনে স্থানাভাব ঘটানো হয়েছে।

১০. 'সি' শ্রেণিভুক্ত সমস্ত নথি রেকর্ডরুমে না পাঠিয়ে তিন বছর অন্তর বিভাগেই ধ্বংস করে ফেলা হয়।[১]

ফলত শ্রীনাথ 'রেকর্ডরুম'-এর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নিজস্ব প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। 'রেকর্ডরুম' মুখ্যসচিবের রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনস্থ শাখা ছিল সূচনা থেকে। রেকর্ডরুমের অভিনব কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শ্রীনাথ প্রস্তাব করলেন (১) রাজনৈতিক দপ্তর থেকে রেকর্ডরুম'কে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে ফেলতে হবে, (২) এখানকার আধিকারিক ও কর্মীদের মুখ্যসচিবের দপ্তরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, এখানকার কর্মীরা সম্পূর্ণভাবেই রেকর্ডরুমের জন্য মনোনীত হবেন এবং তাঁরা তাঁদের চাকুরিকাল এখানেই শুরু ও শেষ করবেন এবং এর ফলে : '...they may gain practical experience in the working of the office and specially qualify themselves for carrying on the work of the Deptt.'[২]

আমরা উল্লেখ করতে পারি তখনও পর্যন্ত রেকর্ডরুমে সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে কর্মীদের কাজ করার জন্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা ছিল। এদের বিশেষ ভাতাও দেওয়া হত। শ্রীনাথ এই অবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। কেন-না শ্রীনাথ মনে করেছিলেন রেকর্ডরুমে এ কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর এই সমস্ত কর্মীদের অন্য দপ্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে রেকর্ডরুমের ক্ষতি হবে। শ্রীনাথের কাছে এটা ছিল যথেষ্ট আপত্তিজনক, সুতরাং তাঁর প্রস্তাব ছিল : '...put a

stop to at once.'[৩]

১৯১১ সালে 'রেকর্ডরুম' পুনর্গঠনে শ্রীনাথ শুধুমাত্র সংস্থাগত পরিবর্তন চাননি, তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভিন্ন মর্যাদা ও স্বতন্ত্রতা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন 'রেকর্ডরুম' সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র ও সমস্ত প্রকার প্রস্তাব প্রত্যক্ষভাবে কিপারের হাতেই রাখতে। শ্রীনাথ 'রেকর্ডরুম'কে যথার্থ মহাফেজখানার স্বাধীনসত্ত্বা দিতে চেয়েছিলেন।[৪]

১

শ্রীনাথের মূল প্রস্তাব

১৯১০ সালের রেকর্ডরুম সংক্রান্ত নিয়মাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগ ও রাজনৈতিক দপ্তরের প্রত্যক্ষ তদারকি থেকে রেকর্ডরুমকে মুক্ত করার কারণে এর পুনর্গঠনের প্রশ্নটি শ্রীনাথ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ আধিকারিক হিসেবে শ্রীনাথ ১৯০৯ সালে রেকর্ডরুমকে যেভাবে দেখেছিলেন, কিপার হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। স্থায়ী কিপার হিসেবে শ্রীনাথের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা অন্য মাত্রা পেয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের সঙ্গে 'রেকর্ডরুম'-এর প্রথম কিপার অভ রেকর্ডস নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন শুরু থেকে। সংগ্রহালয়ের স্বার্থে তিনি কোনো কিছুর সঙ্গে সমঝোতা করেননি।

'রেকর্ডরুম' সংস্কারের কাজ শ্রীনাথ শুরু করেন তৃণমূল স্তর থেকে। 'রেকর্ডরুম'-এর সেই সময়ের জন্য স্বল্প বেতনের নথি সরবরাহকারী বা রেকর্ড সাপ্লায়ার্সরাই দায়ী এমন মন্তব্য করতে শ্রীনাথ ইতস্তত করেননি। যে কোনো রেকর্ডরুমে নথিপত্র যথাযথ বান্ডিল থেকে নিয়ে আসা আবার প্রয়োজন শেষে সেই বান্ডিলে ওই নথিটি রাখা যত সহজ ততই ছিল কঠিন। শ্রীনাথ জানতেন এই সরল সত্য। এবং আরও জানতেন তিনি যে রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত সেখানে সবকিছু অগোছালো অবস্থায় আছে এই সমস্ত নথি সরবরাহকারীদের জন্য। শ্রীনাথ তাঁর নজন 'রেকর্ড সাপ্লায়ার' সম্বন্ধে আমাদের যা জানিয়েছেন '... the present deplorable condition of the record room is mainly due to the incapacity and want of any sense of responsibility of these men...' এঁরা ভুল বান্ডিলে যেমন নথি রাখেন তেমনই র‍্যাকের যে কোনো স্থানে ওই বান্ডিল রেখে দায়িত্ব পালন করেন।[৫] এবং এই অবস্থা দূর করতে না পারলে রেকর্ডরুম পুনর্গঠনের জন্য যে বিপুল অর্থ খরচ করা হচ্ছে তা জলে যাবে।

সুতরাং ওই সমস্ত নথি সরবরাহকারী পদের অবলুপ্তির প্রস্তাব করে শ্রীনাথ তিরিশ ও ষাট টাকা বেতনের যথাক্রমে তিনজন ও একজন করণিক নিয়োগের কথা বলেন। এই তিনজনের প্রধান দায়িত্ব হবে নথিপত্র যথাস্থানে 'পুনর্বহাল' করা (রেস্টোরেশন ওয়ার্ক), এই তিনজনের কাজের দেখভাল করবেন ওই ষাট টাকা বেতনের জন্য করণিক। সর্বোপরি শ্রীনাথ একজন সহকারী কিপার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। শ্রীনাথের প্রস্তাবিত সংস্কারে কোনো নিম্নবর্গীয় কর্মীকে নথিপত্র সংক্রান্ত কোনো

কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, কেন-না '...everything will be done by responsible clerks.'[৬]

শ্রীনাথের প্রস্তাবিত সংস্কারসূচির অন্যতম ছিল একজন শিক্ষানবিশী ও একজন আবাসিক কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব। শিক্ষানবিশী কর্মীর দায়িত্ব হবে একজন স্থায়ী কর্মীর অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজ সম্পন্ন করা। অন্যদিকে আবাসিক কর্মী রেকর্ডরুমের সার্বিক নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবেন। শ্রীনাথ একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীকে এই আবাসিক কর্মী পদে নিযোগ করতে চেয়েছিলেন।[৭]

শ্রীনাথ প্রত্যহ নথিপত্র পরিচ্ছন্ন করা, রেকর্ডরুমের বিভিন্ন শাখা সুষ্ঠুভাবে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নবর্গীয় কর্মী অর্থাৎ 'ফরাস' পিয়োন নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীনাথ জানতেন এই ধরনের প্রাথমিক স্তরের কর্মী পাওয়া না গেলে 'রেকর্ডরুম' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে না। ফলত রাজনৈতিক দপ্তরের প্রভাব মুক্ত করে সদ্য গড়ে ওঠা এই রেকর্ডরুমের জন্য শ্রীনাথ এক স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শ্রীনাথ মনে করতেন এই প্রাদেশিক মহাফেজখানার কাজের পরিমাণ বৈচিত্র্য কেন্দ্রীয় সংগ্রহালযের তুলনায় অনেক বেশি। শ্রীনাথের বক্তব্য থেকে আমরা জেনেছি :

১. কেন্দ্রীয সংগ্রহালয়ে প্রতি দশ বছর অন্তর 'চলতি নথি' স্থানান্তরিত করা হয়, অন্যদিকে বাংলার প্রাদেশিক সংগ্রহালয়ে প্রতি তিন বছর অন্তর নথি স্থানান্তরিত হয।

২. কেন্দ্রীয সংগ্রহালযের দলিলপত্রের পরিমাণ বাংলার সংগৃহীত নথিপত্রের তুলনায় কম, অথচ কেন্দ্রের প্রশাসনিক শাখার কলেবর বাংলার তুলনায় ভারী, বাংলার এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।[৮] সুতরাং শ্রীনাথ ১৯১১ সাল থেকে এই বিভাগের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণে।

১৯১১ সালের গোড়ায় শ্রীনাথ সচিবালয়ের অগোছালো, অবিন্যস্ত রেকর্ডরুমের পুনর্গঠনের প্রশ্নে সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ করণিক ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার গুরুত্ব এখানে যে এই সমস্ত সাধারণ কর্মীদের দিয়েই শ্রীনাথ রেকর্ডরুমের মৌলিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করার কথা ভেবেছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছিল শ্রীনাথের ভাবনায় ভুল ছিল না। শ্রীনাথের সময কেউ-ই নথিপত্রের কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, শুধু প্রশাসনিক দক্ষতাকে মূলধন করে এই কর্মীরাই লোকচক্ষুর আড়াল থেকে আজকের মহাফেজখানার সূচনা করেছিলেন।

২

১৯১৫ সালের মধ্যে রাজস্ব পর্ষদের সমস্ত নথিপত্র রেকর্ডরুমের ঐতিহাসিক শাখায় স্থানান্তরিত হলে বা ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত রাজস্ব পর্ষদ ও কোম্পানির অন্যান্য বিভাগের নথিপত্র নিয়ে ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় গড়ে উঠলে, এই সমস্ত নথিপত্রের জন্য

ইতিহাসের গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ চাহিদা দেখা যায়। রাজনৈতিক দপ্তরের এক আধিকারিকের ভাষায় '...we have received numerous applications from private parties for certified copies of old records...'[৯] ১৯১৫ সালের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই বছর সরকারি তথ্যের প্রত্যয়িত প্রতিলিপির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সংখ্যা সাত, এই সাতটি আবেদনের মধ্যে পঞ্চকোট রাজাব প্রতিনিধি ছিলেন। তথ্য অনুসন্ধান ও প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তৈরির জন্য সবকারি কোশাগারে মোট তিনশো উনিশ টাকা আট আনা দশ পযসা জমা পড়েছিল যা ১৯১৩ সালের তুলনায় বেশি ছিল। বাজ্য কোশাগারে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে একই কারণে জমা পড়েছিল যথাক্রমে ষাট ও চব্বিশ টাকা।[১০]

সরকারি তথ্যের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওযায় স্বাভাবিক কারণে 'রেকর্ডরুম'-এর সাধারণ প্রশাসনেব ওপর বেশি চাপ পড়েছিল যা শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই অতিরিক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা নিশ্চিত করে দেয়। নথি অনুসন্ধান ও পরে সেই নথি থেকে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি তৈরির জন্য জরুরি ছিল মুদ্রলেখক, করণিক ও নথি সরবরাহকারী নিয়োগ করা।[১১]

প্রশাসনিক স্তরে অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্য ওই তিনটি পদে তিনজন কর্মী নিয়োগ করা হয়। এপ্রিল ১৯১৬ সাল থেকে বাংলা বিভাগের কেন্দ্রীয় মহাগাণনিককে লেখা অর্থ দপ্তরের অবর সচিবের চিঠি থেকে আমবা জেনেছি ওই তিনজনের মধ্যে মুদ্রলেখকের পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল প্রতি একশো শব্দের জন্য দুই আনা। অন্যরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন পেতেন।[১২]

নভেম্বর ৪, ১৯১৬ সালে বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্তী কিপার পদ থেকে অবসর নেন। এবং একই সঙ্গে শেষ হয় 'রেকর্ডরুম'-এর মহাফেজখানায় উন্নীত হওয়ার প্রথম অধ্যায়। ছ'বছর (১৯১০-১৯১৬) কিপারের পদ থেকে শ্রীনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন, আমি লিখেছি সে-কথা। বিভিন্ন দপ্তর থেকে নথি সংগ্রহ করা, রেকর্ডরুমের জন্য নিযমাবলি তৈরি, ১৮৫৮ সালে উত্তরকালে বিভিন্ন বিভাগের নথিপত্রের একত্রিত নির্ঘণ্ট তৈরি বা অভিনব এই সংস্থাটির জন্য প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি করা শ্রীনাথের বর্ণময় কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। প্রথমে অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক পবে কিপার হিসেবে শ্রীনাথ রাজনৈতিক দপ্তরের এই দপ্তরটিকে যে বৌদ্ধিক মাত্রা দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব বুঝতে আমাদের সময় লাগেনি। বাংলা বাঙালির ইতিহাসের নিশ্চিত আধারটি শ্রীনাথই তৈবি করে গিয়েছিলেন ঝুঁকি না নিয়ে এ কথা লেখা যায়। শ্রীনাথের উত্তরসূরি হিসেবে এই কিপারের পদে আসেন পি. ডায়াস, নভেম্বর ৫, ১৯১৬ সালে।[১৩]

রেকর্ডরুমে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা (প্রথম কেন্দ্রীয় ও পরে প্রাদেশিক স্তরে) ডাযাসের ছিল। ডায়াস প্রত্যক্ষভাবে রেকর্ডরুমে ১৯১১-১২ সাল থেকে কাজ করে আসছিলেন। তিনি জানতেন তাঁকে কী করতে হবে বা কিপার হিসেবে তাঁর প্রাথমিক দাযিত্ব কী হবে। ডায়াস নিঃসন্দেহে দায়িত্ব সচেতন কিপার ছিলেন, প্রমাণ দেওয়া

যায়।

নতুন কার্যভার গ্রহণ করে ডায়াস এক চমকপ্রদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন তাঁর কর্মীদের মধ্যে। এমন বিজ্ঞপ্তি সেই সময়ের বাংলা সচিবালয়ের অন্য কোনো দপ্তরে প্রচারিত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই রেকর্ডরুমের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নভেম্বর, ১৯১৬ সালে প্রচারিত ওই বিজ্ঞপ্তিটিতে ধূমপান বিরোধী নির্দেশ ছিল। ডায়াস ওই নির্দেশে বলেছিলেন রেকর্ডরুমের কোনো কর্মচারী তাঁর দপ্তরের কোনো অংশে এমনকি বারান্দায় ধূমপান করতে পারবেন না। ওই নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল '...Any breach of the office order will be seriously dealt with.' দায়িত্বভার নিয়েই ডায়াসের এই বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশনামা নিঃসন্দেহে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিটি রেকর্ডরুমের স্থায়ী অস্থায়ী কর্মীদের 'দেখেছেন' বলে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল।[১৪]

পৃথিবীর যে কোনো ধরনের মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম বা নথি সংগ্রহালয়ের প্রথম এবং প্রধান বন্ধু ও শত্রু মানুষ। মানুষের কর্মদক্ষতায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, আবার রেকর্ডরুমের কর্মীদের সচেতনতার অভাবে বা অজ্ঞানতার কারণে এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অমূল্য সব নথিপত্র। ১৯১৬ সালে আমাদের নব গঠিত মহাফেজখানা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বা প্রযুক্তির কারণে নয়, সম্পূর্ণভাবে তার অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করেছিল এখানকার কর্মীদের সচেতনতার ওপরে। সংগ্রহালয়টিকে সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত করা, সুরক্ষার প্রশ্নে আগুনের হাত থেকে বাঁচানো বোধকরি এই সময়ের আরও কঠিন ও জরুরি দায়িত্ব ছিল সকলের কাছে।

নভেম্বর, ১৯১৬ সালে সদ্য কিপারের পদ পাওয়া পি. ডায়াস ওই সত্য অনুধাবন করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করেই তিনি ওই কঠোর বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করেন। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদপত্র জমা পড়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১৯২০–২০০০

আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কীভাবে ১৯১০ সাল থেকে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ১৯১০ সালে রেকর্ডরুম পরিচালনবিধি গ্রহণ করে বাংলা সচিবালয়ের এই অভিনব সংস্থাটির ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে যে আশা জাগিয়ে শ্রীনাথ চক্রবর্তী ১৯১০ সালে কিপার অভ রেকর্ডস হিসেবে বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখায় যে কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন তাঁর উত্তরসূরিরা কর্মকাণ্ডের সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণময় হয়ে উঠেছিল এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা : ধূলি ধূসর জীর্ণ নথিপত্রের অচেনা জগৎ, রহস্যে ঘেরা নথিপত্রের পৃথিবীটা রাতারাতি বড়ো পরিচিত হয়ে পড়ল কৌতূহলী মানুষের কাছে। অচেনা দলিলের পাতা থেকে অজানা তথ্য, শব্দ ভাষায় সাজিয়ে মানুষের সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনার কেন্দ্র হয়ে উঠল রেকর্ডরুম। এমন প্রতিষ্ঠানের কাজের হিসেব নেওয়া জরুরি।

১৯১৯-এ সিমলায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ঐতিহাসিক নথি পর্যদের প্রথম অধিবেশনে একাধিক সিদ্ধান্তর মধ্যে অন্যতম ছিল প্রাদেশিক রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানাগুলিকে তাদের বাৎসরিক কাজের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে পরামর্শ দেওয়া।[১] নথি পর্যদের লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্তরে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও সংগ্রহে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সিমলা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২০ সাল থেকে বাংলা সরকারের 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানার বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করা শুরু হয়। এই সমস্ত প্রতিবেদনের ওপর নজর দিলে বোঝা যাবে কীভাবে সাধারণের চোখে গুরুত্বহীন নথিপত্র নিয়ে আজকের 'আর্কাইভস' গড়ে উঠেছিল। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কোম্পানি আমলের ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ও রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র নিয়ে ঐতিহাসিক শাখা গড়ে উঠলেও পরে এই সময় ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। অন্যদিকে উত্তর-১৯০০ সালের নথিপত্র নিয়ে সাধারণ বা চলতি শাখা গড়ে উঠেছিল।

১

ঐতিহাসিক ও চলতি শাখার দায়দায়িত্ব

ঐতিহাসিক শাখা শুরু থেকে ব্যস্ত ছিল মূলত গবেষণা ও আঠারো-উনিশ শতকের

নথিপত্রের ব্যবহার সহায়িকা প্রস্তুত ও এই সময়ের দলিল দস্তাবেজের সংরক্ষণ ও প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদানের কাজে। অন্যদিকে চলতি শাখার প্রধান দায়িত্ব ছিল বিশ শতকের সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তিন বছরের পুরোনো নথিপত্রের মূল্যায়ন, সংরক্ষণ, বর্গীকরণের কাজ। আবার ১৮৫৯ সাল থেকে একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের দায়িত্ব ছিল চলতি শাখার।

ওই দুই শাখার আলোচনা আমি সীমাবদ্ধ রাখব মূলত ১৯২০ ও ১৯২৯-এর দুটি প্রতিবেদনের ওপর। আট বছরের ব্যবধানে এই দুটি প্রতিবেদন থেকে বিস্তারিতভাবে মহাফেজখানার মৌলিক কাজের হালহকিকত বুঝে নিতে পারব আমরা। পরের বছরগুলির প্রতিবেদন থেকে শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য সরকারি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করব।

মূল আলোচনা আমি শেষ করব ২০০০ সালে। ১৯২০ থেকে দীর্ঘ সময় জুড়ে চমকপ্রদ ধারাবাহিকতার পাশে মহাফেজখানায় নতুন শতাব্দীর সূচনায় অনিবার্য পরিবর্তনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে কাহিনি এখানে প্রাধান্য পাবে। ঐতিহাসিক ও চলতি শাখা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯১৭ সালে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক শাখার দলিল দস্তাবেজ দেখভালের জন্য রাজনৈতিক দপ্তর থেকে পাঁচ সদস্যের এক কমিটি গড়ার প্রস্তাব করা হয়। ঐতিহাসিক শাখা থেকে চলতি শাখা সম্পূর্ণভাবে আলাদা করার প্রস্তাবও ছিল। প্রস্তাবিত এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে সরকারি দলিল দস্তাবেজ বিশেষজ্ঞ ও'ম্যালে ও ডব্লিউ ফার্মিংগার ছিলেন। আর দুজন ছিলেন একান্তই সরকারি আধিকারিক।[২] সরকার রাজনৈতিক দপ্তরের এ প্রস্তাব মানতে পারেনি। কেন ? সরকারি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : ...the proposal to seperate Historical Record Room from the Current would not be a step in the right direction. The two are intimately connected, and what are current records to day will be regarded as historical in the course of a decade or two.[৩] আজকের চলতি নথি, সময়ের সরণি ধরে ঐতিহাসিক দলিলে উন্নীত হয়, এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য আবার চলতি নথির খোঁজ পড়ে। চলতি নথি না থাকলে ঐতিহাসিক নথি কোথায় পাওয়া যাবে ? ফলত চলতি ও ঐতিহাসিক শাখার এই মেরুকরণ ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয়। তবু সূচনা পর্বে ঔপনিবেশিক সরকারের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার এই মেরুকরণের বৈশিষ্ট্য খোঁজা যায় এর কাজের মধ্যে।

১৯২০[৪] : চলতি শাখা

নথি সংগ্রহ

১৯২০'র মধ্যে এই শাখা সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত নথিপত্র সংগ্রহ পরীক্ষা ও বিষয়ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল। আবার এই সময়ের মধ্যে সরকারি নিয়মনীতি মেনে চার হাজারেরও বেশি মূল্যহীন

দলিল দস্তাবেজ (১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের) ধ্বংস করে ফেলা হয়। একই সঙ্গে সংরক্ষণ ও ধ্বংসের কাজ করে চলতি শাখা নিঃসন্দেহে মহাফেজখানা গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেছিল।

একত্রিত নির্ঘণ্ট

ওই প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি ১৯০৯–১৯১৬'র মধ্যে সচিবালয়ের নথিপত্রের একত্রিত নির্ঘণ্ট (কনসোলিডেটেড ইনডেক্স) প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছিল।

ঐতিহাসিক শাখা

ঐতিহাসিক শাখার কাজের মধ্যে ছিল : আঠারো শতকের রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের তালিকা, নির্ঘণ্ট প্রস্তুত, প্রকাশনা, ছেঁড়া নথি সারানো ইত্যাদি।

প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান

শুরু থেকে ঐতিহাসিক শাখার অন্যতম দায়িত্ব ছিল চাহিদা মতন ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান নিশ্চিত করা। আমাদের আলোচিতকালে এই ধরনের আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৩৩টি। এর মধ্যে ৫৭ জন ছিলেন বেসরকারি গবেষক, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ থেকে ৫৬ ও সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে ২০টি অর্থাৎ মোট ১৩৩টি আবেদন জমা পড়েছিল ঐতিহাসিক শাখায়।

১৯২০'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সরকারি দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণে এ সময় স্থানাভাব দেখা দিয়েছিল। এই প্রতিবেদনে লেখা আছে : The records are crowded together unduly in the room set apart for them... Enquiries are being made whether more accomodation can be found in the near future secretariat press moves from Writers' Buildings.

১৯২৯[৫]

১৯২০ সালের মতন ১৯২৯ সালে রেকর্ডরুমের কাজের মূল্যায়ন করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে ওই সময়ের লোকাভাবজনিত কারণে নিত্যদিনের কাজে নানা সমস্যা দেখা দিলেও তাঁর মূল কাজের ধার ও ভার কমেনি। এই সময়ে সংগ্রহালয়ের অন্যতম পরামর্শদাতা ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন ঢাকা ও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের মহাফেজখানাগুলি পরিদর্শন করে সরকারের কাছে তাঁর প্রতিবেদন উপযুক্ত সুপারিশসহ পাঠিয়েছিলেন।

বক্তব্য বা বিষয়ে অভিনবত্ব না থাকলেও বা পূর্বকথিত বলে মনে হলেও আমরা ১৯২৯ সালে এই সংগ্রহালয়ের কাজের হিসেব নিয়ে দেখার চেষ্টা করব গত পাঁচ বছরে এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে এবং কী পরিমাণে কাজ করেছিল।

চলতি শাখা

আগের মতন এই সময় অর্থাৎ ১৯২৯ সালে চলতি শাখা বিশ শতকের নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়। ১৯২৯ সালের মধ্যে ১৯২৫ সালের সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার নথিপত্র সংগ্রহ, পরীক্ষা ও যথাস্থানে সুবিন্যাসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সময় মোট সংগৃহীত দলিলপত্রের সংখ্যা ছিল ৪১৫৮১টি।

একত্রিত নির্ঘণ্ট

এই বছর অর্থ ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের (১৯০৯—১৯১৬) একত্রিত নির্ঘণ্টের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের অপেক্ষায় ছিল।

ঐতিহাসিক শাখা

১৯২৯ সালে সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বলা হল যে রেকর্ডরুম তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ বা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাবে না এমন নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুতের কাজে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি আমলের আঠারো-উনিশ শতকের বাণিজ্য ও রাজস্ব দপ্তরের বেশি কিছু মূলপত্রের (অরিজিন্যাল কনসালটেশন) মুদ্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তথ্য সরবরাহ অবশ্য ছিল ঐতিহাসিক শাখার মূল কাজ।

তথ্য সরবরাহ

১৯২৯ সালে এই শাখায় তথ্যের জন্যে ৯৭টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ৫৩টি আবেদন এসেছিল, অন্য সমস্ত বেসরকারি পর্যায়ের।

১৯২৯ সালে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় ঐতিহাসিক শাখা তিনটি অংশে ভাগ করেছিল। 'এ'-গবেষক, 'বি'-অন্যান্য ভদ্রলোক ও 'সি'-অনুসন্ধান বোঝাত।

'এ' অর্থাৎ গবেষক অংশে আমরা বারোজনের নাম পাই এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. এ. অ্যাসপিনাল, ড. জে. সি. সিনহা ও আর. বি. ব্যামসবোথাম। এদের সম্বন্ধে 'গবেষণা বিধি ও গবেষক' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'বি' অর্থাৎ অন্যান্য ভদ্রলোক অংশে তথ্যানুসন্ধানকারী ছিলেন আঠারোজন। আবেদনকারীরা ছিলেন সরকারি আধিকারিক বা নানাভাবে সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। এঁদের গবেষণার বিষয় ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন বঙ্গীয় আইন পরিষদের অন্যতম সদস্য রণজিৎ পালচৌধুরী, নদিয়ার 'প্রভু গৌরাঙ্গের মন্দির ও জন্মভিটা' নিয়ে যেমন তথ্য খুঁজেছিলেন তেমনই রায়সাহেব জে. এম. ঘোষের গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'। সরকারের স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের সচিব সি. ডব্লিউ. গারনার 'লর্ড আমহার্স্ট' ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার খিদিরপুরের 'অরফ্যানগঞ্জ বাজার' নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছিলেন।

'সি' অর্থাৎ বেসরকারি তথ্যানুসন্ধানকারীদের সংখ্যা ছিল সাতজন। এঁদের গবেষণার বিষয়ের মধ্যে যেমন চব্বিশ পরগনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন যেমন ছিল, তেমনই ছিল পূর্ণিয়ার রানি ইন্দ্রবতীর রাজত্ব।

উপর্যুক্ত প্রতিবেদন দুটি (১৯২৪, ১৯২৯) থেকে যে তথ্য আমরা পেলাম সেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কীভাবে বাংলা সচিবালয়ের এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পরামর্শদাতা ও ১৯৩০ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য আর. বি. র‍্যামসবোথাম তাঁর এক চিঠিতে এই সময় কিপারকে লিখেছিলেন : '...the Bengal Record Room is a model for the rest of India... everything that devotion and skill can do is being done...'[৬] এমন স্বীকৃতি বাংলা সচিবালয়ের এই ক্ষুদ্র 'শাখা'কে গর্বিত করেছিল—আমরা অনুমান করতে পারি। এই মন্তব্য অতিরঞ্জিত ছিল না, পরবর্তীকালের ঘটনাবলি সেটাই প্রমাণ করছিল।

১৯২০'র মতন ১৯৩০-এর পর বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদনগুলি মূলত একই ছিল। ঐতিহাসিক ও চলতি শাখার কাজে কোনো অভিনবত্ব ছিল না, যদিও এই দুই শাখার কাজের ধার ও ভার বেড়েছিল। নথিপত্র সংগ্রহ, মূল্যায়ন, বিন্যাস, রেফারেন্স মিডিয়া তৈরি, মুদ্রণ ও প্রকাশনার মতন গতানুগতিক অথচ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজগুলি সুষ্ঠুভাবেই এই দুই শাখা করেছিল। এই সমস্ত কাজ নিয়ে নয়, ১৯৩৪-এ রেকর্ডরুমের কয়েকটি বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কথা লিখতে পারি আমরা। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল[৭] :

১. নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. গবেষকদের কথা মনে রেখে মহাকরণের (অঞ্চল পাঁচ) প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া, উল্লেখ্য এই বছর সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন, ন'জন এঁদের মধ্যে গবেষক ছিলেন।

৩. চলতি শাখায় (তিন বছরের পুরোনো) নিরবচ্ছিন্নভাবে সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে, শাখা থেকে নথিপত্র সংগ্রহের জন্য স্থানাভাবের কারণে পূর্ত দপ্তরকে অতিরিক্ত ঘরের জন্য অনুরোধ করা ইত্যাদি।

সীমিত আর্থিক ক্ষমতা ও লোকাভাবজনিত কারণে রেকর্ডরুম অনেক কিছুই করতে পারেনি, ১৯৩৪-এর প্রতিবেদনে যা প্রতিফলিত হয়েছে। তবু এখানকার কর্মীদের আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি ছিল না, এঁদের ঘিরেই প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। আমরা একটা চিঠির কথা উল্লেখ করতে পারি।

১৯৩৪-এর ওই বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন যে সমস্ত গুণীজনকে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর. বি. র‍্যামসবোথাম, যিনি ১৯২০'র কালে এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার অবৈতনিক পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৯৩৪-এ বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে যে প্রতিবেদন পাঠানো হয় সেখানে প্রতিভাত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে এই পরামর্শদাতার 'রেকর্ডরুম' গড়ে তোলার স্বীকৃতি, পরোক্ষে এখানকার

কর্মীদের কর্মপ্রয়াসের পরিচয়। এই চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিপার অভ রেকর্ডস মে, ১৯৩৫-এ প্রত্যক্ষভাবে র‍্যামসবোথামের কাছে ঋণ স্বীকার করে জানিয়েছিলেন : '...the Record Room has learnt to love the records and their sanctity and World importance. This love enabled the staff, even in adverse circumstances, to maintain its dignity and high standard of efficiency...' কিপার সরাসরি লিখেছেন স্বয়ং র‍্যামসবোথামের কাছ থেকেই তাঁরা দলিল দস্তাবেজ ভালোবাসতে শিখেছিলেন।[৭] নথিপত্রের প্রতি ভালোবাসা, নথিপত্রের কৌলীন্য ও সার্বজনীন গুরুত্বের দিকে লক্ষ রাখাই যে কোনো মহাফেজখানার কর্মীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে পারে যা প্রথম স্বীকার করা হল ১৯৩৫-এ! সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় সরকারি দলিলের দ্বিধাহীন গুরুত্ব স্বীকার করা হল পরোক্ষে।

নথি প্রদর্শনী

১৯৩০'র কালে 'মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম' কর্তৃপক্ষের একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যায় যা স্বভাবতই নথিপত্র সম্বন্ধে তদানীন্তন আধিকারিকদের সচেতনতা প্রমাণ করে। ১৯৩৬ সালে গোয়ায় 'শিক্ষা ও শিক্ষাসপ্তাহ' আন্দোলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'রেকর্ডরুম' অংশ নিয়ে কোম্পানি যুগের শিক্ষা সম্পর্কিত নথিপত্রের (১৮০০–১৮৫৪) প্রদর্শনী করে। ১৯২৯ সালের পর এটাই ছিল রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার প্রথম প্রদর্শনী। উল্লেখ ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এই ধরনের প্রদর্শনীতে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মূল দলিলপত্র পাঠানো হত। ১৯২৯ সালে বাংলা সরকারের অবৈতনিক পরামর্শদাতা আর. বি. র‍্যামসবোথাম মূল দলিল দস্তাবেজের প্রদর্শনী বিষয়ে আপত্তি করার ফলে এমন প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়।[৮]

১৯৩৬ সালের প্রস্তাবিত প্রদর্শনীতে প্রথম প্রস্তাব করা হয় যেহেতু ওই প্রদর্শনীর সঙ্গে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বিভাগের পদস্থ আমলারা যুক্ত সেই কারণে এখানে মূল নথিপত্র পাঠালে কোনো সমস্যা হবে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল নথি পাঠানো যেতে পারে, উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রস্তাব ছিল একজন সহকারীর, কিপার এ প্রস্তাব মানেননি! কিপার লিখেছিলেন 'The proposed Education Exhibition will be a public one where the exhibits will be seen by the public interested in it. Valuable original documents may not therefore be exhibited there.' কিপার শিক্ষা বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের অনুলিপি ওই প্রদর্শনীতে পাঠানোর প্রস্তাব করেছিলেন।[৯]

কিপারের প্রস্তাব রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত উপ-সচিব মেনে নিয়েছিলেন। শিক্ষা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের অনুলিপি পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমের বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণের কাছে মূল নথি কোনোভাবেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, এই সাধারণ সত্য ১৯৩৬ সালের আধিকারিকরা বুঝেছিলেন। মূল নথি নষ্ট হলে স্থায়ীভাবেই মহাফেজখানার ক্ষতি

হবে। বাস্তববোধই 'রেকর্ডরুম' আধিকারিকদের এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রাণিত করেছিল, তাঁরা 'প্রফেশনাল' ছিলেন না।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মহাকরণে মহাফেজখানার নিরাপত্তার প্রশ্নটি সরকারের কাছে মুখ্য হয়ে উঠল; মহাকরণের নিরাপত্তার কারণে যদি নথিপত্র ধ্বংস হয়ে পড়ে তাহলে যে সেখান থেকে কোনো অলৌকিক পাখির আত্মপ্রকাশ ঘটবে না বা নথিপত্রের ছাইয়ের গাদা থেকে সৃষ্টির বাণী শোনা যাবে না এই সরল সত্য বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সুতরাং নিরাপত্তার কারণে ১৯৪২ সালের নভেম্বরে কলকাতা থেকে এই রেকর্ডরুম সরিয়ে বহরমপুরে স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১০] যুদ্ধের ডামাডোলে, বিশেষ করে কাগজের অভাবে এই সময়ে বেশ কিছুদিন বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়নি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে ১৯৪২–৪৪ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হল। অভিনবত্ব না থাকলেও মহাফেজখানার দুই শাখার কাজের হিসেব ছিল আগের মতন।

১৯৪৪ সালের নভেম্বরে বাংলা প্রশাসনিক তদন্ত পর্ষদের পক্ষ থেকে বাংলা সচিবালয়ের প্রতিটি বিভাগ, শাখার কাজ ও এই সমস্ত শাখা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'রেকর্ড' শাখা সম্বন্ধে যে তথ্য এই তদন্ত পর্ষদের কাছে পাঠায় সেখানে পাওয়া যাবে 'রেকর্ড' শাখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এখানে চলতি ও ঐতিহাসিক শাখা আলাদাভাবে দেখানো হয়নি।

রেকর্ড শাখার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব[১১]

প্রাক্-সিপাহি বিদ্রোহ যুগ : ঐতিহাসিক নথিপত্র

১. প্রাক্ বিদ্রোহ যুগের সমস্ত বিভাগ ও অধীনস্থ শাখাসমূহের নথিপত্র দেখভাল করা, এই দপ্তরই সমস্ত নথিপত্রের অভিভাবকস্বরূপ ছিল।

২. সমস্ত নথিপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৩. ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রেস লিস্ট, হ্যান্ডবুক, ক্যালেন্ডারস, নির্ঘণ্ট প্রস্তুত ও দলিল দস্তাবেজ মুদ্রণের ব্যবস্থা।

৪. গবেষকদের ঐতিহাসিক নথিপত্র (হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভস) ব্যবহারের দিকে নজর রাখা।

৫. সরকারি আধিকারিক ও জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ, নথিপত্রের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান, আদালতে নথিপত্র দেখানো।

৬. ঐতিহাসিক দলিলপত্রের সুষ্ঠু ও উন্নত সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য অন্য প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

৭. ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের বাৎসরিক অধিবেশনে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা।

বিদ্রোহোত্তর কালের নথিপত্র

৮. বিদ্রোহোত্তর যুগের সচিবালয়ের সমস্ত নথিপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা (অ্যাকাউন্টস ও ওয়ার্কস বিভাগ ভিন্ন)।

৯. সমস্ত বিভাগের নথিপত্রের ক্যাটালগ একত্রিত ও সাধারণ নির্ঘন্ট তৈরি।

১০. প্রশাসনিক উদ্দেশে তথ্য ও নথিপত্র সরবরাহ।

১১. মামলা মোকদ্দমার প্রশ্নে বেসরকাবি ব্যক্তি ও সরকারকে নথির শংসাপত্র সরবব্যাহ।

১২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকা, দেশীয় সংবাদপত্রের উপর সরকারি ভাষ্য, কলকাতা গেজেট, পাসপোর্ট, আই. সি. এস., আই. পি. এস. আধিকারিকদের চুক্তি ইত্যাদি সংরক্ষণ।

১৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা দেখার সুযোগ দেওয়া ও এতদ্‌বিষয়ক প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান।

১৪. দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ।

১৫. সরকারি নথিপত্রের জন্য অবৈতনিক পরামর্শদাতা নিয়োগ ও জেলা সংগ্রহালয়গুলি পরিদর্শন করা ইত্যাদি।

১৯৪৫ সালের রেকর্ড শাখার দায়-দায়িত্বের দিকে নজর রাখলে বাংলা সরকারে আপাত অপরিচিত এক সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় জেনে নিতে পারি। নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষকদের কাছে ওই সমস্ত নথিপত্র পৌছে দেওয়ার পথ সন্ধান করা, ও অপরিচিত অদেখা নথি প্রকাশ করাই ছিল এই শাখার মূল কাজ। গবেষক নন, শুধু তথ্য সন্ধানকারী ও মহাফেজখানা থেকে তাঁর পছন্দের নথিটি পেতে পারতেন, প্রযোজনে প্রত্যয়িত প্রতিলিপি। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে এক সরকারি আদেশ বলে রেকর্ড শাখার দায়-দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাত থেকে সদ্য গঠিত মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের হাতে দেওয়া হল। ওই আদেশে বলা হয়েছিল : '...The administrative control of the Secretariat record room is transferred to the common service of the Chief Ministers' Deptt.'[১২] বোধকরি সরকারি নথিপত্রের সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২

স্বাধীনতা উত্তরকাল

এক সুগভীর প্রত্যয় আর বিশ্বাস নিয়ে ঔপনিবেশিক যুগের সচিবালয় স্বাধীন দেশে তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। আগের মতন সরকারি প্রশাসনের মূল কেন্দ্রে রইল সচিবালয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই কেন্দ্রের প্রধান স্তম্ভ আর 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা ছিল এই স্তম্ভেরই অন্যতম অংশ।

প্রাক্‌-স্বাধীনতা উত্তরযুগে ঔপনিবেশিক সরকার জানত সরকারি নথিপত্রের ছত্রে ছত্রে সাধারণের অজানা অ-কথিত কাহিনি বিধৃত, কঠোরভাবে এর গোপনীয়তা রক্ষা

করাই ছিল ওই ভিনদেশি শাসকের প্রধান দায়িত্ব। মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম শুরু থেকে মূলত সরকারের গোপনীয়তা রক্ষার এক নিশ্ছিদ্র কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, প্রথমে রাজনৈতিক পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে ছিল এর চাবি।

স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ওই রেকর্ডরুম নিয়ে স্বাভাবিক কারণে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হল। প্রশ্ন উঠল—রেকর্ডরুম কীভাবে গড়ে তোলা হবে? নানা দিক থেকে এর উত্তর খোঁজা শুরু হয়। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে পাওয়া এক ভিনদেশি সরকারের 'রেকর্ডরুম' কি স্বাধীন ভারতের 'আর্কাইভস' হতে পারে?—এই প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছিল।

ফলত প্রাক্-স্বাধীন যুগে 'রেকর্ডরুম'-এর যে বর্ণনা আমি দিয়েছি তার মধ্যে অভিনবত্ব নয়, চমকহীন ধারাবাহিকতা ছিল, অ-চলতি রেকর্ডের পাশাপাশি বিশ শতকের তিন বছরের পুরোনো আধা চলতি নথিপত্র নিয়ে 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক ও চলতি নথির মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। এ ছবি প্রকৃত আর্কাইভসের হতে পারে না, ১৯৪৮ সালের এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রেকর্ডরুম নিযে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেকর্ডরুম, 'লেখ্যশালা' বা 'মহাফেজখানা'র উন্নয়নের প্রস্তাব অযাচিতভাবেই উঠেছিল! প্রকৃত 'আর্কাইভস' কীভাবে গড়ে উঠবে, কেনই বা গড়ে ওঠেনি এমন প্রশ্ন সরকারকে তাদের রেকর্ডরুম নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে প্রাণিত করেছিল। এবং এই ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে উল্লেখের তা হল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তুলেছিলেন 'রেকর্ড' শাখার এক সাধারণ কর্মী। আইনত তিনি সরকারের সমালোচনা করতে পারতেন না, তবু তিনি এই অপ্রিয় কাজটি করেছিলেন কেন না জাতীয় অভিলেখালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন পড়ে তিনি বুঝেছিলেন বাংলা সরকারের ঘাটতি কোথায় এবং কেন? ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ের বাৎসরিক কর্মণ্যতা প্রতিবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই কর্মীর, প্রশাসনের কাছে অবাঞ্ছিত প্রশ্ন, সরকারকে বহুলাংশে বিব্রত করেছিল।

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ওই অখ্যাত কর্মী সরকারের সমালোচনা করে আমাদের জানিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক যুগে যে কোনো উন্নয়নের প্রস্তাব অর্থের অভাবে বাতিল করা হত, প্রশাসকরা এই যুক্তি দেখাতেন 'টাকা নেই'। রেকর্ডরুমে'র স্বার্থ কারোর চিন্তায় ছিল না, নথিপত্রের সংরক্ষণ হত না, এই শাখার গুরুত্ব ছিল না প্রশাসকদের কাছে। রেকর্ডরুমের ওই অগোছালো অবস্থা দেখে ওই কর্মী হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছেন এই 'রেকর্ডরুম' যেন '...No man's Child.'

যা হোক ওই কর্মীর অযাচিত বক্তব্য ও প্রস্তাবনা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পদস্থ আধিকারিকরা নিম্নপদের ওই কর্মীর বক্তব্য বাতুলতা বলে উড়িয়ে না দিয়ে বরং তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন সুষ্ঠুভাবে নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বাড়ি দরকার। তাঁরা আরও ভেবেছিলেন এই সমস্ত, এতদিনের অবহেলিত নথিপত্রের জন্য, অনেক কিছুই করতে হবে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহ-সচিব তাঁর ওই অধস্তন কর্মীর সমস্ত প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। নথিপত্রের যথাযথ সংরক্ষণ, গবেষণা ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রেক্ষিতে দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের নিয়ে একটি পর্ষদ গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিপার পদের গুরুত্ব মেনে নিয়ে প্রশাসনিক দিক থেকে পদটিকে গেজেটেড ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল।

পরিশেষে অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও কলকাতাতেই সহ-সচিব নথিপত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখেন, এক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীর প্রস্তাব তিনি মানতে পারেননি, আর পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নথিপত্রের সার্বিক মূল্যায়নের পর তিনি যা লিখেছেন, '...with the dawn of independence the importance of those records now have as part of the national treasure will be fully realised and the claims of this department for being treated as one of the most important department of Government will not be overlooked...' ঔপনিবেশিক যুগের নথিপত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় সম্পদের অংশ ও 'রেকর্ডরুম' সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পেল ১৯৪৮ সালে।

৩

সহ-সচিবের প্রস্তাব কিছুটা সমালোচনার সুরে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। মহাফেজখানা বা লেখ্যশালার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এমন আলোচনা অনিবার্যভাবেই মহাফেজখানার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রাধান্য পেয়েছিল। নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত, ছেঁড়া দলিল দস্তাবেজের জন্য উন্নতমানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এমনকি মহাফেজখানার বহুমুখী উন্নতির প্রশ্নে সরকারের শিক্ষাসচিব ও ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারকে নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পর্ষদ গঠনের প্রস্তাবও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো প্রস্তাবই ফলপ্রসূ হয়নি। নিপুণভাবে সব প্রস্তাবই ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে।[১৩]

১৯৫১ সালে এক সরকারি সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা-উত্তরকালের রেকর্ডরুমের প্রথম সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা হল। ঔপনিবেশিক যুগে রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে এক ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠী সরকারি দলিল দস্তাবেজ প্রথমে রাজনৈতিক ও পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে রেখেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে প্রথমে রাজনীতি পরে গবেষণা স্থান পেয়েছিল, স্বাধীন ভারতে এ অবস্থা পালটিয়ে যায়।

সুতরাং ১৯৫১ সালের ১ অক্টোবর সরকার 'রেকর্ডরুম'কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে শিক্ষা বিভাগে স্থানান্তরণের আদেশ জারি করে। এই সরকারি নির্দেশ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংবিধান ও নির্বাচন শাখা, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নামে এই আদেশ প্রকাশ করা হয়।[১৪]

তবু স্বাধীনতা-উত্তরকালে বোধকরি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 'রেকর্ডরুম' পুনর্গঠন বা মহাকরণের বাইরে ঐতিহাসিক শাখা গড়ে তোলা। এর আগের ইতিহাস আছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্থানাভাবই ছিল রেকর্ডরুমের অন্যতম জটিল সমস্যা। মহাকরণের একই ছাদের নীচে ঐতিহাসিক (১৭৫৮–১৯০০) ও চলতি শাখা (১৯০০-উত্তরকাল)'র নথিপত্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলা মহাফেজখানার নথিপত্র সংরক্ষণ করার সুযোগ ছিল না। ১৯৩৮ সালে গঠিত সরকারের 'অ্যাকোমোডেশন কমিটি' জানিয়েছিল মহাকরণে সুষ্ঠুভাবে নথিপত্র সংরক্ষণ ও গবেষকদের ব্যবহারের মতন উপযুক্ত ঘর নেই।[১৫]

মহাকরণের বাইরে অর্থাৎ শহর কলকাতার অন্যত্র সন্ধান করেও এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যায়নি। আলিপুরের রিফর্মেটরি স্কুল বা মেডিকেল কলেজের অন্তর্ভুক্ত ইডেন হিন্দু হাসপাতালের অব্যবহৃত ঘরের কথাও ভাবা হয়েছিল। ইডেন হিন্দু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য ঘর দিতে চায়নি।[১৬] যুদ্ধের কারণে এই সমস্যা মিটেছিল মহাকরণ থেকে বহরমপুরে নথিপত্র স্থানান্তরিত করে (১৯৪২)। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার এই সমস্যা পুরোভাগে চলে আসে।

শিক্ষা বিভাগ সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে মহাফেজখানার স্থানাভাবজনিত পুরোনো সমস্যা সমাধানে সদর্থক পদক্ষেপ নিল। জুন ১৪, ১৯৫৬ সালে 'রেকর্ডরুম' পুনর্গঠনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রীসভা অনুমোদন করে। কলেজ স্ট্রিটের ৬ ভবানী দত্ত লেনে প্রয়াত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি ও জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রয়াত মজুমদারের ভবানী দত্ত লেনের দোতলা বাড়ি, মন্ত্রীসভা আশা করেছিল ভবিষ্যতে ছ'তলা করা হবে এবং এর ফলে নথিপত্র সংরক্ষণের কোনো সমস্যা হবে না। এই জমি ও বাড়ির মূল্য ধরা হয় পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা।[১৭] এই সরকারি সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে নথি পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদনে পর্ষদ সচিব খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন '...When the central record office is constituted, I hope this survey committee will be recognised as the consultative committee in all matters relating to publication of records or reference media.'[১৮] ঐতিহাসিক ড. সিনহা ১৯৫৬ সালেই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানা সম্বন্ধে গভীর আস্থা নিয়ে এ কথা লিখেছিলেন—তিনি এর অতীত ইতিহাস জানতেন। ১৯৫৮ সালে দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানকার সহায়কদের 'লেখ্য-বিজ্ঞান' বা আর্কাইভাল সায়েন্সে এক বছরের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 'পেশা' হিসেবে আর্কাইভসকে মেনে নেওয়ার এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ।[১৮ক] এর পরে নিয়ম অনুযায়ী সব ঘটেছিল।

যা হোক প্রাথমিক পর্যায়ে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে প্রশাসনিক কারণে ভবানী দত্ত লেনের ওই জমি ও বাড়ির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরের হাতে। ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে শিক্ষা বিভাগকে মার্চ ১৯৫৯, ৬ ভবানী দত্ত লেনের বাড়ি ও জমির অধিকার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এপ্রিলে ওই জমি বাড়ি সরকারের 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড

বিল্ডিংস' বিভাগের, বর্তমানে পূর্তদপ্তরের হাতে আসে, পরে শিক্ষা বিভাগ ও মহাফেজখানার।[১৯]

জানুয়ারি ১৯৬১ সাল থেকে ভবানী দত্ত লেনের নতুন বাড়িতে মহাকরণে সংরক্ষিত ১৯০০ সাল পর্যন্ত নথিপত্র পাঠানো শুরু হয়। নথিপত্র স্থানান্তরণের কাজ অবশ্য চলছিল খুব ধীর গতিতে। প্রাক্ সিপাহি বিদ্রোহ যুগের নথিপত্র দেখার জন্য গবেষকদের ওই বাড়িতে পাঠানো হত, সরকারি প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে। ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক শাখা কার্যত আত্মপ্রকাশ করে। ডিসেম্বর ১৯৬২'র মধ্যে মহাকরণ থেকে ভবানী দত্ত লেনের ১৯০০ পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র স্থানান্তরিত করা হল।[২০]

অন্যদিকে রেকর্ডরুমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক স্তরে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৯১০-এর অখণ্ড 'রেকর্ডরুম' ১৯৬২-এর মধ্যে স্টেট আর্কাইভস নাম নিয়ে ভবানী দত্ত লেনে ঐতিহাসিক (১৭৫৭–১৯০০) ও মহাকরণে চলতি শাখা (১৯০০)-য় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় মূলত স্থানাভাবের জন্য, সরকারি দলিল দস্তাবেজের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক অপরিহার্যতা মেনে নিলে এ বিভাজন মানা যায় না।

স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র 'আর্কাইভস' হিসেবেই পরিচিত হয় সর্বত্রই। লেখ্যাগার বা রেকর্ডরুমের ক্ষুদ্র পরিসরে আর্কাইভস-এর অর্থ ধরা পড়ে না। ঔপনিবেশিক যুগের অনেক নথিতে 'রেকর্ডরুম'কে আর্কাইভস বলা হয়েছে, বাংলায় পরে বলা হয়েছে 'মহাফেজখানা' বা 'লেখ্যশালা' পরে 'লেখ্যাগার'। এপ্রিল ১৯৬২ সালে এক সরকারি আদেশ বলে রেকর্ডরুম স্টেট আর্কাইভস নামে পরিচিত হল, সুষ্ঠুভাবে আর্কাইভস প্রশাসন পরিচালনার জন্য অধিকর্তা, সহঅধিকর্তার মতন দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। সরকারে সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস থেকে যথাক্রমে অধিকর্তা ও সহঅধিকর্তা পদে নিয়োগের কথা বলা হল। কোনো প্রশাসক নয়, শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই আর্কাইভসের মতন অতীতচর্চার সর্বোচ্চপদে আসীন হলে আর্কাইভসের মঙ্গল হবে এমন ভাবনায় সরকারের ভুল ছিল না।[২১]

মহাফেজখানা সুনিয়ন্ত্রণে রাখা নথিপত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম শর্ত ছিল। আর্কাইভস আছে অথচ নথিপত্রের পরিচর্যা নেই এমন ভাবা যায় না। আবার গবেষণামূলক কাজে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়াও আর্কাইভসের অন্য আর এক প্রধান দায়িত্ব। এই সরল সত্য ঔপনিবেশিক 'রেকর্ডরুম' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে স্বীকার করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাধ্যবাধকতার মধ্য থেকে গবেষকরা এ সুযোগ পেতেন। স্বাধীন রাজ্যে এ অবস্থা পালটিয়েছিল।

১৯৬৫ সালের মধ্যে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি দস্তাবেজ গবেষকদের কাছে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯০০ সাল পর্যন্ত সরকারি নথিপত্র থেকে গবেষকরা সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। এর জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি লাগত না। উত্তর-১৯০০-র কালে চল্লিশ বছরের পুরোনো নথিপত্র গবেষকদের দেখানো যেতে পারত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে। বর্তমানে এ নিয়ম নেই।

সরকারি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় জানুয়ারি ১৯৬১ সাল থেকে জুলাই ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আর্কাইভসে গবেষণার জন্য নাম নথিভুক্ত করেন ১৩৩ জন গবেষক। এদের মধ্যে ১২ জন মহিলা।[২২]

গবেষণার বিষয়বস্তু মূলত আঠারো-উনিশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের নানান অধ্যায়ভুক্ত। প্রাধান্য পেয়েছিল উনিশ শতক চর্চা। এই চর্চার একদিকে ছিল এই সময়ের শিক্ষা, সমাজ, বৌদ্ধিক ইতিহাস বা রেনেসাঁর উৎস সন্ধান করা, আর অন্যদিকে ছিল বাংলার কৃষক সমাজের ইতিহাস খুঁজে বেড়ানো সরকারি দলিল দস্তাবেজের পাতায়। উনিশ শতক নিয়ে গবেষকদের কৌতূহলে ভাটা পড়েনি কখনও, যার সূচনা ১৯২০'র যুগে।

বর্তমান অধ্যায়ের সূচনায় ঔপনিবেশিক যুগের সরকারি নথিপত্রের প্রদর্শনী নিয়ে লেখা হয়েছে। প্রথামাফিক অনুষ্ঠিত এই সমস্ত প্রদর্শনীর যে খুব গুরুত্ব ছিল এমন দাবি সেই সময়ের শাসকগোষ্ঠীও করতেন না। সরকার খেয়ালখুশি মতন প্রদর্শনী করতেন, আর্থিক সমস্যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রদর্শনী স্থগিত রাখতেন। স্বাধীনতার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল।

সরকারি নথিপত্র প্রদর্শনীর ধ্যান-ধারণায় সদর্থক পরিবর্তন এল ১৯৮০-র কালে। মহাফেজখানার দায়িত্ব শুধু নথিপত্র সংরক্ষণ বা তথ্য সরবরাহ করা নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব—এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল বিগত শতকের ৮০-র দশকে। ওই সময় থেকে আন্তর্জাতিক নথি পর্ষদের আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাফেজখানার কাজে গুণগত পরিবর্তন আসে। আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাফেজখানায় শুরু হল 'মহাফেজখানা সপ্তাহ' বা 'আর্কাইভস উইক' উদ্‌যাপন। 'মহাফেজখানা সপ্তাহ'-এর অন্যতম অঙ্গ হল সরকারি নথিপত্রের প্রদর্শনী। আর এই ধরনের প্রদর্শনীর লক্ষ্য ছিল, আগেই লেখা হয়েছে, সরকারি দলিল দস্তাবেজ সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞানতা দূর করা, বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইতিহাসমনস্ক করে তোলা। সরকারি দলিল দস্তাবেজ প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে মহাফেজখানার সামাজিক মূল্য নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এই সময়।

সুতরাং ১৯৮০ থেকে সুচিন্তিত বিষয়ে উপযুক্ত ধারাবাহিক বর্ণনা বে-সরকারি তথ্য ও আলোকচিত্রের সাহায্য নিয়ে রাজ্য মহাফেজখানায় যে প্রদর্শনীর সূচনা হল তার মধ্য দিয়ে নথিপত্র সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল জাগছিল এমন মন্তব্য করতে আমাদের দ্বিধা হয় না। ১৯৮১-র লেখ্য-সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে বাংলা সরকারের এক শীর্ষ ব্যক্তিত্বের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যিনি বলেছিলেন '...the Archives Week will go a long way in presenting the Archives in its truest perspective before the public.'[২৩] গত ২৫ বছরে রাজ্য মহাফেজখানার বিভিন্ন প্রদর্শনীগুলি সম্বন্ধে নথিবদ্ধ সাধারণের মতামত বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনে হবে মহাফেজখানাকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে সকলের কাছে তুলে ধরতে এই সময়ের প্রশাসন

কোনো কার্পণ্য করেনি।

জনগণের সঙ্গে সরকারি দলিল দস্তাবেজের সম্পর্ক গড়ে উঠলে সাধারণ মানুষজন বুঝতে পারেন অদেখা, অচেনা নথিপত্রে ইতিহাস কীভাবে প্রতিফলিত হয়, ইতিহাসের তথ্য কাকে বলে! প্রকৃত ঘটনা, সমাজ-জীবনের সত্যাসত্য সরকারি দলিলের পাতা থেকে মানুষের মনে স্থান করে নেয়। ২০০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ' সংক্রান্ত রাজ্য মহাফেজখানার এমনই এক আলোড়ন তোলা প্রদর্শনীতে এ সত্য প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

আর্কাইভস বা রাজ্য মহাফেজখানা : ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

নানা কারণে গত শতাব্দীর শেষ বছর ২০০০ সাল গুরুত্বপূর্ণ। মহাফেজখানার পরিচিত তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আচার্যের সচিবালয়ের দুর্মূল্য নথিপত্র সংগ্রহ করে। একবিংশ শতাব্দীর রাজ্য মহাফেজখানা গত তিন শতকের হৃদপিণ্ড নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে আছে, ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি কোথাও, কিন্তু এখানেই খোঁজ মিলেছে নিশ্চিত পরিবর্তনের। গুপ্তধন সন্ধানের প্রয়াস ও আকুতির মধ্যে এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজ্য মহাফেজখানা প্রায় আড়াইশো বছরের জানা পথ থেকে সরে এসে ফোটো আর্কাইভস, ফোটো গ্যালারি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তা আজ জাতীয় স্তরে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের মহাফেজখানার সঠিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এটা অবশ্যই অভিনব হয়তো বা চমকপ্রদ, চরিত্রের দিক থেকে। 'পিকচার' বা 'ফোটো' আজ বিশ্বের প্রায় সমস্ত মহাফেজখানায় 'রেকর্ড' হিসেবে স্বীকৃত, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও চিনেও। সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'রেকর্ড'-এর সংজ্ঞা পালটায়, পালটিয়েছেও। বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে আমার যাওয়ার উপায় নেই। সাবধানি হয়ে শুধু লেখা যায় ১৯০৬ সালে ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি গোয়েন্দা দপ্তরের অন্যতম সাহায্যকারী প্রশাখা হিসেবে তাদের 'ফোটো সেকশন' গড়ে ওঠে, বর্তমানে রাজ্য মহাফেজখানার ফোটো আর্কাইভসের শিকড় এই 'ফোটো শাখা'য় রয়ে গিয়েছে।

১৯০৬ সালে যে কারণে এক ভিনদেশি সরকার তাদের 'ফোটো সেকশন' গড়ে তুলেছিল আজ সে প্রয়োজন নেই : এর জায়গায় স্থান পেয়েছে আরও বৃহত্তর প্রয়োজন—ঔপনিবেশিক আমলার চোখে স্বীকৃত 'অপরাধী' আজ সমাজবিজ্ঞানীর চোখে শহিদ, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ওই 'অপরাধী', এই 'শহিদ'কে জানা আমাদের কাছে খুব জরুরি। সময় পালটিয়ে দিয়েছে রেকর্ডের চরিত্র, গুরুত্ব। এটা আর্কাইভস।

ফলত ২০০০ সালের শেষের দিকে, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সংগৃহীত বাংলা দেশের বিপ্লবীদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য নিয়ে রাজ্য মহাফেজখানা ওই নতুন ধরনের এক সংগ্রহালয় গড়ে তোলার যে চেষ্টা শুরু করে আজ তা অনেকাংশেই শেষের দিকে। সম্পূর্ণ হলে অনুমান করা যায়, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক কিছু আমাদের

কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক অখ্যাত বিপ্লবীর ছবির বর্ণনায় এক গোয়েন্দা আধিকারিক যখন লেখেন 'ইনি রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' তখন আমরা অবশ্যই রোমাঞ্চিত হই; এই বিপ্লবকে বড়ো কাছের বলে মনে হয়।

ফোটো আর্কাইভসের 'ছবি আর তথ্যে' আমরা ফিরে যাই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় বা এক ধূসর অতীতে যেখানে আমরা ছিলাম না কখনও বা দেখিনি সেই বিপ্লবীকে যিনি বাড়িতে কীর্তন গানের আসর বসিয়ে বিপ্লবের কাজ করতেন। এর ছবি জোগাড় করা পুলিশের কাছে জরুরি ছিল। এখন আমাদের সংগ্রহে রাখা আরও বেশি জরুরি, দায়িত্বও বটে।

মহাফেজখানায় বিশ শতকের ঐতিহ্য আর এর বিচিত্র সম্পদসম্ভার নিয়ে নতুন শতাব্দীতে পৌঁছেছি আমরা। গগনচুম্বী প্রত্যাশার বাতাবরণ গড়ে না তুললেও বলা চলে শতাব্দীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মহাফেজখানা এখন গভীরভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের নানা সম্পদ সন্ধানে রত। সমাজ-ইতিহাসের কাছে মহাফেজখানা সব সময়েই দায়বদ্ধ। বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহারে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যসমূহ আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করাই আর্কাইভসের অন্যতম প্রধান কাজ। ইতিহাসমনস্ক বর্তমান সরকার চান মহাফেজখানা সতত ঋদ্ধ হোক, এখানে নিত্য তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটুক।

গবেষণাবিধি

১৯১৯ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদে যে সমস্ত প্রাদেশিক সংগ্রহালয়গুলি যোগ দিয়েছিল, বাংলা প্রাদেশিক সংগ্রহালয় বা রেকর্ডরুম ওই সমস্ত সংগ্রহালয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। রাজনৈতিক দপ্তরভুক্ত এই সংগ্রহালয়ের ঐতিহাসিক অংশের একদিকে রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র (জুন ১৭৮৬–১৮৫৮) আর অন্যদিকে ছিল কোম্পানির অন্যান্য বিভাগ, ছোটো বড়ো শাখার নথিপত্র। অর্থাৎ রাজনৈতিক দপ্তরের এই ঐতিহাসিক শাখা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন দু-ধরনের নথিপত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

আমাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, ওই সমস্ত নথিপত্রের তথ্যানুসন্ধানের কাজ কীভাবে পরিচালনা করা হত ? বা এখানকার গবেষণাকক্ষে উপস্থিত গবেষকের আচার-ব্যবহারই বা কী হওয়া উচিত ছিল ?

আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি ১৯১০ সালে প্রাদেশিক সংগ্রহালয় পরিচালন বিধি তৈরি করা হয় সেখানে সরকারি নথিপত্র ব্যবহার করা বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে (৫৬ ধারা) আবার এর সঙ্গে পর্ষদের নিজস্ব বিভাগীয় 'ম্যানুয়াল' ছিল। অর্থাৎ পর্ষদের নথিপত্রের জন্য একজন গবেষক পর্ষদ ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে পারতেন, সাধারণ পরিচালন বিধির পরিবর্তে। একই সঙ্গে দুই পরিচালন বিধি অনুসরণের জন্য 'রেকর্ডরুম' কর্তৃপক্ষকে অনভিপ্রেত সমস্যাব মুখোমুখি পড়তে হত অনেক সময়ে। অথচ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো বিভাগের নথিপত্র থেকে অনুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে রাজনৈতিক দপ্তরের অবর সচিবের কাছে আবেদন করতে হত।[১]

শ্রীনাথ এখানে নতুন একটি শর্ত আরোপের প্রস্তাব দিলেন। শ্রীনাথ বললেন, আবেদনকারীকে প্রস্তাব মতন অনুলিপি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে।[২] সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

ওই সমস্ত নিয়মাবলি অবশ্যই 'রিসার্চ রুল' বা গবেষণাকক্ষ পরিচালনবিধি ছিল না। সামগ্রিকভাবে ১৯১০ সালের সংগ্রহালয় পরিচালনবিধির সংশোধন ও সংযোজন ছিল ওই বিধি। এখানে শুধু তথ্যসন্ধানীদের নথিপত্রের অনুলিপি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, গবেষণাকক্ষ ব্যবহার ও এতদ্‌বিষয়ক নিয়মনীতি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। আর সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলির অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য সমস্যা তৈরি হত। যেমন হয়েছিল ঐতিহাসিক এ. অ্যাসপিনালের ক্ষেত্রে।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাসপিনাল ১৯২৭ সালে বাংলা সংগ্রহালয় থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেন সেই সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে না জানিয়ে তাঁকে দেওয়ার

মৌখিক প্রস্তাব করেন রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিব।[৫] এই প্রস্তাব নিয়ে কিপার বিস্তারিত আলোচনার পর ঘুরপথে উপসচিবের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিপার তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করতে অবশ্য ভোলেননি যে যদি এর ফলে আপত্তিজনক কোনো তথ্য প্রকাশ হয় তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবেন?

ফলত অ্যাসপিনাল বাংলা সংগ্রহালয়ে যেদিন (১৯২৭ সালের জুন মাসের কোনো একদিন) তাঁর তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ করেছিলেন সে-দিনই তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিপার এটা মানতে পারেননি, তিনি জানাতেও ভোলেননি '...we give all facilities in our power to research scholars.' তবুও অ্যাসপিনালের পাণ্ডিত্য, পরিচিতি মনে রেখে কিপার প্রস্তাব করেন, '...It would be desirable, in exceptional case like that of Aspinal to waive procedure and grant copies without reference to the Deptt. concerned, the responsibility may be taken by the political Department, if D. S. thinks so.' অর্থাৎ কিপার নিজ দায়িত্বে বর্তমান নিয়মবিধি থেকে সরে আসতে রাজি ছিলেন না। রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিব এ দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি লিখলেন, '...on the whole I do not think any change should be made.'[৪]

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে বাংলা সরকার সরকারি নথিপত্র দেখতে ইচ্ছুক গবেষকদের জন্য একগুচ্ছ নিয়ম প্রবর্তন করে। এই সমস্ত নিয়মাবলি '...Rules and Regulations Governing the public use and inspection of the Records and Archives belonging to the Govt. of Bengal.' নামে পরিচিত।[৫] এখানে একই সঙ্গে 'আর্কাইভস' ও 'রেকর্ডরুম'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। 'রেকর্ডস' ও 'আর্কাইভস' একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার 'আর্কাইভস' এখানে 'মহাফেজখানা'ও নথি সংরক্ষণের স্থান হতে পারে।

১৯২৮ সালের নিয়মাবলির মোট একুশটি অংশ ছিল। নিয়মাবলির প্রথমেই বলা হয়েছে সাধারণের সরকারি নথি দেখার বা নেওয়ার কোনো অধিকার নেই, সরকার প্রয়োজনে যে কোনো আবেদন নাকচ করে দিতে পারেন। এই নিয়মাবলির শুরুতে গবেষণাকক্ষ, গবেষণার সময় ও কারা নথি দেখার অধিকারী সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিয়মাবলির ওই অংশে বলা হয়েছে নথিপত্র দেখার কাজ 'রেকর্ডরুম' সংলগ্ন গবেষণা কক্ষে বসেই করতে হবে, গবেষণাকক্ষের সময় ছিল শনিবার ভিন্ন সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। শনিবারে গবেষণাকক্ষ খোলা থাকত দুটো পর্যন্ত। রবিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ভিন্ন অনুমোদিত ব্যক্তিদের কাছে প্রতিদিনই গবেষণাকক্ষ খোলা থাকত।

সরকারি নথিপত্র নিয়ে কাজ করার জন্য কিপারের কাছে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তাঁদের পেশা ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আবেদন করতে হত নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে, কিপার তাঁদের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র দিতেন। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে উপযুক্ত সুপারিশ থাকা

জরুরি ছিল, ব্রিটিশ রাজের প্রজা ভিন্ন প্রত্যেক আবেদনকারীকে তাঁর দূতাবাস বা তাঁর দেশের কলকাতাস্থিত রাজনৈতিক প্রতিনিধির সুপারিশ জোগাড় করতে হত।

গবেষণাকক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ক্ষমতা

ওই নিয়মাবলিতে গবেষণাকক্ষের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সুষ্ঠুভাবে গবেষণাকক্ষ পরিচালনার জন্য বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আধিকারিক মনে করলে যে কোনো গবেষককে গবেষণাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারতেন। যদি মনে হত— ১. গবেষক গবেষণাকক্ষের নিয়মাবলি ভাঙছেন, ২. সরকারি নথির ক্ষতি করছেন, ৩. ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করছেন, ৪. গবেষক এমন ভাষা ব্যবহার করছেন বা তাঁর আচার-ব্যবহার বা তাঁর পোশাক অপরের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে ইত্যাদি।

বহিষ্কারের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশ করে রাজনৈতিক দপ্তরের উপ-সচিবকে জানাতে হত।

ওই সমস্ত নিয়মাবলির শেষ তিনটি অর্থাৎ ১৯—২১ অংশে বলা হয়েছে গবেষণা কক্ষের কোনো কর্মীকে দিয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য আবেদনকারীকে প্রতিদিন পারিশ্রমিক বাবদ সচিবালয়ের কোশাধ্যক্ষের কাছে অগ্রিম অর্থ জমা দিতে হবে।

আবেদনকারীকে অনুলিপি মঞ্জুর করা বিষয়ে বলা হল

আবেদনকারীর প্রস্তাবিত তথ্য পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনার পর যদি তথ্যে আপত্তিজনক কিছু না পাওয়া যেত তবেই আবেদনকারীকে তাঁর প্রস্তাবিত অনুলিপি দেওয়া হত। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে না জানিয়ে কোনো নথির অনুলিপি প্রস্তুত করা, তথ্য সংগ্রহ করা বা এতদ্‌বিষয়ক কোনো সংবাদ জানানো যেতে পারত না। অনুলিপি প্রস্তুতকারককে প্রতি একশো শব্দের জন্য দু আনা হিসেবে অগ্রিম পারিশ্রমিক দেওয়ার সুপারিশ ছিল গবেষণা বিধিতে।

ওই সমস্ত নিয়মাবলির পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র। ওই সদস্যপত্রের একটি অংশে গবেষককে জানাতে হত আবেদনকারী 'ব্রিটিশ সাবজেক্ট' কি না। গবেষককে লিখিতভাবে জানাতে হত তিনি গবেষণাকক্ষের নিয়মাবলি মেনে চলবেন।

গবেষণাকক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৯২৯ সালের শুরুতে সরকারি নথিপত্রের অনুলিপি প্রদান নিয়ে রাজনৈতিক দপ্তর নতুন করে যে প্রশ্ন তুলেছিল তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রচলিত নিয়ম ছিল গবেষক ও সাধারণের চাহিদা মতন সরকারি দলিলের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে ওই ব্যক্তিকে দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রাখা হত না। রাজনৈতিক দপ্তরের কাছে বিষয়টি আদৌ সমর্থনযোগ্য ছিল না।

প্রশাসনের দিক থেকে নির্ভুল থাকার জন্য সর্বোপরি মহাফেজখানার কাছে আবেদনকারীকে কিছুটা দায়বদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দপ্তরের প্রস্তাব ছিল : (১) যে

সমস্ত নথির অনুলিপি আবেদনকারীকে দেওয়া হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ডরুমে রাখতে হবে, (২) রেকর্ডরুমের পক্ষ থেকে ওই আবেদনকারীকে সরাসরি জানিয়ে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিয়ে অনুলিপিগুলি তাঁকে পাঠানো হল।

১৯২৮ সালের নিয়মাবলি নিঃসন্দেহে বাংলা সংগ্রহালয় বা মহাফেজখানার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বাংলা সচিবালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের এই অভিনব প্রতিষ্ঠানটি আপন গুণে 'বিশেষ' হয়ে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ ওই সমস্ত নিয়মাবলি। এই সমস্ত নিয়মাবলি ঠিক অর্থেই নথি বা সংগ্রহালয়ের চালিকাশক্তি ছিল, এখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তথ্য সংগ্রহের সীমিত অধিকারকে বিধিসম্মত করা হল, সুনিয়ন্ত্রিত করা হল গবেষণার পরিবেশ, গবেষকদের ওপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় সারস্বত চর্চায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি। গবেষকদের আচার-ব্যবহারের মাপকাঠি ঠিক করা হয়নি, কিন্তু তাদের বেহিসেবি পদক্ষেপ বা চিন্তা ভাবনার রাশ টানার ব্যবস্থা করা হল। কোনো প্রশাসনিক বিধি স্থায়ী হতে পারে না। সময়, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থা পালটিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। ১৯২৮ সালে গৃহীত বাংলা সরকারের গবেষণাকক্ষ পরিচালন বিধি বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয় অনিবার্যতা হেতু।

১৯২৮ সালের নিয়মাবলিতে মোট একুশটি ধারা ছিল। ১৯৩৩ সালে এখানে নতুন এক ধারা যোগ করা হয়। বাইশতম ধারায় বলা হল এই মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্যাদির সাহায্যে যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করা হয় তাহলে লেখককে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ/রচনার একটি খণ্ড সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে মহাফেজখানায় জমা দিতে হবে। এই ধারা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক ছিল না। সরকারি নথিপত্রের সাহায্যে যে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করা হয় তার ওপর সরকারের পরোক্ষ দাবি থাকে। সরকার মনে করলে জানতে চাইতে পারেন সংগ্রহালয়ের লেখ্য সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরও লেখা যায় গবেষক/লেখকদের পাঠানো সৌজন্য সংখ্যায় মহাফেজখানার সাধারণ কর্মীদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি মেলে।

যাহোক ওই গবেষণাবিধি আবার সংশোধনের চেষ্টা করা হয় ১৯৩৮ সালে, এবং কঠোরভাবেই। এই প্রস্তাবিত সংশোধনের জন্য তৈরি হল নতুন সমস্যা। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বিখ্যাত শিখ ঐতিহাসিক ড. গণ্ডা সিং।[৮]

১৯৩৮ সালের ওই প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা হল কোনো গবেষক/লেখক যদি সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কোনো গ্রন্থ/রচনা প্রকাশ করতে চান তাহলে তাঁকে এই প্রকাশনার আগে হয় ওই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে পরীক্ষার জন্য প্রশাসনের কাছে। কঠোর বলে মনে হলেও এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল : '...to enable Govt. to check the author's tendency if any to make use of the notes and extracts in such a manner as to give rise to communal jealousy or class hatred.' সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে এমন বিধি নিষেধ ছিল না কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ভিন্ন। যেমন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বা 'ইন্ডিয়ান

স্টেটস' সম্পর্কিত নথিপত্র কোনো প্রকাশনার আগে সরকারের অনুমতি লাগত।[৭]

যা হোক বাংলা সচিবালয়ের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ড. গণ্ডা সিং তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হলে এক অভাবনীয় সমস্যা তৈরি হল। ড. সিং-এর পক্ষ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা সরকারের অনুমতি চাওয়া হলে তাঁকে জানানো হল গ্রন্থ প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ সরকারের কাছে জমা দিতে হবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। ড. সিংয়ের পক্ষ থেকে অক্টোবর ৬, ১৯৩৮-এ অমৃতসরের খালসা কলেজের অধ্যক্ষ ভাই যোধ সিং বাংলা সরকারের কিপারকে এক চিঠিতে জানান, ড. গণ্ডা সিংয়ের প্রস্তাবিত প্রকাশনার পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ জমা দেওয়া সম্ভব হবে না, তাহলে মুদ্রণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং প্রস্তাবিত গ্রন্থের একটি খণ্ড সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে সরকারকে পাঠানো হবে, এমনকি গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা সরকারের কাছে যথাযথভাবে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে।[৮]

যোধ সিং ওই চিঠিতে নানাভাবে কিপারকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে বাংলা সরকারের প্রস্তাবিত শর্ত মেনে নিলে নানাভাবে প্রকাশনার কাজ ব্যাহত করবে। ক্ষুব্ধ যোধ সিং লিখেছিলেন যে উদ্দেশ্যে সরকার সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে অর্থাৎ '...for bonafide historical purpose' সে উদ্দেশ্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে সরকারের এই শর্তে। যোধ সিং-এর ওই চিঠি নিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নতুন করে আলোচনা শুরু হল।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিচার-বিশ্লেষণ অনুধাবন করে কিপার অভ রেকর্ডস নভেম্বর ১১, ১৯৩৮ সালে তাঁর মতামত জানালেন অতি সতর্কভাবে, তিনি জানালেন প্রকাশনার আগে লেখক/গবেষকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ জমা নিয়ে ও পরীক্ষা করে সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায় যে প্রস্তাবিত প্রকাশনা কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা সংঘাত তৈরি করবে না বা ঘৃণা ছড়াবে না। কিপার প্রশ্ন তুললেন অন্যভাবে। তিনি লিখলেন, বিশাল আকারের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ কীভাবে জমা নেওয়া হবে? এই সময়ে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের (চন্দ্র ও মজুমদার : *রামমোহন* পৃষ্ঠা ৬০০ ও অধ্যাপক ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় : *ইন্ডিয়ান ফিনান্স ইন দ্য ডেজ অভ কোম্পানি*, পৃষ্ঠা ৩৮৬) উদাহরণ তুলে লিখলেন এমনতরো ক্ষেত্রে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ জমা নেওয়া বা পরীক্ষা করা কঠিন। আবার যে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা হবে না এমন সিদ্ধান্ত কোনো লেখকই দিতে পারেন না। বিশাল আকারের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করবে কে? সংগত প্রশ্ন। সব কিছু ব্যাখ্যা করে কিপারের মনে হয়েছিল : প্রকাশনার আগে পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক না করাই বাঞ্ছনীয়। যদি করতেই হয়, কিপার জানালেন, সে ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার দায়ভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নিতে হবে। কিপারের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র দপ্তর মেনে নিয়েছিল।[৯]

উপর্যুক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে বাংলা প্রশাসন ড. গণ্ডা সিংয়ের ব্যাপারে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চায়নি যেখানে গবেষক ও প্রশাসনের কাছে অবাঞ্ছিত সমস্যা তৈরি হতে পারে। প্রকৃত গবেষকরাই বর্তমান নিয়মনীতির মধ্যে থেকে সরকারি তথ্য সংগ্রহ ও

ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এবং এই ব্যবস্থা থেকে সরকার কখনও সরে আসতে রাজি ছিল না। উদাহরণ দেওয়া যায়।

এই সময় অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেশ্বর দাস বাংলা সরকারের কাছে ওড়িশার 'কণিকা' রাজ্যের জন্য সরকারি নথিপত্র দেখতে চেয়ে আবেদন করেন। তিনি ওড়িশার 'কণিকা' রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের মাধ্যমে এই আবেদন করেছিলেন। কণিকা'র রাজাসাহেব তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাধ্যমে এই রাজ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছেন, অধ্যাপক দাস তাঁর আবেদনপত্রে লিখেছিলেন।[১০]

স্বরাষ্ট্র দপ্তর অধ্যাপক দাসের আবেদনপত্র বিচার বিশ্লেষণের পর লিখেছিলেন : '...It is not clear why the Raja Sahib of Kanika did not approach this Government through the Govt. of Orissa. It does not...clear that the reasearch is a bonafide historical.' সুতরাং আবেদনকারীকে সরাসরি ওড়িশা সরকারের মাধ্যমে আবেদন করার প্রস্তাব করা হল। অধ্যাপক মহেশ্বর দাসকে কিপার জানিয়েছিলেন, রূঢ় বলে মনে হতে পারে, '...Public are not allowed access to the records preserved in the Bengal Sectt. Record Room.'[১১]

ড. গণ্ডা সিং ও অধ্যাপক মহেশ্বর দাসের ঘটনা প্রমাণ করে যথার্থ নিয়মনীতির প্রেক্ষিতে কত সহজ অথচ কঠোরভাবে গবেষণাবিধি প্রয়োগ করে সরকারি নথি, সর্বোপরি মহাফেজখানার বিশেষত্ব সুরক্ষার চেষ্টা করা যায়।

অ্যাসপিনাল, ড. গণ্ডা সিং বা মহেশ্বর দাসের ঘটনা বিক্ষিপ্ত নয়। মহাফেজখানায় রক্ষিত সরকারি দলিল দস্তাবেজ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা নিয়মবিধি সকলের ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত, সরকারি নিয়মকানুন শুধুমাত্র কাগজে কলমে লেখা থাকত না। আবার গবেষণাবিধির কোনও অংশ জরুরি বা জরুরি নয় এমন প্রশ্নও উঠত না। 'রিসার্চ রুল'-এর ১ থেকে ২২তম ধারা/নিয়ম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের কাছে উদাহরণ আছে।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে খ্যাতনামা গবেষক ও আইনজীবী জে. কে. মজুমদার বাংলা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের যুগ্ম সচিবের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিষয়ে গবেষণার জন্য আবেদন করেন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'অথেনটিক বায়োগ্রাফি' লিখতে চেয়েছিলেন। বিশদ বিবরণে না গিয়ে লেখা যায় মজুমদারকে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি শিক্ষা বিভাগ ও ডি. পি. আই-এর নথিপত্র থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সরকারিভাবে এই জীবনী প্রকাশের অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনগত প্রশ্ন উঠল অন্যভাবে।

আমরা জানি ১৯২৮'র সরকারি নিয়মনীতি অনুসারে প্রত্যেক গবেষককেই সরকারি তথ্য সংগ্রহের জন্য কিপার বা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপসচিবের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে 'স্টুডেন্টস টিকিট' যা গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র জোগাড় করতে হত। জে. কে. মজুমদার ওই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৬তে তিনি অবশ্য এ নিয়ম

মানেননি।

সুতরাং মজুমদারের জগদীশ বসু সংক্রান্ত আবেদনপত্র সংবলিত নথিটি রেকর্ডরুমে পাঠানো হলে এখান থেকে সরাসরি বলা হল : 'he should have got a student's ticket in the first instance and then applied to keeper of Records or Deputy Secretary for permission to work amongst Govt. records. It is also irregular to have copies out of the Record Room without previous sanction of the K. R.'[১২] এখানেই শেষ নয়।

ওই গবেষণাবিধির ২২তম ধারায় বলা হয়েছিল 'রেকর্ডরুম' বা মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে লিখিত ও প্রকাশিত রচনা পুস্তকের একটি খণ্ড সৌজন্য সংখ্যা হিসাবে মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমে পাঠাতে হবে প্রত্যেক গবেষককে। মজুমদার এ নিয়ম মানেননি।[১৩]

ড. মজুমদারের কাছে সৌজন্য সংখ্যার জন্য ১৯৪৮ সালে পরপর চিঠি পাঠাবার পর ৩০ অগাস্ট ১৯৪৮ সালের বিভাগীয় 'নোট'-এ লেখা হয় : 'এ যাবৎ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য পাওয়া যাইতেছে না। স্বরাষ্ট্র লেখ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য একখানি প্রকাশিত পুস্তক, তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে, সত্বর পাঠাইয়া দেন।' না, রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কোনো চিঠি/স্মারকপত্রের উত্তর দেননি ড. মজুমদার।[১৪]

জে. কে. মজুমদারের ওই নীরবতায় রেকর্ডরুম কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল বলা চলে। বিভাগীয় নোটে ১৬ মার্চ ১৯৪৯ সালে যা লেখা আছে : 'ড. মজুমদারের কাছে লেখা চিঠি স্মারকপত্র ফেরত আসেনি, সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ড. মজুমদার সমস্ত চিঠিই পেয়েছেন, না পেলে 'Dead letter Office' থেকে চিঠি ফেরত আসত। আরও লেখা হল তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ডই বিক্রি হয়ে গেছে তা না হলে রেকর্ডরুম গ্রন্থাগারের জন্য একটা খণ্ড অন্তত পাওয়া যেত।

সুতরাং ওই তারিখে বুনো হাঁসের পিছনে না ছুটে (...no good following up a wild goose chase) মজুমদার সংক্রান্ত নথিটি ক্লোজ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর আগে অবশ্য স্বীকার করা হল 'The case was half hatched from beginning to end.'[১৫]

ওই ঘটনার সময়সীমা ১৯৪৬–১৯৪৯। ড. মজুমদার সংক্রান্ত ওই সমস্ত ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে সরকারি নথিপত্র ব্যবহার বিষয়ে সেই সময়ের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষ কী ধরনের সতর্ক ছিলেন। গবেষক যতই প্রভাবশালী হোন না কেন তিনি আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারেন না। স্বাধীনতা উত্তরকালের অন্বেষা বিধিতে রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' ও আই. বি. শাখার জন্য নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে, এটা অন্য ইতিহাস।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের গবেষণাবিধি : ১৯৭৭, ১৯৮১

আমরা স্বাধীনতা-উত্তরকালের গবেষণাবিধির দু-একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করতে

পারি। ঔপনিবেশিককালের গবেষণাবিধি স্বাভাবিক কারণে গবেষক ও প্রশাসনের প্রয়োজন অনুযায়ী পালটিয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রাক্ স্বাধীনতাকালের মতন স্বাধীনকালেও সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখা বা ওই সমস্ত নথিপত্র থেকে অনুলিপি নেওয়ার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সাধারণের নেই। এই দুই যুগেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল সরকারি দলিল দস্তাবেজ একান্তভাবেই সরকারের নিজস্ব সম্পদ, এই সম্পদের ওপর সাধারণের অধিকার আছে ঠিকই, কিন্তু এই অধিকার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে ভোগ করতে হবে, অধিকার কখনোই অবাধ হতে পারে না।

কে বা কারা সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখতে পাবেন অথবা পাবেন না—এমনতরো বিভাজন রেখা ঔপনিবেশিক যুগে ছিল না। ১৯৭৭ ও ১৯৮১তে গৃহীত গবেষণাবিধি এ বিষয়ে স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছিল।[১৬] এই দুই বিধিতে বলা হয়েছে ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে গবেষক ছাত্র সকলেই সরকারি নথিপত্র দেখতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা আঞ্চলিক নথি পর্ষদের সদস্যদের সুপারিশ দরকার হয় না, অন্যদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সুপারিশ অপরিহার্য। রাজ্য মহাফেজখানার অধিকর্তা নিজের ক্ষমতাবলে যে কোনো গবেষক ছাত্রের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। ঔপনিবেশিককালে কিপার অভ রেকর্ডস এমন কোনো সুপারিশ করার অধিকারী ছিলেন না।

১৯৭৭ পরে ১৯৮১'র গবেষণাবিধিতে বলা হয়েছে (৩'এ' ধারা) ত্রিশ বছরের পুরোনো নথিপত্র যা 'মুক্ত' বা 'ওপেন' গবেষকরা সেই সমস্ত নথিপত্র দেখার অধিকারী।[১৭] ঔপনিবেশিককালের নথিতে এমনতরো তকমা ছিল না। শুরুতে গবেষকরা ১৮৫৮ পর্যন্ত নথিপত্র দেখতে পারতেন পরে এই সীমা বাড়ানো হয়েছিল। ১৯০০ সাল-উত্তর নথিপত্র দেখার জন্য স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০০৬-এ নিয়ম অনুযায়ী গবেষকরা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নথিপত্র দেখার অধিকারী। ঔপনিবেশিক যুগে এমনকি ১৯৬০-এর সূচনা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি না নিয়ে কোনো নথি দেখা যেতে পারত না। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কোনো নথি গোপনও ছিল না, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বোধকরি সব নথিই 'গোপন' ছিল।

প্রসঙ্গত আমরা রাজনৈতিক দপ্তর ও গোয়েন্দা শাখার গোপন নথির কথা লিখতে পারি। ঔপনিবেশিককালে, আমি উল্লেখ করেছি, ঠিক অর্থে কোনো 'গোপন' নথি ছিল না। রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' নথিপত্র সংগ্রহ করা হয় ১৯৭০-এর পর। ১৯৭৭-এর গবেষণাবিধি (৩'বি')তে বলা আছে গোপন নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি গবেষকরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতি ভিন্ন ব্যবহার করতে পারবেন না। অগোপন নথির ক্ষেত্রে এমনতরো বিধিনিষেধ নেই।[১৮]

১৯৮২-এর পর গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা হল। মহাফেজখানায় রক্ষিত এই সমস্ত নথিপত্র গবেষকরা দেখতে পারেন অনায়াসেই, কিন্তু ব্যবহার করার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও আই. বি. বা গোয়েন্দা শাখার অনুমোদন লাগে। এই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহার করার অনুমতি মহাফেজখানা কোনো গবেষককে দিতে পারে না।

ঔপনিবেশিক যুগের গবেষণাবিধির কঠোরতা বহুলাংশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে, বিভিন্ন সময়ে হ্রাস পেয়েছিল। আবার সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজন! গবেষক ও নথিপত্রের স্বার্থের কথা ভেবে, অনেক নূতন নিয়ম গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন ১৯৭৭-এর ৬নং ধারায় বলা হয়েছিল কোনো নথি গবেষক পাবেন কি পাবেন না তা ঠিক করবে সরকার অর্থাৎ মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষ। অতি গুরুত্বপূর্ণ বা জীর্ণ নথি, গবেষকের কাছে যতই জরুরি হোক না কেন, তিনি নাও পেতে পারেন। ১৯৭৭-এর এই ধারায় যা বলা আছে 'The Government reserve to themselves the sole right to decide whether any particular record or document shall be issued for inspection to the scholars, no reason will be assigned for refusal.'[১৯] ইত্যাদি। ১৯৮১তে এই নীতি পালটায়নি (৫'এ'ধারা)।

শেষে বলা চলে ঔপনিবেশিক যুগের গবেষণাবিধির সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালের নিয়মবিধির মৌলিক সংঘাত ছিল না; পার্থক্য ছিল দুই ভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারি নথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিতে। নথিপত্র উপযুক্ত দেখভাল করা উভয়কালেরই মূল লক্ষ্য ছিল কেন-না মহাফেজখানার সমস্ত প্রকার আকর্ষণের কেন্দ্রে আছে নথিপত্র : শত বছরের পুরোনো দলিল দস্তাবেজ। তবু স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশে নথিপত্র রক্ষা, গবেষকদের স্বার্থ নজরে রাখা ও অধিকর্তার তীক্ষ্ণ ও সচেতন দায়বদ্ধতার মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল ১৯৭৭ ও ১৯৮১'র গবেষণাবিধির প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিককালের আমলাতান্ত্রিক নজরদারি এখন নেই। ইতিহাসের পরিচিত গবেষকই মহাফেজখানার কাণ্ডারি হবেন—এমনই নিয়ম এখন। এমন ব্যক্তির হাতে মহাফেজখানা সতত সুরক্ষিত থাকবে—আশা করতে বাধা কোথায়?

২০০৬-এ পৌঁছে শুধু লিখতে পারি 'সময়' মনে রেখে গোপন নথিপত্র দেখা না দেখার বিভাজন রেখা টানা যেতে পারে। 'সময়' বলে দিতে পারে কোন 'গোপন নথি' গবেষকরা দেখতে পারেন। ১৯০৫-এ উত্তাল বাংলা দেশের ইতিকথা কেন আমরা নিষেধের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে দেখব? ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১৯০৮) যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু (১৯২৯) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল (১৯৩০) বা গ্রাম বাংলায় সাম্যবাদ বিস্তার (১৯৩০–৪৭)-এর সংবাদ নিতে আজও কেন একজন গবেষককে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে? কোনো-কোনো অন্বেষা বিধি অকারণে পীড়িত করে আমাদের।

কয়েকজন গবেষক

১৯১০ সালে রেকর্ডরুম পরিচালন বিধি গৃহীত হওয়ার পর সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল জাগছিল। একজন অখ্যাত ব্যক্তি যেমন রেকর্ডরুম বা সরকারি মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তাঁর প্রয়োজনের দলিলটির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি চাইতে পারতেন, তেমনই কোনো মহারাজা চাইতে পারতেন তাঁর পূর্বপুরুষের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কের তথ্য।[১] প্রত্যয়িত প্রতিলিপির জন্য সরকারি কোশাগারে অর্থ জমা দিতে হত, আমাদের মহাফেজখানার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক স্তরে ছিল সরকারি নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান।

সরকারি নথিপত্রের চাহিদা ১৯২০ সালের কাল থেকে গবেষকদের মধ্যে কিছুটা সাড়া ফেলেছিল এমন কথা লেখা যেতে পারে। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুম' ইতিমধ্যে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, কলকাতার গবেষকদের কাছে এই সংগ্রহালয়ের গুরুত্ব বাড়ছিল এমন প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। একদিকে রাজভবনের পশ্চিমদিকে ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুম[২] আর অন্যদিকে লালদিঘির মহাকরণে রাজনৈতিক দপ্তরের রেকর্ডরুম এই দুই প্রতিষ্ঠান এই সময় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব বাড়াতে সাহায্য করেছিল। একই দুপুরে ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুমের কাজ শেষ করে একজন অনায়াসেই লালদিঘির অন্যপারে মহাকরণে চলে আসতে পারতেন এখানকার নথিপত্রের জন্য। ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুমে গবেষণা করার অভিজ্ঞতা বিশেষ পরিচয় বহন করত যা বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তর স্বীকার করে নিয়েছিল। কয়েকজন গবেষকদের কথা লেখা যায়।

সরকারি তথ্যের সাহায্য নিয়ে বলা চলে ১৯২৪ সালে সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলা সরকারের কিপার অভ রেকর্ডসের কাছে সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। এঁদের মধ্যে সরকারি আধিকারিক ও গবেষক ছাত্র ছিলেন। হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ আর. বি. র‍্যামসবোথাম গবেষণার জন্য যে আবেদন করেছিলেন তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই সময় ভারতীয় জাদুঘরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রায়বাহাদুর আর. পি. চন্দ 'ময়ূরভঞ্জ' রাজ্য নিয়ে গবেষণার জন্য ঐতিহাসিক শাখায় নথিপত্র দেখার আবেদন করেছিলেন।[৩] আর এক সরকারি আধিকারিক স্যার ইভান্স কটন-কে ময়মনসিংহের 'পাগল'পন্থীদের উপর প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ সরবরাহ করা হয়। 'সল্ট ওয়াটার লেক' সম্পর্কিত নথিপত্র দেখার জন্য চব্বিশ পরগনার জেলা

সমাহর্তার আবেদন অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।[৪] নির্দিষ্ট গবেষণা বিধিও যথাযথ গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের (স্টুডেন্টস টিকিট) পরিবর্তে বিভাগীয় অনুমোদন নিয়ে সরকারি নথি পরীক্ষা করা বা সরকারি দলিলের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি নেওয়া খুব যে সহজ ছিল এমন বলা যায় না। নথিপত্র দেখার জন্য সরকারি অনুমোদন নিতে একজন গবেষককে দৃঢ়ভাবে তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হত। আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা লিখতে পারি।

ব্রজেন্দ্রনাথ জুন, ১৯২৬ সালে বাংলা সরকারের কিপার অভ রেকর্ডস-এর কাছে কোম্পানি আমলের 'কমিটি অভ সার্কিট'-এর কাগজপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে ভোলেননি যদি তাঁকে তাঁর প্রস্তাবিত কাগজপত্র দেখতে দেওয়া হয় তাহলে তাঁর গবেষণার বিষয় নতুনভাবে আলোকিত হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক যা লিখেছেন : '. They would throw a flood of light on the study of my subject.'[৫]

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের ওই আবেদনপত্র ঐতিহাসিক শাখার ভারপ্রাপ্ত সহায়কের চোখে অসম্পূর্ণ ছিল। কেন-না ব্রজেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট করে তাঁর গবেষণার বিষয় উল্লেখ করেননি। এবং তিনি যে প্রকৃত গবেষক এমন কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি। এই ভারপ্রাপ্ত সহায়ক ব্রজেন্দ্রনাথকে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৬]

'রেকর্ডরুম' সহায়কের ওই প্রস্তাব তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মানতে পারেননি। ওই প্রস্তাব অংশত নাকচ করে তিনি লিখলেন : (১) ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাসের গবেষক, (২) ১৯২৪ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক নথি পর্ষদে 'বেগম সমরু' বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেছেন, (৩) ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুমে তাঁর গবেষণা করার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন করে প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই। ব্রজেন্দ্রনাথকে অবশ্য তাঁর গবেষণার বিষয় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।[৭] ওই চিঠির উত্তরে ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে জুলাই ৭-এ জানিয়েছিলেন তাঁর গবেষণার বিষয় হল : (১) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (২) মুন্নি বেগম (নবাব মিরজাফরের বেগম)। এই চিঠিতে ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে জানিয়েছিলেন : (১) তিনি আচার্য যদুনাথ সরকারের অধীনে তাঁর গবেষণা-কাজ করতেন এবং (২) ভারত সরকারের অপ্রকাশিত নথিপত্রের সাহায্যে ইতিমধ্যে তিনি 'বেগম সমরু' ও 'ইংল্যান্ডে রাজা রামমোহন রায়ের দৌত্য' নিয়ে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[৮] রেকর্ডরুম থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে সরকারি নথিপত্র দেখার অনুমতি দিয়ে জুলাই ১২, ১৯২৬-এ লেখা হয়, '...to supply to the Govt. free of cost a copy of any book or article you may write on the subject.'[৯] সরকারি নথিপত্র নিয়ে গবেষণার অনেক শর্তের অন্যতম শর্ত ছিল এটি।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নিয়ে কমিটি অভ সার্কিটের নথিপত্র দেখার সময় ব্রজেন্দ্রনাথ বিচার বিভাগের দলিলপত্রে একই বিষয়ে আরও প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। স্বভাবতই উৎফুল্ল ব্রজেন্দ্রনাথ ওই সমস্ত নথিপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে

সরকারের কাছে আবার আবেদন করেন জুলাই ১৬, ১৯২৬-এ।[১০] এই চিঠিতেই ব্রজেন্দ্রনাথের রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়ে গবেষণার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ গবেষণার বিষয় হিসেবে আঠারো শতকের বাংলার নবাব পরিবারই শুধু পছন্দ করেননি। একই সঙ্গে তাঁর পছন্দের তালিকায় রামমোহন ভিন্ন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন। আগস্ট ২৫-এ ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে ১৭৭৫ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে যে আবেদন করেন সেখানে তিনি নতুন পুরোনো মিলিয়ে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেন।[১১] এই পাঁচটি বিষয় ছিল : ১) বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২) লুফ্-তু-ন্নিসা (সিরাজ-উদ্‌দৌলার বেগম), ৩) মুন্নি বেগম, ৪) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৫) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

আবার নতুনভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর তথ্য সন্ধানের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ ডিসেম্বর ২০, ১৯২৬-এ কিপারের কাছে জেনারেল ডিপার্টমেন্টের নথিপত্র দেখার অনুমতি চেয়ে লিখেছিলেন : '...I consider that a mass of information on the subject can be unearthed from the proceedings of the General Deptt.'[১২] এই একই সময়ে প্রাক বিদ্রোহ যুগের শিক্ষা বিভাগের নথিপত্র দেখা শেষ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ পরবর্তীকালের দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য এপ্রিল ৩, ১৮২৭ সালে কিপারের কাছে আবেদন করেছিলেন।[১৩] বিদ্যাসাগরকে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ অন্বেষা শুধুমাত্র শিক্ষা ও জেনারেল ডিপার্টমেন্টের নথিপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজস্ব পর্ষদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ওপর প্রযোজনীয় তথ্য, সংবাদ পাওয়া যেতে পারে অনুমান করে কিপারকে তিনি জুলাই ৪, ১৯২৭ সালে আবার আবেদন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর আবেদনপত্রে লিখেছিলেন : '...it is very likely that a mass information on the subject can be unearthed from them.'[১৩ক]

ওই চিঠির এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্য শিক্ষা বিভাগের প্রাক্ বিদ্রোহ ও বিদ্রোহোত্তর যুগের নথিপত্র দেখতে চেয়ে কিপারের কাছে আবেদন রাখেন। ১৯২৬—৩০ সালের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের উনিশ শতক চর্চার শেষ ব্যক্তিত্ব বোধকরি ভূদেব মুখোপাধ্যায়।[১৪]

উনিশ শতকের পরিচিত মানুষজনের বাইরের জগতেও ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোরাফেরা করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই সময়ে ভারতের সম্মোহন চর্চার ইতিহাস খুঁজতে মহাফেজখানার সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর ৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ 'History of Hypnotism in India' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আবেদন করেন। তিনি বিচার বিভাগের নথিপত্র দেখতে চেয়েছিলেন।[১৫] 'হিপনোটিজম'-এর সঙ্গে নাটোরের রানি ভবানীকে মেলানো যায় না। আবার মেলানো না গেলেও গবেষণা করতে অসুবিধে হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথেরও হয়নি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের ১৯-এ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে রানি ভবানীর জন্য রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র দেখার অনুমতি চান। এই আবেদন সম্বন্ধে কিপার অভ রেকর্ডস-এর কিঞ্চিৎ আপত্তি ছিল।[১৬]

ব্রজেন্দ্রনাথকে লেখা ডিসেম্বর ২০'র চিঠিতে কিপার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ কী শুধুমাত্র রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র দেখতে চান। কেন-না এই বিভাগ ভিন্ন প্রভিন্সিয়াল কমিটি অভ রেভিন্যু, রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার বিভাগের নথিতে রানি ভবানীর উপর প্রচুর তথ্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথকে কিপার সরাসরি জানিয়েছিলেন এই সংবাদ জানা তাঁর (কিপারের) পক্ষে জরুরি, কেন-না : '...necessary orders may be taken of the Department concerned.' ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর 'ভুল' সংশোধন করে পরের চিঠিতেই জানিয়েছিলেন যে তিনি রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত শাখা, পর্ষদের নথিপত্র দেখতে চান তাঁর প্রস্তাবিত প্রকাশনার জন্য।[১৭]

১৯২৬–৩০ সালের মধ্যে আমরা লিখতে পারি, একে একে রানি ভবানী, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আঠারো-উনিশ শতকের চর্চা শুরু করেন। উনিশ শতকের সমাজ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে কোম্পানি আমলের নথিপত্র যে আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন তাঁর সমস্ত আবেদনপত্রে। ব্রজেন্দ্রনাথের হাত ধরে আমাদের উনিশ শতক চর্চার শুরু।

২

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা লিখতে পারি ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার প্রথম গবেষক যিনি একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন এবং কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অনুমোদন পেতে অসুবিধে হয়নি। আমাদের মনে হতে পারে ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য রেকর্ডরুম সতত প্রস্তুত থাকত। এই সময়ের যে গবেষণা বিধি ছিল সেখানে এমন কোনো ধারা ছিল না যেখানে একজন গবেষক খুশিমতো তাঁর গবেষণার বিষয় পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করতে পারতেন, ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছিলেন মনে হয় কর্তৃপক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটু বেশি উদার ছিলেন। অন্য কোনো গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথের মতন এমন সুযোগ পেতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথ ভিন্ন আমরা অন্য কোনো গবেষককে পাইনি যিনি একই সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন সরকারি অনুমোদন নিয়ে। এখানেই শেষ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য শনিবারে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের সময়সীমাও পালটানো হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ২৩ জুলাই রাজনৈতিক দপ্তরের এক বিভাগীয় নির্দেশে রেকর্ডরুম আধিকারিককে জানানো হয় যে প্রতি শনিবার গবেষণাকক্ষ শুধু ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বেলা ১-৩০-র পর গবেষণাকক্ষে উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় পিয়োন ও নথি সরবরাহকারীরা এই সময়ে উপস্থিত থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করবেন। ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু ওই একদিনই, শনিবার, কেবল রেকর্ডরুমে আসবেন।[১৮] ব্রজেন্দ্রনাথের জন্য এই বিশেষ

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অনুরোধে। তিনি স্বয়ং মহাকরণে উপস্থিত থেকে রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিবের কাছে এই ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন।[১৯]

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ কেন ওই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার পড়েছিল? আমাদের হাতে যে তথ্য আছে সেখান থেকে বলা যায় এই সময় অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষে ব্রজেন্দ্রনাথ এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে রেকর্ডরুমে উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। শনিবার ১-৩০ মিনিটের সময় ওই প্রতিষ্ঠানের ছুটি হত এবং ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর ক্লাইভ স্ট্রিটের দপ্তর থেকে মহাকরণে আসতেন। জুন থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠির ঠিকানায় ৪৮/২/২ বলরাম দে স্ট্রিট লেখা থাকত। জুলাই ২২, ১৯২৬ সাল থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের নতুন ঠিকানা হল ১ ক্লাইভ স্ট্রিট। কখনও লেখা থাকত : 'টি ডিপার্টমেন্ট' ১ ক্লাইভ স্ট্রিট। ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মস্থল যে ক্লাইভ স্ট্রিটের 'টি ডিপার্টমেন্ট' ছিল এটা তার প্রমাণ।

১৯২৮ সালের আগস্টে সরকারের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার জন্য নতুন গবেষণাবিধি গ্রহণ করা হলে ব্রজেন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯২৮ সালে সরকারকে তাঁর ক্ষেত্রে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারেব সময়সীমা শিথিল করার অনুরোধ করে যে চিঠি লেখেন সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বর্তমানে এক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, ফলে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর পক্ষে 'রেকর্ড অফিস'-এ উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২৮ সালের গবেষণা বিধির ধারা ৪এ বলা হযেছিল শনিবার ভিন্ন গবেষণাকক্ষে হাজিরার সময় ১১টা থেকে ৪-৩০ শনিবারে ওই সময় ১১-৩০ থেকে ১-৩০ পর্যন্ত।

ব্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁকে ইতিপূর্বে বেলা ১-৩০ মিনিট থেকে ৪-৩০ পর্যন্ত গবেষণাকক্ষে নথিপত্র দেখার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথকে আবার এই বিশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য এবার রাজনৈতিক দপ্তরে সওয়াল করেন ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের অন্যতম সদস্য ড. র‍্যামসবোথাম।[২০]

ব্রজেন্দ্রনাথের আবেদনের উপর সদর্থক সিদ্ধান্ত নেওযা হয়। বিভাগীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : '...In view of the strong recommendation from the Hony. Advisor which supports the previous orders of Mr. S. N. Roy, I. C. S. Brojen Babu has been asked to continue his work... he may be given general permission he... asked for.'[২১]

প্রথমে আচার্য যদুনাথ সরকার পরে আর. বি. র‍্যামসবোথামের অনুরোধে ব্রজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মবিধি শিথিল করে মহাফেজখানা ব্যতিক্রমী নজির তৈরি করলেও তা বিফলে যায়নি।

১৯২৬ সালে আঠারো-উনিশ শতক নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ যে গবেষণা শুরু করেছিলেন ১৯৩৪ সালেও তা শেষ হয়নি। সময়ের অভাবে কোনও কাজ দীর্ঘায়িত করতে

হয়েছিল, আমি লিখেছি সে-কথা। ব্রজেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল নানা মাত্রার, ফলে তাঁকে একই সঙ্গে একাধিক বিভাগের নথিপত্র দেখতে হয়েছিল। আঠারো-উনিশ শতকের সব বিষয়ই বোধকরি তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছিল।

১৯৩৪ সালের জুলাইতে ব্রজেন্দ্রনাথ কিপারকে এক চিঠি দিয়ে জানান যে তিনি প্রাক্ বিদ্রোহ যুগের শিক্ষা ও জেনারেল কমিটির কাগজপত্র দেখতে চান কেন-না : '...They are likely to contain a good information on the worthies of the early 19th Century—a subject with which I am interested...' **অর্থাৎ এবার ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার বিষয় হল 'শিক্ষা : উনিশ শতক—সূচনা পর্ব'।**[২২]

সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত আঠারো-উনিশ শতকের রাজস্ব দপ্তর, রাজস্ব পর্ষদ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের মুখ্য ও গৌণ শাখার নথিপত্র নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ওপর একাধিক নিবন্ধ রচনা করে *ক্যালকাটা রিভিউ, প্রবাসী*-তে প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে এই সমস্ত প্রকাশিত রচনার অনুলিপি চেয়ে পাঠানো হয়, ব্রজেন্দ্রনাথ ওই সমস্ত 'অনুলিপি' রেকর্ডরুমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[২২ক]

৩

ব্রজেন্দ্রনাথের সময় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক মহাফেজখানা বা ঐতিহাসিক নথিকক্ষে রক্ষিত সরকারি তথ্য নিয়ে তাঁদের গবেষণা শুরু করেন। বিষয় হিসাবে উনিশ শতকই—তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল।

ওই গবেষকদের একজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ড. জে. সি. সিনহা। আগস্ট ৩০, ১৯২৮ সালে ড. জে. সি. সিনহা কিপারকে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র বা 'অ্যাডমিশন কার্ড'-এর জন্য লিখেছিলেন '..kindly issue an 'Admission card' to me permitting me access to your records.' উল্লেখ্য ১৯২৮ সা. গবেষণাকক্ষের জন্য নতুন গবেষণাবিধি গ্রহণ করার অনেক আগেই বিশেষ অনুমতি নিয়েই ড. সিনহা তাঁর *Economic Annals of Bengal*-এর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ড. সিনহা 'বোর্ড অভ ট্রেড কমার্শিয়াল' ও অন্যান্য বাণিজ্যিক শাখার দলিল দস্তাবেজ (১৭৭৬-১৮১৪) দেখেছিলেন। ড. সিনহা সম্বন্ধে রেকর্ডরুম সহায়কের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : 'ড. সিনহা একজন খ্যাতিমান গবেষক...কয়েক বছর আগে তিনি গবেষণাকক্ষে কাজ করেছেন।...তাঁর কাজের ফলশ্রুতি হল, *Economic Annals of Bengal*'[২৩] এই সময় রামমোহন সংক্রান্ত কিছু তথ্য চেয়ে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী যে আবেদন করেন তাতেও সাড়া দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য তাঁকে কোশাগারে দু টাকা চার আনা জমা দিতে হয়। ১৯৩০ সালে যে সমস্ত বিশিষ্ট গবেষককে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় গবেষণা করতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল, ড. ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

১৯৩৫ সালের জুনে যোগেশচন্দ্র বাগলকে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হলেও, কিছুদিন কাজ করার পর যোগেশচন্দ্র এখানে আসা বন্ধ করে দেন। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে যোগেশচন্দ্র আবার তাঁর গবেষণা শুরু করেন। এই সময় যোগেশচন্দ্রের বিষয় ছিল : 'উনিশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা—সূচনা কাল'।[২৪]

আগস্ট ২৮, ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিষয়ে গবেষণার জন্য পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর নথিপত্র দেখার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। প্রথম আবেদনপত্রে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় উল্লেখ করেননি, পরে জানান যে তাঁর গবেষণার বিষয় 'কলকাতা' হলেও বর্তমানে তিনি 'গোকুলচন্দ্র মিত্র' ও 'মদনমোহন' বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন। পূর্ণচন্দ্রের আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।[২৫] পূর্ণচন্দ্রকে অনুমোদন দেওয়ার সময় তাঁর সম্বন্ধে সরকারিভাবে জানানো হয় : 'The applicant is a bonafide research scholar ..' পুরোনো কলকাতা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্রের গবেষণা বিষয়ে সরকার অবহিত ছিল।[২৬]

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী ড. জে. কে. মজুমদার রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য অক্টোবর ১৯৩৫-এ সরকারের কাছে যে আবেদন করেন সেখানেও শ্যামাপ্রসাদের সুপারিশ ছিল। কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণকুমার মিত্র ও জে. কে. মজুমদারের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।[২৭]

কৃষ্ণকুমার বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম সচিব এস. এন. রায়কে জানিয়েছিলেন কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে জে. কে. মজুমদারকে রামমোহন সম্পর্কিত অপ্রকাশিত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই কাজে মজুমদারকে যেন সমস্ত রকম সাহায্য করা হয়। এস. এন. রায়কে কৃষ্ণকুমার ঠিক যা লিখেছিলেন '..I hope you would be enough kind to render Dr. Mazumder all necessary help.'[২৮]

রামমোহন নিয়ে নির্বাচিত তথ্য সংকলনের পর ড. মজুমদার কাজ শুরু করেন ভারতের সংবিধানের ওপর। মূল বিষয়টি ছিল '...India's Constitutional Development' এই তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আবেদন করেন মে ১৩, ১৯৩৭-এ।[২৯] সাংবিধানিক ইতিহাসের ওপর তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ড. মজুমদারের রামমোহন চর্চায় ছেদ পড়েনি। সরকারের কাছে এ বিষয়ে সংবাদ ছিল। সুতরাং মে ২১, ১৯৩৮-এ রামমোহনের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার জন্য ড. মজুমদারের আবেদন সরকারি অনুমোদন পেয়েছিল যথারীতি। সরকারি নথি থেকে জানা যায় অক্টোবর ১১, ১৯৩৮-এ ড. মজুমদার তাঁর প্রকাশিত '...Selection from official letters & documents relating to the life of Raja Rammohan Roy (Vol.I)...' কিপারকে সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।[৩০]

অক্টোবর ১৯৩৫ ও ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিডার ড. ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় কিপার অভ রেকর্ডস-এর কাছে

আবেদন করেন দুটি বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহের জন্য। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল (১) Economic History of Bengal under British rule... ও (২) Constitutional and Economic History of Bengal under British rule.'[৩১]

প্রথমটি ছিল ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গবেষণামূলক নিবন্ধের শিরোনাম। এই নিবন্ধের জন্য তিনি শুধুমাত্র ১৭৭১ সালের কন্ট্রোলিং কমিটি অভ রেভিন্যু'র কাগজপত্র দেখেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েক মাস এখানে কাজ করেছিলেন। কেন-না ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন করার (১৪ মার্চ ১৯৩৫) কয়েক মাস পর অক্টোবর ৩০, ১৯৩৫ তারিখে তাঁর তথ্যাদি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৩২]

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে তাঁর তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন মার্চ ১৯৩৬ সাল থেকে। আবেদনপত্রে তিনি লিখতে ভোলেননি '...This may be treated as urgent.'[৩৩]

যা হোক সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি বাংলা বিহারের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তার প্রকাশক ছিল লংম্যানস গ্রিন অ্যান্ড কোং'র মতো সংস্থা। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে এই সংস্থার পক্ষ থেকে কিপারকে সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো হয়েছিল।

শুধু মৌলিক গবেষণার জন্য নয়, অন্যদিকে বৌদ্ধিক প্রয়োজনে এই সরকারি রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা সতত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দিকে। আমরা হুগলি কলেজের কথা লিখতে পারি। ১৯৩৬-এ এই কলেজের প্রস্তাবিত শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলেজ অধ্যক্ষ কে. জ্যাকেরিয়ার এপ্রিলের আবেদনে সাড়া দিতে 'রেকর্ডরুম' কর্তৃপক্ষের দেরি হয়নি।[৩৪]

মহাফেজখানার সাধারণ কর্মীদের সাহায্যে, জ্যাকেরিয়ার তথ্য সংগ্রহে কোনো অসুবিধে হয়নি যা তিনি জানিয়েছিলেন কিপারকে। দু-খণ্ডে লেখা হুগলি কলেজের ইতিহাসও রেকর্ডরুমে সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু নিরাপত্তার কথা মনে রেখে জ্যাকেরিয়ার প্রস্তাবিত হুগলি কলেজ প্রদর্শনীতে সরকার মূল নথি পাঠাতে রাজি হয়নি। মূল নথির পরিবর্তে জ্যাকেরিয়াকে নির্বাচিত তথ্যের 'ফোটোস্টাট কপি' দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। সরকারি নিয়মনীতি মেনে দ্বিধাহীনভাবে তথ্য সরবরাহ ও নথিপত্রের স্বার্থের কথা মনে রেখে প্রয়োজনে কঠোর হওয়া স্বাভাবিক কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টতা প্রমাণ করেছিল।[৩৪ক]

বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সংগতি না থাকলেও অন্য এক অভিনব আবেদনের কথা লিখব। আগস্ট ১, ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুরের জেলাশাসক বি. আর. সেন বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিবকে এক চিঠিতে অনুরোধ করে লিখেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে যে মহাফেজখানায় রক্ষিত ১৮৬৭ সাল-উত্তর *কলকাতা গেজেট* দেখতে দেওয়া হয়, এঁদের গবেষণার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ। স্বরাষ্ট্র উপসচিবকে জেলাশাসক সরাসরি লিখেছিলেন '...I should be grateful if you would help these two scholars with every facilities

to consult these documents... I am particularly interested in them.'[৩৫]

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন মহাফেজখানার পুরোনো গবেষক, তিনি এখানকার নিয়মনীতি জানতেন, অন্যদিকে সজনীকান্ত মহাফেজখানায় আগে না এলেও আমরা অনুমান করতে পারি তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কথা জানতেন। আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে মেদিনীপুরে জেলাশাসক কেন এই দুই গবেষকদের পক্ষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আবেদন করেছিলেন। এই দুজন গবেষক যে বি. আর. সেনকে এমনতরো অনুরোধ করেছিলেন সেই তথ্য আমাদের হাতে নেই। শেষ পর্যন্ত সজনীকান্ত বা ব্রজেন্দ্রনাথ কেউই অবশ্য মহাফেজখানায় এসে *কলকাতা গেজেট* দেখেননি বা জেলাশাসক আর মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।[৩৬]

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি এক অভিনব সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। শুরুতে যে প্রতিষ্ঠানের দায় ছিল প্রত্যয়িত প্রতিলিপি বিতরণ পরে সেই প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠল অতীতচর্চার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার গবেষক, অপেশাদার অতীত সন্ধানী বা উৎসাহী সরকারি আমলা এই মহাফেজখানার অদেখা অচেনা নথিপত্র নিয়ে তাঁদের বিমূর্ত চিন্তাভাবনাকে যথার্থ রূপ দিতেন। অর্থাৎ শুরুতে যা থাকত কল্পনার বিষয় মহাফেজখানার সিন্দুক খুলে মণিমাণিক্য নিয়ে সেই কল্পনাকে বাস্তবের মাটিতে আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এভাবেই মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমের গুরুত্ব বা ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় গবেষকদের হাতে। এক সরকারি অনুসন্ধানের ফলে আমরা জেনেছি ১৮৩৫ সাল থেকে জুন ১৮৩৮ পর্যন্ত বাংলা সচিবালয়ের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য মোট ২৫ জন গবেষক তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেন। এবং উনিশ শতকই ছিল তাঁদের গবেষণার বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আমরা পাই কলকাতা, বাংলা প্রশাসন (১৮১৩–১৮৫৮), বাংলা, বিহার ও ওড়িশা'র ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বাংলার সামাজিক রীতিনীতি : ধর্ম, শিশুপুত্র উৎসর্গ, পুরোনো বাংলার শিক্ষা, সমাজ, কৃষিব্যবস্থা, ইডেন গার্ডেনস ও ক্রিকেট ক্লাব, রথযাত্রা ইত্যাদি। 'রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর পরিবার' দুজন গবেষকের বিষয় ছিল।[৩৭]

ওই তালিকা থেকে বোঝা যায় বিষয় হিসেবে গবেষকদের পছন্দ ছিল উনিশ শতকের সমাজ অর্থনীতির বিভিন্ন ধারা। আগেই লিখেছি সচিবালয়ের রেকর্ডরুম থেকে উনিশ শতক চর্চা শুরু, সময় : ১৯২০'র মধ্যবর্তী সময়, আর শুরু করেন ব্রজেন্দ্রনাথ। অনেক বছর আগে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই লোকের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে সমুদ্রের ধূম্রজালে চাপা পড়ে যেত, প্রকৃত ঘটনা পিছনে পড়ে যেত কল্পকথার আধিপত্যে। সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে প্রকৃত ঘটনা, ঠিক তথ্য জানার পর বোঝা যায় আমাদের কল্পনার মানুষটা ঠিক কী ছিলেন। এবং এই ইতিহাস জানার কাজ শুরু হয় এই সরকারি কক্ষ থেকে।

যুদ্ধের কারণে ১৯৪৪-এ কলকাতা থেকে বহরমপুরে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা স্থানান্তরিত হয়। রাজনৈতিক ও দূরত্বের কারণে গবেষকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এ

সময়। অবশ্য বহরমপুরের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা এসময় মহাফেজখানায় নিয়মিত আসতেন এমন প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। অন্যদিকে বহরমপুরের বাইরের গবেষকরা এই দপ্তরে তথ্য চেয়ে আবেদন করতেন।

ফাইল রেজিস্টার থেকে জানা যায় ১৯৪৬ সালে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহাকে বহরমপুরে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। ফাইল রেজিস্টারে যা লেখা আছে '...Dr. Sinha has been permitted to consult old records under rules & regulations ' ড. সিনহার গবেষণার বিষয় ছিল আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। এই বহরমপুরে দুজন পুরোনো গবেষক সরকারি নথি চেয়ে আবেদন করেন। এঁদের একজন অধ্যাপক ড. ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায অন্যজন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী জে. কে. মজুমদার। এঁরা যথাক্রমে (১) 'ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অভ্যন্তরীণ নীতি' ও (২) জগদীশচন্দ্র বসু সংক্রান্ত নথিপত্র দেখতে চেয়েছিলেন। এই সময় এই মহাফেজখানায নিয়মিত আসতেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী। অধ্যাপক বাগচীর গবেষণার বিষয় ছিল 'ইকোনমিক আইডিয়াস অভ ফিলিপ ফ্রান্সিস'।[৩৮]

৪

মহিলা গবেষক

স্বাভাবিক কারণে আমাদের মনে এসময়ের মহিলা গবেষকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। নারী শিক্ষায় সঠিক অগ্রগতির কথা মনে রাখলে এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি হয় না। আমাদের হাতে যে তথ্য আছে সেখান থেকে বলা চলে বাঙালি মহিলা গবেষকদের মধ্যে মহাফেজখানায় প্রথম আসেন অধ্যাপিকা নীহারকণা মজুমদার। পরে আসেন শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু—একজন স্কুল শিক্ষিকা। মহিলাদের মধ্যে অবশ্য সরকারি নথিপত্র নিয়ে গবেষণার জন্য প্রথম আবেদন করেছিলেন 'ইয়ং উইমেনস খ্রিস্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য মিস এডেন জিন চ্যাম্পিযন। এই তিনজন মহিলা গবেষক সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

মিস এডেন জিন চ্যাম্পিয়ন ১৯৪০ সালের অক্টোবর ২৫-এ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুমে নথিপত্র দেখার জন্য যে আবেদন করেন তার প্রেক্ষিতে তাঁকে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্র মঞ্জুর করা হয় নভেম্বর ৫, ১৯৪০ সালে। তাঁর গবেষণার বিষয ছিল 'উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন,' মিস চ্যাম্পিয়নের জন্য সুপারিশ করেছিলেন সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা স্বয়ং। মিস চ্যাম্পিয়ন অবশ্য তাঁর গবেষণা শুরু করেছিলেন কি না সে তথ্য আমাদের হাতে নেই—কিন্তু তিনি যে মহাফেজখানায় এসে শেষ পর্যন্ত তাঁর গবেষণাকক্ষ-ব্যবহারপত্র বা স্টুডেন্টস টিকিট সংগ্রহ করেননি সে তথ্য আমাদের হাতে আছে।[৩৯]

নীহারকণা ১৯৪৮ সালে বহরমপুর মহাফেজখানায় তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করেন।[৪০] এই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলা দেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা :

১৭৯৩-১৮১২'। বিষয় পালটিয়ে যে ১৯৫১ যখন অধ্যাপিকা মজুমদার নতুন বিষয় নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু করেন তখন তাঁর গবেষণার বিষয় হল 'বাংলা দেশে নিজামত যুগ'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় অধ্যাপিকা মজুমদার ডিসেম্বর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। এরপর নীহারকণা সম্পর্কিত নথিটি 'ক্লোজ' করে দেওয়া হয়।[৪১]

শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসুর কথা লেখা যায়। বহরমপুর কাশীশ্বরী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পুষ্পময়ী বাংলা দেশে শিক্ষার ইতিহাস বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে গবেষণার জন্য বহরমপুর মহাফেজখানায় কিপারের কাছে আবেদন করেছিলেন ফেব্রুয়ারি ৭, ১৯৪৯ সালে। পুষ্পময়ী গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র ব্যবহার করেননি।[৪২] সুতরাং তাঁকে গবেষকদের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলে পুষ্পময়ী নতুন করে আবেদন করেন। তাঁর জন্য সুপারিশ করেন বহরমপুরের স্কুল পরিদর্শক এ. ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য গবেষক ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসময় সুপারিশ করতে পারতেন শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত উচ্চ পদের আধিকারিকরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা অধিকর্তা (ডি. পি. আই) ও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রমুখ।

একজন স্কুল পরিদর্শক কোনো গবেষকের আবেদনপত্রে সুপারিশ করতে পারেন কিনা বা করলেও তা গ্রহণ করা হবে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর শ্রীমতী বসুর আবেদন মঞ্জুর করা হয় 'স্পেশাল কেস' হিসাবে। শ্রীমতী বসুর আগে এমনভাবে প্রচলিত প্রথা হ্রাস করে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (১) অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী ও (২) শ্রীমতী নীহারকণা মজুমদারকে। অধ্যাপক বাগচী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশ নিয়ে আবেদন করেছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সরকারি ছিল না। সুতরাং এই কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশ গবেষকদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হত না। কিন্তু যেহেতু নির্মাল্য বাগচী আসাম বাংলার আঞ্চলিক নথিপর্ষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একসময়, সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের প্রচলিত নিয়ম হ্রাস করা হয়েছিল। অন্যদিকে শ্রীমতী মজুমদারকে নিয়ম হ্রাস করে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যেহেতু 'She was a lady scholar'[৪৩] এবং এই দুটি উদাহরণ সামনে রেখে পুষ্পময়ীকে বহরমপুর গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দিতে সরকারের অসুবিধে হয়নি।

পুষ্পময়ীকে ওই বিশেষ অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহ-সচিবের যুক্তি উল্লেখ করতে পারি। সহসচিব লিখেছিলেন যে শ্রীমতী বসুর পক্ষে বহরমপুর থেকে (১) উপাচার্য বা ডি. পি. আই. সুপারিশ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এবং (২) এই নিয়ম যখন গ্রহণ করা হয়েছিল তখন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। সুতরাং পরিবর্তিত ও অনিবার্য পরিস্থিতিতে শ্রীমতী বসুকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, প্রাক্ সিপাহি বিদ্রোহ যুগের নথিপত্র দেখার জন্য।

পুষ্পময়ী অবশ্য অল্পদিন বহরমপুর মহাফেজখানায় কাজ করেছিলেন। হঠাৎই তিনি এখানে আসা বন্ধ করে দিলে এখানকার এক সহকারী তাঁর সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন

'...তিনি গবেষণায় উৎসাহী নন...তিনি বহরমপুর ছেড়ে চলে গিয়েছেন...অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নথিটি ধরে রাখা যাবে না।'[৪৪]

ফলত শ্রীমতী বসু'র মহাফেজখানায় আসা বন্ধ হলে নথিটি নিয়ম অনুযায়ী 'ক্লোজ' করে বারো বছরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। এবং এই সময় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয় : '...This is an instance of how office is harrased with undue labour for such research scholars.'[৪৫]

৫

উপযুক্ত তথ্যাবলি থেকে আমাদের পক্ষে এই সিন্ধান্তে আসা সম্ভব যে রাজ্য মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম ধীর অথচ নির্দিষ্ট সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠছিল এই সময়ে। রেকর্ডরুম আপাত অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও এই অন্ধকার থেকেই 'উৎসারিত' আলোর জন্য দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা মহাফেজখানামুখী হয়েছিলেন।

১৯৫০-এর দশকে রাজ্য মহাফেজখানা বা 'রেকর্ডরুম'-এ রক্ষিত নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য যাঁরা নাম নথিবন্ধ করেন তাঁদের মধ্যে এসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের প্রথিতযশা শিক্ষক ও পরবর্তীকালের সাড়াজাগানো সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিকরা ছিলেন। এঁদের মধ্যে পাই অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী (১৯৫০), অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন (১৯৫২), চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক রণজিৎ গুহ (১৯৫২), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত (১৯৫৫), শশীভূষণ চৌধুরী (১৯৫৬), এ ডব্লিউ মামুদ (১৯৫৬)। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী তপনমোহন চ্যাটার্জীও এসময় মহাফেজখানার নথিপত্র দেখার জন্য নাম নথিবন্ধ করেন। ১৯৬০-এ যাঁরা নাম নথিবন্ধ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অনিল শীল ও বিদেশি গবেষকদের মধ্যে পাই ব্রেয়ার বি. ক্লিং, জন. এইচ. ব্রুমফিল্ড ও মিসেস জেনিকার ব্রুমফিল্ডকে। আর এই গবেষকদের সঙ্গো সতত দেদীপ্যমান ছিলেন ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ।[৪৬]

বর্তমান গ্রন্থে ওই সমস্ত শিক্ষক-গবেষকদের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই বা সম্ভব নয়। এক সরকারি নথি সংগ্রহালয় ওই বিখ্যাত গবেষকদের কীভাবে নিয়েছিল বা তাঁরা কীভাবে সরকারি নথিতে প্রতিভাত হয়েছিলেন সে অজানা তথ্যের উপর নজর দেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনি পরিচিত ইতিহাসের উপাদান নয়, কিন্তু মহাফেজখানার অদেখা ছবি। আমরা কয়েকজনের কথা লিখব। শুরু করা যেতে পারে অধ্যাপক-গবেষক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে।

যুদ্ধের কারণে মহাফেজখানার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র (১৮৫৮ পর্যন্ত) ১৯৫১ সালে বহরমপুরে ছিল। ফলত আঠারো শতক উনিশ শতকের উপর গবেষণার জন্য এসময় গবেষকদের বহরমপুরে যেতে হত যা খুব সহজ ছিল না। যদি তথ্য সংগ্রহের কাজ

দীর্ঘ হত তাহলে সেই সমস্যা জটিল হয়ে উঠত। ১৯৫১ সালে নরেন্দ্রকৃষ্ণকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হলেও সরকারি আনুকূল্যে সেই সমস্যা মিটেও গিয়েছিল। নরেন্দ্রকৃষ্ণের গবেষণার বিষয় ছিল : আঠারো শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস।[৪৭]

১৯৫১'র শুরুতে নরেন্দ্রকৃষ্ণ বহরমপুরে 'কিপার অভ রেকর্ডস'কে অনুরোধ করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর জন্য 'বোর্ড অভ ট্রেড'-এর নথিপত্র, সংখ্যায় ২০০টি খণ্ড, কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয়, কেন-না দীর্ঘদিন বহরমপুরে থেকে তাঁর পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না। কিপারকে তিনি সরাসরি লিখেছিলেন : In consideration of inability to stay for a long period at Berhampur, I hope, you will kindly make these records available to me at Calcutta. এ প্রস্তাব কিপারের পক্ষে রাখা সম্ভব ছিল না। অবশ্য সরকার অন্যভাবে নরেন্দ্রকৃষ্ণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল।[৪৮]

ওই সময় নরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর আর এক চিঠিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপ-সচিবকে অনুরোধ করে লিখেছিলেন যে বহরমপুরের মহাফেজখানায় কাজ শুরুর আগে যেন যথাযথভাবে তাঁর নির্বাচিত নথিপত্রগুলি পরিচ্ছন্ন করে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মাদ্রাজ রেকর্ড অফিসে তথ্য সংগ্রহের সুখকর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে উপসচিবকে তিনি লিখেছিলেন 'আমি আশা করি কিপার অনুগ্রহ করে যেন দেখেন আমার সময় অকারণে নষ্ট না হয়।' আমরা অনুমান করতে পারি বহরমপুরে নরেন্দ্রকৃষ্ণের তথ্য সংগ্রহে কোনও অসুবিধা হয়নি। তথ্য সংগ্রহ ভিন্ন বহরমপুরে নরেন্দ্রকৃষ্ণের সমস্যা ছিল (১) থাকা ও (২) অজস্র নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুতের। সরকারি স্তরে সমস্যা দুটি সমাধানও করা হয়েছিল। বহরমপুরে নরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্য 'ডাকবাংলো' সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিতে মহাকরণ থেকে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসককে লেখা হয়েছিল। ওখানে তাঁর থাকার সমস্যা মিটেছিল। আবার তাঁর নির্বাচিত তথ্যের অনুলিপি প্রস্তুতের জন্য সরকার থেকে একজন অস্থায়ী টাইপিস্ট নিয়োগ করা হয়েছিল। নরেন্দ্রকৃষ্ণের গবেষণার কাজে মহাফেজখানার পক্ষ থেকে সমস্ত প্রকার সাহায্য করা হয়েছিল।[৪৯] আঞ্চলিক নথিপত্রের সচিব হিসেবে নরেন্দ্রকৃষ্ণ এমন সাহায্য পেয়েছিলেন।

এই আলোচনা শেষ করব এই সময়ের তিন বিশিষ্ট গবেষকের কথা লিখে। ওই তিনজন গবেষক অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী ও কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী তপনমোহন চ্যাটার্জী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ১৯৫২'র ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন দ্য নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' বিষয়ে গবেষণার জন্যে যে আবেদন করেছিলেন সেখানে কারোর সুপারিশ ছিল না। এই সুপারিশ করতে পারতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা বা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ।[৫০]

সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও প্রিয়রঞ্জনের মহাফেজখানা ব্যবহারের অনুমতি পেতে

অসুবিধে হয়নি। প্রশাসনিক স্তরে তাঁর সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল : তিনি সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, গবেষক হিসেবে তাঁকে নিয়ে সন্দেহ করা যায় না ইত্যাদি। আমরা লিখতে পারি ঔপনিবেশিক যুগে সুপারিশহীন এমন আবেদনপত্র বাতিল করা হত।

শশীভূষণ চৌধুরীর কথা লেখা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের এই শিক্ষক কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশসহ মহাফেজখানায় আবেদন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা। ১৮৫৭–১৮৫৯। এই বিষয় নিয়ে শুরু হয় কিঞ্চিৎ বিপত্তি।[৫১]

মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ওই আবেদনপত্র দেখে লিখলেন : 'বহুব্যাপ্তি বিশিষ্ট' (comprehensive) বিষয় দেখে মনে হয় না তিনি কোন্ 'রেকর্ডস' দেখতে চান—ড. চৌধুরী নির্দিষ্ট করে লেখেননি তিনি কোন্ বিভাগের নথি দেখবেন। তাঁকে বলা যেতে পারে 'বাংলা দেশের কোন বিশেষ বিষয় তিনি দেখতে চান' ইত্যাদি।[৫২]

যা হোক তাঁকে অবশ্য কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি। অধ্যাপক চৌধুরী মহাকরণে এসে তাঁর গবেষণা বিষয়ের তথাকথিত ধোঁয়াশা দূর করে যান। সরকারি নথিতে লেখা আছে অধ্যাপক চৌধুরী ১৮৫৭–৫৯-এর বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও বিচার বিভাগের নথিতে এ বিষয়ে প্রভূত তথ্য আছে।[৫৩]

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন নেওয়ার পর ওই নথিটি পাঠানো হল বিচার বিভাগে। বিচার বিভাগের মূল্যায়নে লেখা আছে 'ওয়ান শশীভূষণ চৌধুরী...বাংলা সরকারের ডব্লিউ বি. ই. এস. (ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস)... তাঁকে বিচার বিভাগের নথি দেখার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে'।[৫৪]

'জনৈক' বা 'এক' শশীভূষণের পরিচয় দেওয়া হল প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রিসার্চ স্কলার' হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে নয়। প্রশাসনিক বক্তব্য বা 'নোট' নির্ভুল ছিল, কিন্তু এই নির্ভুল মূল্যায়নে আমরা কিছুটা বিস্মিত হই। ১৯৫৬তে অধ্যাপক চৌধুরীর পরিচয়, গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে, প্রশাসনিক মহলে অজানা ছিল না। এপ্রিল ১৯৫৬-তে অধ্যাপক চৌধুরীকে তাঁর মহাফেজখানায় ব্যবহারপত্র দেওয়া হয়।

মহাফেজখানায় ড. চৌধুরী কতদিন এসেছিলেন আমাদের জানা নেই। এপ্রিল ১৯৫৭ সালে এই নথিতে লেখা হল...'Dr. Chowdhury has not been doing any research work for the last few months. nothing is heard from him either. The file may be closed.'[৫৫]

১৯৫৭ সালে কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের বিখ্যাত আইনজীবী তপনমোহন চ্যাটার্জী মে ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন শিক্ষাসচিবের সুপারিশ নিয়ে মহাফেজখানায় আবেদন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ওল্ড ভার্নাকুলার ডকুমেন্টস'। মার্চ ১৯৫৭-তে নথিটি ক্লোজ করে দেওয়া হয় কেন-না নথিতেই লেখা আছে, গবেষক এখনও তাঁর প্রয়োজনীয় কাজ এই দপ্তরে শুরু করেননি।[৫৬]

তপনমোহন কোন্ কারণে মহাফেজখানায় আসতে পারেননি আমাদের জানা না

থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু লেখা যায় অতীত সন্ধানী এই মানুষটির মহাফেজখানার সঙ্গো সম্পর্ক ওই নথিতেই 'ক্লোজ' হয়ে যায়নি।

ওই আলোচনা দীর্ঘ করব না, শুধু দায়িত্ব নিয়ে লেখা যায় বহরমপুরে যাওয়ার যন্ত্রণার অবসান হলে ও পরে ভবানী দত্ত লেনে ১৯৬১-৬২ থেকে মহাফেজখানার ঐতিহাসিক শাখা গড়ে উঠলে এই মহাফেজখানা ঘিরে দেশ-বিদেশের গবেষকদের উৎসাহ এবং কৌতূহল বেড়েছিল : ভবানী দত্ত লেনের ঐতিহাসিক ও মহাকরণের চলতি শাখায় সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা নিত্য আসতে লাগলেন ইতিহাসের অজানা রহস্যভেদে অনিবার্য আকৃতি নিয়ে। আর গত শতাব্দীর শেষে মহাফেজখানার আরও একটি বাড়ি তৈরি হলে গবেষকদের সংখ্যা এবং সমস্যা দুই-ই বেড়ে গেল, সেটা অন্য ইতিহাস।

রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও ঐতিহাসিক নথিপর্ষদ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নথি সংগ্রহালয়গুলির দায়দায়িত্ব, সমাজবিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা, প্রকাশনা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দেশের আঞ্চলিক বিচারালয়গুলির নথিপত্র সংরক্ষণ, গবেষক ছাত্রদের এই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা মনে রেখে ১৯১৯ সালে গড়ে ওঠে সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদ।[১] এই প্রতিষ্ঠান ছিল মূলত দেশের বিভিন্ন নথি সংগ্রহালয়ের জন্য গঠিত 'কনসালটেটিভ বডি' সঠিক অর্থে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মঞ্চ।[২] শুরু থেকেই বাংলার এই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা এর সদস্য ছিল।

ঐতিহাসিক নথি পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে সিমলায়। নিয়ম করে এরপর প্রতি বছর অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন শহরে নথি পর্ষদের অধিবেশন বসত। সিমলায় আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল : (১) দেশের উচ্চন্যায়ালয়গুলির (হাইকোর্ট) নথিপত্রের অবস্থা পর্যালোচনা, (২) এই সমস্ত নথিপত্র কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার উপায় খোঁজা, (৩) জনসাধারণকে সরকারি নথিপত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে যথাযথ নিয়মনীতি প্রবর্তন, (৪) বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত নথিপত্রের 'হ্যান্ড বুক' তৈরি ও (৫) কলকাতায় কোম্পানি আইনে 'কুঠির দলিল' দস্তাবেজ (ফ্যাক্টরি রেকর্ডস) সুরক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।[৩]

সিমলা অধিবেশনের ওই সমস্ত বিষয়সূচি নিঃসন্দেহে 'রেকর্ডরুম' বা 'মহাফেজখানা'র সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্কযুক্ত ছিল। সিমলায় বোঝা গিয়েছিল, 'মহাফেজখানা'র সীমানা শুধু সরকারি নথিপত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর অচেনা দিগন্ত খুলে যাবে। জাতীয় সংগ্রহালয়ের নথিপত্র গবেষকদের ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য যথাযথ নিয়মনীতির খসড়া অনুমোদন করা হয় সিমলা অধিবেশনে।[৪]

১৯২৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পর্ষদের পঞ্চম অধিবেশন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে সরকারি 'রেকর্ডরুম'কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। ওই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় চুঁচুড়া জেলা আদালতে সংরক্ষিত নথিপত্র 'ইন্ডিয়া অফিস'-এ স্থানান্তরিত করা হবে। পরে অবশ্য ওই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র মাদ্রাজ সংগ্রহালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। এইসব নথিপত্রের মধ্যে ছিল : ১৩০ খণ্ডের ডাচ দিনেমারদের কাগজপত্র ও হুগলি জেলা শাসকের মহাফেজখানায় রক্ষিত ৩৪৯২টি ডাচ পাট্টা।[৫] কলকাতা সম্মেলনে বাংলা সরকারের আপত্তির জন্য শ্রীরামপুর

মহকুমা শাসকের দপ্তরে রক্ষিত ড্যানিশ কোম্পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এই সমস্ত নথিপত্র আঞ্চলিক রাজস্ব সংক্রান্ত উপাদানে সমৃদ্ধ।[৬]

ওই অধিবেশনেই কোম্পানি আমলের অন্যতম দুটি ন্যায়ালয় 'মেয়রস কোর্ট' ও 'সুপ্রিম কোর্ট'-এর দলিল দস্তাবেজের উন্নত সংরক্ষণ, বর্গীকবণ, বিন্যাস ও নির্ঘণ্ট তৈরির জন্য দীর্ঘ আলোচনা শেষে ভারত সরকারের মাধ্যমে কলকাতার প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও লোকাভাবের জন্য বিষয়গুলি নিয়ে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।[৭] পরে ১৯৪০ সালের কালে পর্ষদের একাধিক সম্মেলনে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছিল। এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করব না, সুযোগ নেই এখানে। ফি বছরে পর্ষদের সম্মেলন বসত, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সরকারের কিপার অভ রেকর্ডস এই সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন, তাঁর মতামত দিতেন, কলকাতা তথা বাংলা দেশ কেন্দ্রিক যে কোনো সিন্ধান্তে তাঁর মতামত গুরুত্ব পেত। পর্ষদে বেসরকারি, অ-পেশাদার ইতিহাস বা সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকরা মনোনীত সদস্য হতেন। আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে এই পর্ষদের অন্যতম বেসরকারি সদস্য মনোনীত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নথি পর্ষদকে বাংলা সরকার জানিয়েছিল যে এই পর্ষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ব্রজেন্দ্রনাথের আছে, যদিও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সরকারের অজানা।[৮]

অর্থনৈতিক কারণে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের কোনো অধিবেশন হতে পারেনি। ডিসেম্বর ১৯৩৭-এ লাহোরে দীর্ঘ ছ'বছর পর আবার অধিবেশন হল। ভারত সরকার মূল অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্য করলেও, প্রদর্শনীর জন্য কোনো আর্থিক অনুদান দেয়নি।[৯]

ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত হল নথিপর্ষদের পঞ্চদশ সম্মেলন। পাটনা সম্মেলনে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকদের সাহায্য নিয়ে, আঠারো শতকের রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের 'রেফারেন্স-মিডিয়া' বা 'ক্যালেন্ডারিং' তৈরির সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাটনা অধিবেশনে গৃহীত ওই সিন্ধান্ত ডিসেম্বর ২, ১৯৩৯-এ বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিয়ে ওই কাজে ইচ্ছুক গবেষক/অধ্যাপকদের নাম চাওয়া হয় যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে 'ক্যালেন্ডারিং অভ বেঙ্গাল রেকর্ডস'-এর কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন।[১০]

ওই চিঠির উত্তরে ১৯৪০ সালের গোড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপকের নাম স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই তিনজন অধ্যাপক ছিলেন ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিলচন্দ্র চক্রবর্তী। ওই কাজে এই তিন গবেষককে পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'রেকর্ডরুম' বা 'মহাফেজখানা'র অন্যতম পরামর্শদাতা কলকাতা ইসলামিক কলেজ (বর্তমানে মৌলানা

আজাদ কলেজ)-এর অধ্যক্ষ কে. জ্যাকেরিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল সরকার থেকে।[১১]

কে. জ্যাকেরিয়া 'রেকর্ডরুম' পরিদর্শনে এসে তদানীন্তন কিপার অভ রেকর্ডস ও সহকারী পরামর্শদাতা বিশিষ্ট গবেষক ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহার সঙ্গে প্রস্তাবিত 'রেফারেন্স মিডিয়া' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অধ্যাপক জ্যাকেরিয়া 'ক্যালেন্ডারিং'-এর পরিবর্তে 'কনসোলিডেটেড-ইনডেকস' বা একত্রিত নির্ঘণ্ট তৈরি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী ছিলেন গবেষকদের স্বার্থে। তাঁর যুক্তি ছিল (১) ক্যালেন্ডারিং তৈরিতে সময় লাগবে অনেক বেশি (২) গবেষকদের প্রয়োজন মিটবে না ও (৩) বর্তমান নির্ঘণ্টগুলি বহুলাংশে অসম্পূর্ণ।[১২]

জ্যাকেরিয়া ফলত ওই অসম্পূর্ণ নির্ঘণ্টের পরিবর্তে বিস্তারিতভাবে একত্রিত নির্ঘণ্ট বা প্রতিটি বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এই কাজে গবেষক ছাত্ররা উপকৃত হবেন। জ্যাকেরিয়ার যথার্থই মনে হয়েছিল ওই তিন গবেষক নির্ঘণ্ট তৈরির সময় যেভাবে নথিপত্র পড়ার সুযোগ পাবেন সেখানে তাঁরা খুঁজে পাবেন : '...the most fruitful lines for further work.'[১৩]

জুন ১৯৪০ সালে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৭৭১–১৮০০ পর্যন্ত রাজস্ব দপ্তরের একত্রিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা হবে ওই তিন গবেষকের সাহায্যে এবং এই কাজে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক পাবেন না। গবেষকরা নিজেদের সুবিধে মতন এই কাজের দিনক্ষণ ঠিক করে নেবেন। এবং জুলাই ১৯৪০ সাল থেকে এই কাজ শুরু হবে—এমনই ঠিক হয়েছিল।[১৪] শেষ পর্যন্ত ওই তিন গবেষকদের মধ্যে ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ড. গুপ্তর জায়গায় মনোনীত করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নির্মলচন্দ্র সিনহাকে, অধ্যাপক নিখিলচন্দ্র চক্রবর্তী ওই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হল কলকাতা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক গোপালচন্দ্র রায়চৌধুরীকে।[১৫] এই কাজে কাকে নিয়োগ করা হবে এবং কীভাবে গবেষকরা নির্ঘণ্ট তৈরি করবেন সব কিছুই ঠিক করেছিলেন রেকর্ডরুমের দুই পরামর্শদাতা অধ্যাপক কে. জ্যাকেরিয়া ও ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা।[১৬]

যে উচ্চাশা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপকদের সাহায্যে ওই কাজ শুরু হয়, এক বছর পর সেই কাজের মূল্যায়নে রেকর্ডরুম কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কোনো কাজই ওই তিন গবেষক নানান কারণে করতে পারেননি। ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মী তাঁর 'নোট'-এ বিনা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 'কার্যকরী' ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই কার্যকরী ব্যবস্থার অর্থ ছিল নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের জন্য উচ্চবর্গীয় সহকারী নিয়োগ—তাঁর প্রস্তাব অবশ্য কার্যকরী করার সুযোগ ছিল না ; যুদ্ধ ও কলকাতা থেকে বহরমপুরে সরকারি নথিপত্র স্থানান্তরণের অনিবার্যতা মিলে এই প্রকল্পটি ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছিল।[১৭]

২

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিটি রাজ্যের প্রতি নথিপর্ষদ সমানভাবে দায়বদ্ধ ছিল। কিন্তু কোনো রাজ্যের কোনো প্রাসাদে কী ধরনের নথিপত্র অবহেলা অযত্নে পড়ে আছে তা

জানা সম্ভব ছিল না। কেন-না তথ্য সংগ্রহের পরিকাঠামো ছিল না, অথচ ভারতের মতন বিরাট দেশের প্রতিটি অঞ্চলের রাজা, মহারাজা, ভূস্বামী পরিবারের হলুদ হয়ে যাওয়া দলিল দস্তাবেজে ছিল ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ—আচার্য যদুনাথের ভাষায় 'র-মেটিরিয়ালস',[১৮] খোঁজ পেলে এ সমস্ত উপাদান আমাদের ইতিহাসের জগৎটা পালটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কে বা কারা খুঁজবেন ইতিহাসের এই উপাদান? এমন প্রশ্ন উঠে এসেছিল স্বাভাবিক কারণে।

আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদ

১৯৪৩ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক নথি পরিষদের আলিগড় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা ও আসামের জন্য এক সদস্যের অস্থায়ী অনুসন্ধান পর্ষদ গঠিত হয় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে।[১৯] অল্পদিন পর এই পর্ষদ পনেরো জনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদে রূপান্তরিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার, সম্পাদক-আহ্বায়ক ছিলেন যথাক্রমে ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা ও রমেশচন্দ্র মজুমদার। পর্ষদ দপ্তরের ঠিকানা ছিল ৪৭ একডালিয়া রোড, কলকাতা ১৯।

আঞ্চলিক নথিপর্ষদকে দু-ধরনের কাজ করতে হয়েছিল (১) বেসরকারি নথিপত্রের সন্ধান (২) জেলা প্রশাসনের নথিপত্র পরিদর্শন। আঞ্চলিক নথিপর্ষদই আমাদের বে-সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে প্রথম খোঁজ দেয়। কোন জেলায় কোন রাজ পরিবারে কী ধরনের নথিপত্র রয়েছে এটা জানা সমাজ-ইতিহাসের পক্ষে জরুরি ছিল। নথিপর্ষদের খ্যাতিমান গবেষকরা এই কাজটি করেন।

অন্যদিকে মহাকরণে সচিবালয়ের দলিল দস্তাবেজ ছেড়ে জেলা প্রশাসনের স্বল্প পরিসর জগতে হানা দিয়ে পর্ষদের তথ্য অনুসন্ধানকারীরা যে তথ্যের খোঁজ পান তা সচিবালয়ের নথিপত্রের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পক্ষে এই সমস্ত তথ্য অস্বীকার করবেন কে? ফলত সচিবালয় ও জেলা প্রশাসনের দলিল দস্তাবেজ এক সঙ্গে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে আমাদের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার অর্ধ পরিচিত জগৎটা অন্যরকম হত।

পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে মে ২৬, ১৯৪৫ সালে। এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই অধিবেশন শেষ হয় পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে। গঠনমূলক কাজ করার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[২০]

বস্তুতপক্ষে ১৯৪৬ সাল থেকে জেলা মহাফেজখানার ও বেসরকারি নথিপত্রের সন্ধান নেওয়া শুরু হয়, পর্ষদের অনুসন্ধান পর্ব বৃথা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে পর্ষদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বেসরকারি নথির সন্ধান পেয়েছিল। সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

১৯৪৬ সালে পর্ষদের পক্ষ থেকে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের নথিপত্র পরিদর্শন করা হয়। কোম্পানি আমলের 'মেয়রস কোর্ট' (১৭৭৪) ও সুপ্রিম কোর্ট (১৭৭৪–১৭৯৯)-এর দলিল দস্তাবেজের মধ্যে বিখ্যাত আমীর চাঁদ (উমিচাঁদ)-এর

উইলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।[২১]

পর্ষদের সদস্যারা মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথিপত্রের সন্ধান পান। এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল পুত্র গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি ও নাটোরের রানি ভবানীর মহারাজা নন্দকুমারকে লেখা দীর্ঘ চিঠি—যেখানে তিনি নন্দকুমারকে ২৫১ বিঘার 'লাখেরাজ ভূমি' দানের কথা লিখেছিলেন।[২২]

বহরমপুরে সরকারি মহাফেজখানায় পর্ষদের পরিদর্শকেরা যে সমস্ত দলিলপত্রের খোঁজ পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল নবাব পরিবারের বার্ধক্য ভাতার নথিপত্র, সময়সীমা ১৭৭২-১৮০০। আট খণ্ডের ওই সমস্ত 'ইংলিশ রেকর্ডস' থেকে আঠারো শতকের শেষ দিকে অস্তাচলগামী বাংলার এক নবাব পরিবারের অপরাহ্নের ছবি পাওয়া যায়।[২৩]

১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের নথিপত্র পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়। এই সময় বর্ধমান রাজপরিবারের দলিল দস্তাবেজও দেখেছিলেন পরিষদ সদস্যরা। ওই সমস্ত কাগজপত্রের মধ্যে ছিল 'মুঘল ফরমান', 'পরোয়ানা নিশান' ইত্যাদি। এই সমস্ত নথিপত্র দেখে অনুসন্ধানকারীদের মনে হয়েছিল '...This is the largest collection of Mughal documents in Bengal.'[২৪]

১৯৪৮-৪৯ সালে মুর্শিদাবাদ নিজামত পরিবারের নথিপত্র পরিষদের পক্ষ থেকে দেখা হয়। এখানে ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান নথিপত্রের সন্ধান না মিললেও আচার্য যদুনাথ এখানে অমূল্য এক গ্রন্থাগারের সন্ধান পেয়েছিলেন যা তাঁর ভাষায় ছিল '...very promising mine.'[২৫]

১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে পরিষদ সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জানা গিয়েছিল বাংলা দেশের জেলা মহাফেজখানার অন্ধকার ঘরে কী বিপুল বৌদ্ধিক বৈভব ছড়িয়ে আছে। আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক ইতিহাসের উৎসমুখ হল এই সমস্ত অবহেলা অযত্নে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ।

উদাহরণ হিসেবে আমবা অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলা মহাফেজখানার নথিপত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই মহাফেজখানা পরিদর্শনের কালে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা কোম্পানি আমলের 'ইংলিশ করেসপন্ডেন্স'-এর বিবিধ খণ্ডে (৩য়) ১৮১৯ সালে কলকাতা ও শহরতলিতে যাঁরা সতী হয়েছিলেন এমন বাহান্নজন মহিলার তালিকা পেযেছিলেন। এই বাহান্নজন সতীব নাম, ধাম, বয়স, স্বামীর নাম, পুত্র-কন্যাদের বয়স, বর্ণ, ধর্ম বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় এই তালিকায় আছে। এই তালিকার ওপর চোখ রাখলে বোঝা যাবে ১৮১৯ সালে সতীদাহ প্রথা কলকাতা ও গ্রামগঞ্জে কী ভয়ংকর আকার নিয়েছিল। রামমোহন রায় এই প্রথা অবসানে এইসময় কেন এগিয়েছিলেন সেই কারণেব প্রেক্ষিতে এই তালিকা অবশ্যই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।[২৬] ওই একই খণ্ডে ড. সিনহা একটা চিঠির সন্ধান পেয়েছিলেন যার বিষয় ছিল ডিসেম্বর ১৮, ১৮৫৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য জমি কেনা সম্পর্কিত। এই চিঠির ক্রমিক সংখ্যা ৩২২।[২৭]

ওই দুটি উদাহরণ চব্বিশ পরগনা সম্পর্কিত হলেও আমাদের অনুমান করার সংগত কারণ আছে যে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা মহাফেজখানার বান্ডিলে বান্ডিলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অনেক শিহরন জাগানো এমন তথ্য সকলের অগোচরে রয়ে গিয়েছে। ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ পর্ষদের বার্ষিক (১৯৪৯-৫০) প্রতিবেদনে জেলা নথিপত্রের সংরক্ষণ ও ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্ররা যাতে এই অমূল্য তথ্যরাশি দেখার সুযোগ পায় সেই প্রত্যাশা রেখেছিলেন।[২৮]

ড. সিনহার প্রস্তাব ছিল ওই সমস্ত জেলা নথিপত্র হয় জাতীয় গ্রন্থাগারে না হয় মহাকরণের রেকর্ডরুমে বা এশিয়াটিক সোসাইটি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা নিলে পর্ষদের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত নথিপত্রের বর্ণনামূলক তালিকা তিন বছরের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।[২৯]

১৯৪৯-৫০ সালে, ওই পর্ষদ প্রতিবেদন লন্ডনে বিশিষ্ট তিন ঐতিহাসিক আর. বি. র‍্যামসবোথাম, সি. সি. ডেভিস ও সি. এইচ. ফিলিপসকে পাঠানো হয়। পর্ষদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এঁরা। র‍্যামসবোথাম পর্ষদকে তাঁর চিঠিতে যা লিখেছিলেন সেখানে মিলবে পর্ষদের পরিশ্রমের দ্বিধাহীন মূল্যায়ন '...I can not imagine more valuable work for trained historians and it is of lasting value to all students of history... India is setting us a good example in the extension and development of the supervision and rendering of old local records.'[৩০]

উল্লেখ করা যায় আর. বি. র‍্যামসবোথাম ১৯২৯-৩০-এ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন. তাঁর সুপরামর্শে রেকর্ডরুম নানাভাবে উপকৃত হয়েছে বারেবারে।

ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য র‍্যামসবোথাম জুন ১৯০৮-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে, র‍্যামসবোথাম ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 'রিজার্ভ ফোর্স'-এ যোগ দিতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কিছুটা হতাশ হয়ে সরকারের শিক্ষাসচিবকে তিনি জানিয়েছিলেন : '..I cannot but regret that I am denied the opportunity of military service.'

সৈনিক না হতে পারার দুঃখ র‍্যামসবোথাম ভুলেছিলেন একজন সফল শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে। ঢাকা কলেজ থেকে অক্টোবর ১৯২১-এ র‍্যামসবোথাম হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ হন, এখানে তিনি ছিলেন মে ১৯২৮ পর্যন্ত, এরপর কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি। র‍্যামসবোথাম তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য হিসেবে।

র‍্যামসবোথাম ১৯২০'র দশকে শুধু অধ্যক্ষ হিসেবে নন, তিনি পরিচিত ছিলেন একজন বিদগ্ধ গবেষক হিসেবে। এই সময় রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানায় গবেষণার জন্য র‍্যামসবোথাম তাঁর নাম নথিবদ্ধ করেন। ১৯২৬-এ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Land Revenue History of Bengal* এই

গ্রন্থে রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মীরা তথ্য সংগ্রহের কাজে যেভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তার সবিশেষ উল্লেখ আছে।

তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে হয়তো অতি কথনের ঝোঁক খুঁজে পাওয়া যাবে, তবু ১৯৪৫ উত্তরকালে নথি অনুসন্ধান পর্ষদ জেলাস্তরে যেভাবে সরকারি, বেসরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান শুরু করেছিল তা নিঃসন্দেহে পঞ্চাশ বছর পরে এসেও আমাদের সমানভাবে বিস্মিত করে রাখে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের আনুকূল্যে আঞ্চলিক স্তরের পরিষদগুলি গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপর্ষদই মূলত এই সমস্ত আঞ্চলিক পর্ষদের নিয়ামক সংস্থা ছিল। ১৯৫১ সালে আঞ্চলিক পর্ষদের সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সময় থেকে প্রকাশিত পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখা থাকত : 'Report of the Regional Survey Committee for West Bengal, Appointed by the Government of West Bengal.' বোঝা গেল সচিবালয়ের নথিপত্রের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সরকার তার দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখতে কার্পণ্য করছে না। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন '...নরেনবাবু স্থানীয় দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধানের জন্য...রিজিওনাল সার্ভে কমিটি বসালেন। আমাদের মতো কয়েকটি সবুজ শিংওয়ালা গবেষককে সেই কাজে পাঠাতে লাগলেন। ওঁর উৎসাহ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।'[৩০ক]

৩

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্ষদের নতুন সদস্যদের নিয়োগ করল। মোট সদস্য ছিলেন কুড়িজন, চারজন মনোনীত। নতুন এই পর্ষদের সভাপতি ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার, সম্পাদক ছিলেন ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।[৩১]

জুলাই ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পরিষদের প্রথম অধিবেশনে মোট দশটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল :

১) স্যার যদুনাথ সরকারকে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরবি ও পারসি ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখতে দেওয়ার জন্য কোর্ট অভ ওয়ার্ডকে অনুরোধ করা, ২) মালদহে বে-সরকারি নথিপত্র সন্ধান করা, ৩) নদিয়ার মহারাজকে তাঁর পারিবারিক নথিপত্র দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা, ৪) এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুরোনো ঐতিহাসিক দলিলপত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া, ৫) বিভিন্ন জেলা সমাহর্তা দপ্তরে রক্ষিত নথিপত্র পরিদর্শন করা। পর্ষদ উল্লেখ করতে ভোলেনি যে এই সমস্ত জেলা মহাফেজখানায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলবে, যেমন মিলেছে চব্বিশ পরগনায়।[৩২] এই অধিবেশনেই কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের চার গবেষককে মনোনীত সদস্য হিসাবে পর্ষদে নেওয়া হয়।[৩৩]

সরকার গঠিত পর্ষদের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই এখানে। এই বছর পরিষদের পক্ষ থেকে হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বহরমপুরের জেলা মহাফেজখানা ও কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের রক্ষিত কোম্পানি আমলের বিচারালয়গুলির নথিপত্র পরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

ওই সমস্ত জেলা মহাফেজখানায় বহুদিনের পুরোনো নথিপত্রের সন্ধান পেয়ে ইতিহাসের বিদগ্ধ গবেষকরা যেন গুপ্তধন সন্ধান পাওয়ার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন, তেমনই সর্বত্রই নথিপত্র সংরক্ষণে অবহেলা অনাদরে পীড়িত হতেন—অনুমান করা যায়। তাঁরা হতাশ হয়ে লক্ষ করেছিলেন মহাফেজখানার কর্মীরা এই সমস্ত নথিপত্র সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়।

চব্বিশ পরগনা জেলা মহাফেজখানার সংগ্রহ কক্ষে পুরোনো সমস্ত নথিপত্র যেভাবে আলমারিতে রাখা ছিল তা আদৌ কাম্য ছিল না। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা যদি অন্যসব মহাফেজখানায় অনুসরণ করা হয় তাহলে '...No mending would suffice to preserve them.' পর্ষদ সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন।[৩৪]

প্রথম অধিবেশনের উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল জুলাই. ১৯৫২তে। ১৯৫২-৫৩ সালের পর্ষদের সদস্য সংখ্যা একই ছিল, সভাপতি সম্পাদক-আহ্বায়ক পদে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

ওই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে জেলা মহাফেজখানা পরিদর্শন ভিন্ন, অন্য প্রস্তাবগুলি ছিল। (১) কোচবিহার রাজ্যের নথিপত্র পরিদর্শন (২) মেদিনীপুর 'সল্ট পেপারস' প্রকাশের সিদ্ধান্ত ও (৩) বে-সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া।

মেদিনীপুরের 'সল্ট পেপারস' প্রকাশনা সম্বন্ধে পর্ষদের প্রস্তাবনায় বলা হল এমন প্রকাশনা আধুনিক ইতিহাসের অবহেলিত উপাদানের দিকে নজর টানার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রস্তাবিত প্রকাশনা সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা, সহযোগী হলেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার মুখার্জি।[৩৫]

বে-সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ ও ইতিহাসের এই বিকল্প উপাদানের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তা অবশ্যই অভিনব ছিল। জেলা মহাফেজখানায় সরকারি নথির সন্ধান পাওয়া যায়, বে-সরকারি নথিপত্র অনুসন্ধানের উপায় কী? পর্ষদ সরকারি প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের কথা ভেবেছিল। পর্ষদের সিদ্ধান্ত ছিল : কলকাতা আকাশবাণীকে বে-সরকারি নথিপত্র বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা হবে। পর্ষদের সদস্যরা মনে করেছিলেন এই ধরনের আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা নথিপত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংগ্রাহকরা সচেতন হয়ে উঠবেন।[৩৬]

১৯৫২ সালের জুলাইতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম ছিল কোচবিহার রাজপরিবারের নথিপত্রের সন্ধান নেওয়া। পর্ষদের দুই গবেষক অধ্যাপক অরুণকুমার

দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক এন. কে. সিনহা এই পরিদর্শনে যান জুন ২৪–২৫, ১৯৫২তে। উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত রাজপরিবারের নিজস্ব দলিল দস্তাবেজে তাঁরা বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদানের সন্ধান পেয়েছিলেন।

ওই মহাফেজখানায় যে বৈচিত্র্যপূর্ণ নথিপত্রের সন্ধান পর্ষদ অনুসন্ধানকারী ওই দুই গবেষক পেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল :

১. বাংলায় লেখা চিঠিপত্র, সময়সীমা ১৬৪৬–১৮৮৭,

২. বিষয অনুযায়ী ইংরেজিতে লেখা চিঠিপত্রের অনুলিপি,

৩. মহারাজ হরেন্দ্রনাথ ভূপ বাহাদুর ও মহারাজ শিবচন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রচিত বাংলা গান, সময়সীমা ১২৬৫ বঙ্গাব্দ,

৪. হরিভক্তি বিলাস : কবিতায় লেখা কোচবিহার রাজ পরিবারের ইতিহাস,

৫. কোচবিহার প্রশাসনের রাজস্ব বিভাগের নির্ঘণ্ট (১৮৭০-৭১),

৬. বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি।

বাংলায় লেখা যে বিপুল চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া গিযেছিল বিষয়েব দিক থেকে তা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বিষযের মধ্যে পাওযা যায় (১) ভুটান যুদ্ধ, (২) দাস প্রথা, (৩) চড়ক পূজা, (৪) পালকি ডাক, (৫) পাহাড়ি উপজাতি ভাষা ও (৬) সতীদাহ প্রথা অবসান ইত্যাদি।[৩৭]

নথিপর্ষদের তৃতীয অধিবেশন বসে জুন ১৯৫৩ সালে। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নথিপর্ষদের কার্যাবলির ব্যাপকতা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে আমরা পেয়েছি :

১. আগরতলার পুরোনো নথিপত্র দেখা, ঠিক যেমনভাবে কোচবিহার রাজবাড়ির নথিপত্র দেখা হয়েছিল,

২. কোচবিহার মহাফেজখানায় রক্ষিত ২৩৫৮টি বাংলায লেখা চিঠি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রেকর্ডরুম' বা 'মহাফেজখানা'য় সংগ্রহ করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা,

৩. গবেষকদের জন্য সদর দেওয়ানি সদর নিজামত ও সুপ্রিম কোর্টের নথিপত্রের বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুতের প্রস্তাব,

৪. পুরোনো নথিপত্রের সন্ধানে স্যার যদুনাথ সরকারের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা,

৫. মেদিনীপুরের 'সল্ট পেপারস' প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে আড়াই হাজার টাকার বিশেষ অনুদানের প্রস্তাব,

৬. জেলা মহাফেজখানাগুলিতে সংরক্ষিত নথিপত্রের অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ষণাবেক্ষণের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও প্রতিটি জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড কিপার ও তাঁর সহকারীকে নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ও

৭. পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক নথিপর্ষদকে নথিপত্র বিষয়ে সরকারের অন্যতম 'উপদেষ্টা'র মর্যাদা দেওযার প্রস্তাব রাখা হয এই সম্মেলনে। সর্বোপরি...

বিখ্যাত ঐতিহাসিক সরসীকুমার সরস্বতীর বর্ধমান জেলার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রস্তুত দীর্ঘ প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পর্ষদ মনে করেছিল এই সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ রক্ষার একমাত্র উপায় হল পুরাতত্ত্ব বিভাগ গড়ে তোলা। এই বছর পর্ষদের অন্যতম সদস্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের শূন্যপদে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনকে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।[৩৮]

আঞ্চলিক নথিপর্ষদের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে আসামের গৌরীপুর রাজপরিবারের নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ এই পরীক্ষার কাজ করেন। এখানে অধ্যাপক গুহ কয়েক সহস্র নথিপত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন।

গৌরীপুর রাজপরিবারের 'নথিপত্র' অধ্যাপক গুহ 'গৌরীপুর এস্টেট আর্কাইভস' বলে উল্লেখ করেছেন। গুহ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন এই সমস্ত নথিপত্র গৌরীপুর জমিদারকেন্দ্রিক ছিল না, গৌরীপুর জমিদারির মধ্যে কামরূপ, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ও রংপুর ছিল। রাজপরিবারের এই সমস্ত নথিপত্রে গোয়ালপাড়া, কোচবিহার, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।[৩৯]

ওই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে বাংলায় লেখা প্রচুর 'সনদ', 'কবুলিয়ত'-এর সন্ধান মিলেছিল। বাংলায় লেখা এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে একটা নথির সময় ১৬৩৭ সাল, প্রাচীনত্বের দিক থেকে নথিটি ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গ পত্র সংকলন'-এর তুলনায় পুরোনো বলা যেতে পারে।

১৯৫৫-৫৬ সালেই দেখা হয় সদর দেওয়ানি, সদর নিজামত, আদালত ও কলকাতার অন্যতম গির্জা সেন্ট জোনস চার্চের নথিপত্র। এই সময়ের দুই বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্ত এই দুই সংস্থার নথিপত্র পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অবশ্যই চার্চ ও আদালতের নথিপত্রে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক জরুরি তথ্যের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।[৪০]

বিস্তারিতভাবে ওই সমস্ত আঞ্চলিক নথিপর্ষদের বিভিন্ন সময়ের প্রস্তাব বা পর্ষদ সদস্যদের নথিপত্র পরিদর্শনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব না। এখানে শুধু লিখতে পারি পর্ষদ সদস্যরা সমাজ ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। আর এই দায়বদ্ধতার কারণে তাঁরা কখনও গিয়েছেন কোচবিহার, কখনও আসামের গৌরীপুর রাজপরিবারের মহাফেজখানায়, কখনো-বা কোম্পানি আমলের সদর দেওয়ানি বা নিজামত আদালত সংগ্রহকক্ষে। জেলা মহাফেজখানার আলো-আঁধারের অপরিচ্ছন্ন ঘরে দীর্ঘ সময় কাটানোর ক্লান্তি তাঁরা ভুলে যেতেন কোনো শিহরন জাগানো নথির সন্ধান পেয়ে এবং এমনই ঘটত বারেবারে।

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে প্রমাণ করা যায় সরকারি ও জেলাস্তরের নথিপত্রের সন্ধানে কীভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালের সূচনায় পর্ষদ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফলত একথা

নিঃসন্দেহে লেখা যায় পর্ষদ সদস্যরা যেমন নিত্য নতুন তথ্যের খোঁজে ব্যস্ত থাকতেন তেমনই তাঁদের মনে এসময় অনিবার্যভাবেই প্রাধান্য পেয়েছিল নথিপত্র সংরক্ষণের প্রশ্নটি। সংগ্রহ যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে মূল্যহীন হয়ে পড়বে এই সংগ্রহ। ১৯৫৮-৫৯ সালের পুনর্গঠিত পর্ষদের সদস্যরা এ বিষয়ে প্রথম ভেবেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে বাইশ সদস্যের আঞ্চলিক নথিপর্ষদ পুনর্গঠিত হয়। এই সময়ের বেদনাদায়ক ঘটনা হল আচার্য যদুনাথ সরকারের মৃত্যু। যদুনাথ দীর্ঘদিন নথিপর্ষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদুনাথের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই পর্ষদের ওপর ছায়া ফেলেছিল।

পর্ষদের প্রথম অধিবেশন বসে জুন ২৭, ১৯৫৯ সালে। সভাপতির ভাষণে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রয়াত ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : '...the great historian helped to create record conciousness in India.' এর তুলনায় সঠিক মূল্যায়ন আর কী হতে পারত।[৪১]

ওই সভায় বে-সরকারি নথিপত্র সম্বন্ধে কেন্দ্রের প্রস্তাব/পরামর্শ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। জাতীয় অভিলেখালয় থেকে বে-সরকারি নথিপত্র সংগ্রহের জন্য যে 'ন্যাশনাল রেজিস্টার' গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয় পর্ষদ তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। এই রেজিস্টারে উল্লেখ থাকত মূলত বে-সরকারি নথির প্রাপ্তিস্থান, নথির স্বত্বাধিকারীর নাম, পেশা, ঠিকানা এবং নথিপত্র বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণী।[৪২]

ওই অধিবেশনে পর্ষদের অন্যতম সদস্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর ড. ডি. সি. গাঙ্গুলি দলিল দস্তাবেজের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণের জন্য 'রিপেয়ার ডিপার্টমেন্ট' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন।[৪৩]

প্রস্তাবের পক্ষে কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাতীয় গ্রন্থাগারের বিপুল সংখ্যক নথিপত্র ও পাণ্ডুলিপির সুরক্ষা ও যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন কলকাতায় এইরকম দপ্তর গড়ে তোলা জরুরি।

ওই সভাতে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার পুরোনো সংবাদপত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর জন্যে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সদস্য ছিলেন : (১) অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার, (২) সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ, (৩) গবেষক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও পর্ষদের সচিব স্বয়ং।[৪৪] শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনো প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম এক যুগে আঞ্চলিক নথিপর্ষদ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে। দীর্ঘ সময় ধরে আচার্য যদুনাথ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খ্যাতিমান শিক্ষক ও এই সময়ের সমাজবিজ্ঞানীরা। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার সরকারি ও বে-সরকারি নথির খোঁজ করতে এঁদের উৎসাহে ঘাটতি ছিল না।

১৯৫১তে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় নথি সন্ধানের অভিজ্ঞতার কথা একজনের লেখা থেকে জেনেছি। '...ভারত স্বাধীন হওয়ার অল্পদিন পর থেকেই এই কমিটি বিভিন্ন জেলায় কালেক্টরি অফিসের দলিলগুলি সম্বন্ধে সমীক্ষা চালাচ্ছিল। অন্যদের সঙ্গে আমিও ছুটে গেলাম কো-অপটেড মেম্বার হিসেবে। ...কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ডাক বাংলোয় থাকা, মফঃস্বল শহরে সাইকেল রিক্সা চেপে কোর্টে যাওয়া, ধুলোয় ঢাকা পুরনো চিঠিপত্র ঘেঁটে উত্তেজক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার—সব মিলিয়ে খুবই উপভোগ্য ছিল কাজটা। ফিরে এসে রিপোর্ট লিখে দিতাম সার্ভে কমিটির Annual Report-এর জন্য। এই প্রতিবেদনগুলিতে আমরা দলিল থেকে কিছু নমুনা তুলে দিয়ে সরকারকে বোঝাতে চাইতাম যে অনেক প্রয়োজনীয় মালমশলা অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে, এই মূল্যবান দলিলগুলি বাঁচানো দরকার।'" ১৯৫০ সালে জেলান্তরের সরকারি মহাফেজখানার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পর্যদের এক সদস্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, আজকের অবস্থাও উন্নত নয়। তবু ১৯৫০-এর কালে যে উৎসাহ নিয়ে সরকারি ও বে-সরকারি নথিপত্র সন্ধান করা হত সে উৎসাহ ১৯৬০-৭০-এর কালে ছিল না, কারণ না খুঁজে বলা চলে এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৮০তে এই অবস্থা পালটিয়ে যায়, এই সময় পুনরুজ্জীবিত হল আঞ্চলিক নথিপর্যদ। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খ্যাতিমান অধ্যাপক ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকদের নিয়ে এই পর্যদ গড়ে উঠেছিল। সরকারের কয়েকটি দপ্তরের প্রতিনিধিও ছিলেন। 'আর্কাইভস' বা মহাফেজখানার অধিকর্তা ছিলেন এই পর্যদের সচিব ও আহ্বায়ক।

৪

আঞ্চলিক নথিপর্যদের উদ্যোগে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে বাংলা দেশের একাধিক জেলা ও মহকুমা মহাফেজখানা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের 'রেকর্ডরুম' পরিদর্শন করা হয়। সরকারকেও প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ে।

সরকার পরিদর্শকদের মতামত কতদূর মেনে নিয়েছিল সে প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে পর্যদের এই উদ্যোগের ফলে জেলা ও মহকুমান্তরের নথিপত্র সম্বন্ধে এক ধরনের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র সযত্নে রক্ষা করলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহুলাংশে রক্ষিত হবে এমন ধারণাও তৈরি হয়েছিল এই সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে।

ফলত সরকারি ও অন্যান্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের দলিল দস্তাবেজের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৮৯ সালে শিক্ষা বিভাগ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হল ত্রিশ বছরের পুরোনো যে সমস্ত নথিপত্রের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব আছে তা কখনও ধ্বংস করা যাবে না—এবং এ ক্ষেত্রে আর্কাইভস প্রধানের মতামত নিতে হবে। এই সমস্ত নথিপত্র সতর্ক, সাবধানি হয়ে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছিল ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এই বিজ্ঞপ্তিতে জেলা ও মহকুমান্তরের নথিপত্র সম্বন্ধে সরকারি

দায়বদ্ধতার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি আগে কখনও প্রকাশ করা হয়নি।[৪৬]

কোনো আর্কাইভস-এর সরকারি দলিল দস্তাবেজ যদি হয় 'মূল', তাহলে বলা চলে যে বে-সরকারি দলিলের দস্তাবেজ হল শাখা-প্রশাখা, আর দুইয়ে মিলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় মহাফেজখানার বিশালত্ব।

আমি লিখেছি ১৯৪০-এর শেষ থেকে বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ, বিশেষ করে পুরোনো জমিদার বাড়ির কাগজপত্রের সন্ধান নেওয়া শুরু হয়। অনেক কিছুর খোঁজ পাওয়া গেলেও কোনো কিছু সংগ্রহ করা যায়নি। ইতিহাসের এই অচিরাচরিত উপাদান আর্কাইভস/মহাফেজখানার ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল। ১৯৮০ সালের কালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। সামগ্রিকভাবে আর্কাইভস বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডে নতুন মাত্রা যোগ হল।

৫

১৯৮০ সালের দশকে যে সমস্ত বে-সরকারি সংগ্রহ আর্কাইভস বা মহাফেজখানার সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় :

১. রাধানাথ বসুমল্লিক সংগ্রহ। এই সংগ্রহে উনিশ শতকে কলকাতার এক বাঙালি উদ্যোগপতির ব্যাবসায়িক সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাবে,

২. উনিশ শতকে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে লেখা এক রোজনামচা বা ডায়েরির অনুলিপি। এখানে বাংলা দেশের এক জেলা শহরের আপাতদৃষ্টিতে অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীদের উত্থান ও ক্রমবিকাশের কথা আছে,

৩. শিবরতন মিত্র সংগ্রহ। এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে উনিশ শতকের বাংলা দেশের কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবীর চিঠিপত্র,

৪. মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর শ্রীপট মঠে সতেরো-আঠারো শতকের নথিপত্রের নিবন্ধ পুস্তক। এখানে ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে,

৫. ইতিহাসবিদ অধ্যাপক শিবপদ সেন সংগ্রহ। আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে ফরাসিদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর মূল্যবান তথ্য এই সংগ্রহে পাওয়া যাবে। এগারোটি 'মাইক্রোফিল্ম রোল'-এ এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ওই সমস্ত সংগ্রহের পাশে আছে মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর সংগৃহীত দলিল দস্তাবেজ। পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত দিক থেকে এই সমস্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী মানুষজন কীভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের মধ্যে আছে :

তাম্রলিপি স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতির সংগ্রহ। এই সংগ্রহ থেকে জানা যায় কীভাবে বাংলার এক মহকুমা শহর বিয়াল্লিশের আন্দোলনে স্বাধীনতার বিজয় নিশান

উড়িয়েছিল সে কাহিনি। ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীরা শেষ বিচারে জিতে যান। তমলুকের বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার আগে এখানকার মানুষজন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করেছিলেন স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচা যায় না।

ওই সংগ্রহের পাশে পাওয়া যাবে :

ক. মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের (১৯২০–৪৫) ও

খ. কন্টাই-এর বিপ্লবী আন্দোলনের নথিপত্র।

গ. বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সংগ্রহ, মূলত চিঠিপত্র ও

ঘ. হুগলি, চুঁচুড়া ও মেদিনীপুরের মহিষাদলের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী পরিবারের কাগজপত্র ইত্যাদি।[৪৭]

ওই সমস্ত বে-সরকারি নথিপত্র, পরিমাণে বিশাল না হলেও, পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজখানা বা আর্কাইভস-এর গতানুগতিক কর্মকাণ্ডে অবশ্যই বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। সরকারি নথির বৈচিত্র্যহীনতার পাশে এই সমস্ত বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সরকারি ভবনের চার দেওয়ালের মধ্যে সরকারি ও বে-সরকারি দলিল দস্তাবেজ সমান গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করে রাজ্য মহাফেজখানার বিশেষত্ব নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৮০ সালের কালে।

তৃতীয় পর্ব

ঔপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাল : ১৭৫৮—১৮৫৮

প্রাক্‌কথন

আধুনিক ইতিহাস রচনায় যে কোনো উপাদানের তুলনায় সরকারি দলিল দস্তাবেজের আকর্ষণ একজন গবেষকের কাছে একটু বেশি। ধূলি ধূসর বিবর্ণ নথিব পাতায় সন্ধান পাওয়া যায় সেই জগতের—যে জগৎ আমরা দেখিনি, আমরা খোঁজ পাই সেসব মানুষের যাঁরা ইতিহাসের চেনাজানা পথটা পালটানোর চেষ্টা করেন, সরকারি দালল দস্তাবেজের পাতায় ধরা থাকে এই জগতের স্মৃতি, এইসব মানুষের কর্মকাণ্ড, সাফল্য, ব্যর্থতা, আর আশা-নিরাশার ছবি। ইউনেস্কো এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজের জগৎকে 'স্মৃতির রাজ্য' বলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার নথিপত্র আমরা পরাধীন ইতিহাসেব প্রেক্ষিতে দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। (১) কোম্পানি যুগের (১৭৫৭—১৮৫৮) ও (২) ব্রিটিশ রাজের (১৮৫৯—১৯৪৭) নথিপত্র। যৌথভাবে এই দুই কালের নথিপত্রে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৪৭'র ১৪ আগস্ট পর্যন্ত পরাধীন বাংলা বিভাগ পরে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

ওই দুই কালের নথিতে একই সঙ্গে পাওয়া যাবে দুর্ভিক্ষ আর বিদ্রোহ। বাংলা বিভাগে কোম্পানি রাজত্বের সূচনায় আমরা দুর্ভিক্ষ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখেছি। আর এই রাজত্বের শেষে ঘটেছে সিপাহি বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক রাজত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজের সূচনায় (১৮৫৯) হয়েছে নীল বিদ্রোহ আর এই শাসন শেষ হয়েছে দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তরে, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায়, শেষে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে। দুই ভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর রাজত্বেব সূচনা ও অবসানের মধ্যে এমন মিলে আমরা চমৎকৃত হলেও বিস্মিত হই না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ব্রিটিশ রাজের শাসনের মধ্যে মৌলিক ফারাকই বা কতটুকু ছিল।

বিস্তারিতভাবে এখানে সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই, সম্ভবও না। আসলে বিপুল তথ্য আর অজস্র নথিপত্রের বিশাল সাম্রাজ্যের সামনে আমরা অসহায় বোধ করি। কোন নথি রেখে কোনটা নেব এমন পছন্দের তল মেলে না কখনও।

বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর খোঁজ নিতে হয় আমাদের। বর্তমান আলোচনা আমি সীমাবন্ধ রাখব কোম্পানি শাসনের সূচনা থেকে অর্থাৎ ১৭৭০-৭২ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল তীব্র উপনিবেশ বিরোধিতা অন্যদিকে ছিল আধুনিক হওয়ার স্বপ্ন। পুরোনো ধ্যানধারণা ঐতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থায় অনিবার্যভাবেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে চলছিল এই ভাঙাগড়ার খেলা, সরকারি নথির পাতায় এর প্রতিফলন ঘটেছে।

পলাশি যুদ্ধোত্তরকালে রাজনৈতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তারের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে এই সময়ের নথিপত্রে। 'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার কাহিনি আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের জানা নেই এক ভিনদেশি বাণিজ্যিক গোষ্ঠী কীভাবে গভীর ধৈর্য সতর্কতা আর প্রশংসনীয় শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে তাদের প্রতিদিনের প্রশাসনিক কাজের হিসেব, তালিকা ও বিবরণ নথিবন্ধ করে রাখত। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার (তার জন্যে দুর্ভিক্ষ হলেও ক্ষতি নেই) পাশাপাশি ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির অবসান ঘটানোর কাজে প্রয়োজন হয়েছিল সংগঠিত প্রশাসনিক দপ্তরের। কোম্পানি জানত সুনিশ্চিতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা থেকে স্বাধীন রাজ্য দখল করার জন্য যেমন দরকার তীক্ষ্ণ কূটনীতি, দক্ষ সেনাবাহিনী তেমনই দরকার নথিপত্র। তরবারি হাতে যুদ্ধে জেতা যায়, কিন্তু সেই জয়কে স্থায়িত্ব দিতে দরকার দক্ষ প্রশাসন আর দলিল দস্তাবেজ। মনীষী এডমন্ড বার্ক কোম্পানি প্রশাসনকে বলেছিলেন 'নথি-রাজ' যেখানে 'The arguments first or last, are to be in writing and recorded.' আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে লিখিত এই 'যুক্তি', 'তর্কো' বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারব এই সময়কার নাটকীয় ঘটনাবলি আর তার কুশীলবদের কাহিনি।

পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানি বুঝেছিল আজ অথবা কাল বাংলা দেশে এবং অন্যত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আসবে; বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে এই সময়কার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ে তাদের কূটকৌশলের বা কূটনৈতিক পদক্ষেপে, দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সমঝোতা, যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরিকল্পনার কাহিনি আছে ১৭৬৩ সালে তৈরি 'পাবলিক' ও 'সিক্রেট' বিভাগের নথিপত্রে। বর্তমানে এই দুই বিভাগের নথিপত্র দিল্লির হেপাজতে। পলাশি যুদ্ধের পর গঠিত সিলেক্ট কমিটির (জানুয়ারি ৪ নভেম্বর ৭, ১৭৫৮ ও ১৭৬৬–৭০) কয়েকটি খণ্ড বাদ দিলে রাজ্য মহাফেজখানায় ১৭৭১ থেকে কোম্পানি যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত কয়েক সহস্র দলিল দস্তাবেজ আছে। এই সমস্ত নথিপত্রের উৎসস্থল কোম্পানির কয়েকটি প্রধান ও গৌণ দপ্তর, পর্ষদ ও একাধিক শাখাপ্রশাখা।

এই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পাওয়া যাবে : (১) বাণিজ্য পর্ষদ (১৭৭৪) (২) রাজস্ব বিভাগ (১৭৭৫) (৩) রাজস্ব পর্ষদ (১৭৮৬), বিচাব বিভাগ (১৭৯৩), সাধারণ বিভাগ (১৮৩৪), শিক্ষা পর্ষদ (১৮৪২–১৮৫০)। এই সমস্ত মুখ্য বিভাগের পাশে ছিল আরও

কিছু দপ্তর পরবর্তীকালে যে সমস্ত দপ্তর কোম্পানি যুগের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত দপ্তরের অন্যতম ছিল (১) রাজনৈতিক দপ্তর (১৮৩৪) (২) রেল (১৮৪৫)। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, শাখা, উপশাখা দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ে। এখানে আমি কোনো দপ্তরের শাখার কথা লিখলাম না।

বিনা দ্বিধায় লেখা যায় পরিমাণের দিক থেকে কয়েক সহস্র (কোম্পানি ও ব্রিটিশ যুগের) নথিপত্রের সন, তারিখ ও কার্য বিবরণীর ক্রমিক সংখ্যা (প্রসিডিং নম্বর) ধরে বর্ণনা করা যায় না। ফলত এই কারণে আমরা শুধু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল ও তথ্যের উল্লেখ করব। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে মূল বিভাগ, পর্ষদের দলিলপত্রের মধ্যে, বিভাগীয় শাখার মধ্যে নয়।

১

কোম্পানি আমলের নথিপত্রে পাওয়া যাবে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শাসক গোষ্ঠীতে রূপান্তরের কাহিনি। আমাদের তরঙ্গহীন কৃষিভিত্তিক সমাজ কীভাবে এক ভিনদেশি শাসক সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশিতে ১৭৭০ সাল থেকেই ভাঙতে শুরু করে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে এই সময়ের রাজস্ব বিভাগেব নথিপত্রে। পরবর্তীকালে রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার বিভাগের নথিপত্রেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৭৭০ বা সন ১১৭৬ সালের বাংলা বিহার ওড়িশার দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত) থেকে ১৭৯৩'র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে কোম্পানি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে শোষণের যে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে রাজস্ব দপ্তব ও এই বিভাগের বিভিন্ন শাখার নথিপত্রে।

দুর্ভিক্ষ দিয়ে কোম্পানি রাজত্বের শুরু বাংলা দেশে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে কুখ্যাত এই ঘটনায় বাংলা দেশের জনজীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার নজির কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মিলবে না, খোদ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা যা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে মুর্শিদাবাদের 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অভ রেভিন্যু' শাখার কাগজপত্রে। ১৭৭০'র এপ্রিল ১০ তারিখে লন্ডন থেকে কলকাতার প্রশাসকদের কাছে লেখা একটা চিঠি থেকে আমরা জেনেছি : '...As the famine which has raged to so great a degree throughout the provinces could not but utmost compassion for the miseries which the poor must have suffered from it.' (কন্ট্রোলিং কাউন্সিল মুর্শিদাবাদ, জুলাই ১৩, ১৭৭২, পৃ. ৬৩)। কন্ট্রোলিং কাউন্সিল কাগজপত্র ভিন্ন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিপুল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই সময়ের রাজস্ব দপ্তর ও পর্ষদের কাগজপত্রে।

দুর্ভিক্ষের পর শুরু হল সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ। ১৭৭৩ সালের গোড়ায় উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর ফকির-সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি ও সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে যে সন্ত্রাসের সূচনা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলার

জন্য এই সময় গঠিত 'কমিটি অভ সার্কিটে'র নথিতে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হল এই দপ্তরের রংপুর, দিনাজপুর, রাজমহল সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ। দিনাজপুরে যেভাবে সন্ন্যাসীরা জড়ো হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে দিনাজপুরের 'কমিটি অভ সার্কিটে'র প্রতিবেদনে।

সন্ন্যাসী-ফকির আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা (কোম্পানির ভাষায়) শুরু করেছিল ওই দশকে তা শেষ হয়নি, বরং পরের দশকগুলিতে এই বিদ্রোহের ধার, ভার আরও বেড়েছিল। স্থানীয় মানুষজনও স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। এই সময়ের রাজস্ব বিভাগের নথিপত্রে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। যেমন আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৭৮২ সালের জানুয়ারি ৩, গভর্নর জেনারেল পরিষদ বোধকরি একটু শঙ্কিত হয়েছিল দিনাজপুরে সন্ন্যাসী নেতা মজনু শার উপস্থিতিতে। সরকারি নথিতে লেখা আছে, 'M. Shah has entered with a considerable number of followers.' (রেভিন্যু ডিপার্টমেন্ট, জানুয়ারি ৩, ১৭৮২, ক্রমিক সংখ্যা ৬)। এই বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের সংবাদ রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্র থেকেও আমরা পেতে পারি।

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর বা সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি সদ্য গঠিত কোম্পানি শহর কলকাতায়। পলাশি যুদ্ধের পর ঘটনা পরম্পরায় কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় ১৭৭০ সালের মধ্যে। ফলত নবাবি আমলের সূর্য যখন মুর্শিদাবাদের গঙ্গায় ডুবেছিল তখন গঙ্গার আর এক দিকে, হুগলির পশ্চিম পারে, অন্য এক সূর্য উঠেছিল। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত অখ্যাত জনপদ কলকাতা হয়ে উঠল বাংলার নতুন শাসক গোষ্ঠীর আস্তানা।

কলকাতাবাসীর নিরাপত্তা আর পৌর সুযোগসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৭৭০ সাল থেকে কলকাতা গড়ার কাজ শুরু হয়। চিরশত্রু ফরাসি সেনাদের আক্রমণের হাত থেকে কলকাতাবাসীকে রক্ষার জন্য ১৭৭০ সালের ২৭ জুন কোম্পানির সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী রবার্ট বারকার তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান (সিলেক্ট কমিটি, জুন ২৭, ১৭৭০)।

কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার করে ১৭৭২ সালের শেষের দিকে এখানে গঠিত হল দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি বিচারালয় ও একাধিক নিম্ন আদালত। (রেভিন্যু বোর্ড, ডিসেম্বর ১৫, ১৭৭২)। ১৭৭৩ সালের নভেম্বরে স্বয়ং গভর্নর জেনারেল 'রেভিন্যু বোর্ড'কে অনুরোধ করেন : ' to appoint six additional constables for preservation of peace in the city of Calcutta...' (রেভিন্যু বোর্ড, হোল কাউন্সিল : নভেম্বর ২, ১৭৭৩)। উল্লেখ্য এই অস্থায়ী রাজস্ব পর্ষদই এই সময় গভর্নর জেনারেলের সমস্ত কাজের তদারকি করতে পারত। এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত গভর্নর জেনারেল মানতে বাধ্য থাকতেন। পরবর্তীকালে এই দায়িত্ব নেয় স্থায়ীভাবে গঠিত খোদ রাজস্ব বিভাগ।

রাজস্ব বোর্ডের নথিতে কলকাতার সমাজ জীবন সংক্রান্ত অনেক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেমন ওই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা ছিল দাস

ব্যাবসা। রাজস্ব বোর্ডের ১৭৭৪ সালের কাগজপত্রে 'দাস' প্রথা নিয়ে অনেক তথ্যের খোঁজ পাওয়া যাবে। দাসদের সন্তান-সন্ততিদের ওপর কার অধিকার থাকবে? খ্রিস্টান দাসদের কী দরদাম ছিল? কীভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে এমনই তথ্য এই দপ্তরে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যা এই সময়ের সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ (রেভিন্যু বোর্ড অভ হোল কাউন্সিল, মে—জুলাই, ১৭৭০)।

গ্রাম কলকাতার শহরে উন্নীত হওয়ার বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ পাওয়া যাবে উপর্যুক্ত বোর্ড ভিন্ন খোদ রাজস্ব বিভাগ, ক্যালকাটা কমিটি অভ রেভিন্যু ও পরে রাজস্ব পর্ষদের নথিপত্রে। এই সমস্ত নথিপত্রে দেখি সুতানুটির ইজারা নিয়ে রাজা নবকৃষ্ণের আবেদন, প্রশাসনিক কঠোরতার বিরুদ্ধে কলকাতার সাধারণ দোকানদারদের অভিযোগ, বাগবাজার, সুতানুটি থেকে নবকৃষ্ণের রোষে উৎখাত হওয়া লোকজনের আবেদন সরকারের কাছে, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হাটবাজার গড়ে তোলার আবেদন, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টেরিটি বাজার ও বৈঠকখানা বাজার সংক্রান্ত তথ্য।

কলকাতার প্রথম 'ব্যাংক অভ বেঙ্গল' নিয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য আছে 'ক্যালকাটা কমিটি অভ রেভিন্যু'র নথিপত্রে (ডিসেম্বর ২১, ১৭৭৪, ক্রমিক সংখ্যা ২—৭)। যৌথ পরিবার নিয়ে তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এই দপ্তরেরই নথিপত্রে (জানুয়ারি ১৬, ১৭৭৫, ক্রমিক সংখ্যা ৫—৬)। কলকাতার সীমানা নিয়ে অনেক তথ্য আছে এই দপ্তরেরই জুন, ১৭৭৭'র নথিতে (জুন ১৭৭৭, ক্রমিক সংখ্যা ১)। আঠারো শতকের সাতের দশক থেকে এই শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই দপ্তরের বিভিন্ন সময়ের নথিপত্রে পাওয়া যাবে। এই সময় থেকে কলকাতাকে শহরে উন্নীত করার যে মহড়া শুরু হয় তা শেষ হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে 'কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি' বা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে।

সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও কোম্পানির মৌলিক ও মূল চরিত্র বোধকরি তার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের খেলায় যুক্ত কোম্পানি সারা ভারত জুড়ে যে বাণিজ্যিক ক্ষমতা দখলের জাল বিছিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৭৭৪ সালে গঠিত কোম্পানির বাণিজ্যিক পর্ষদের নথিপত্রে। এই সময় থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই পর্ষদের নথিপত্রে। বাংলার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ দুস্থ কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা, আর এই সমস্ত কর্মীদের ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচারের নিখুঁত ছবি পাওয়া যাবে বাণিজ্যিক পর্ষদের নথিপত্রে। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি বাংলার তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষদের কথা। সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ সালে এই দপ্তরের অবসান ঘটে যেহেতু কোম্পানির '...Trading operation came to an end', ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের পরিণতি।

১৭৭৫ সালে কোম্পানি গঠন করে বাংলা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর রাজস্ব বিভাগ। কোম্পানি আমলের সূচনায় গঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত ছোটো ছোটো শাখা-প্রশাখা,

কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অভ রেভিন্যু বা পরবর্তীকালে গঠিত কাউন্সিল অভ রেভিন্যুর দায়ভার নিল রাজস্ব দপ্তর। ১৮১৫ সালে এই দপ্তরের নাম পালটিয়ে হয় 'টেরিটোরিয়াল রেভিন্যু'। এই দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি দিতে পারি।

নিঃসন্দেহে লেখা যায় ১৭৭৫ সালে গঠিত রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে আঠারো শতকের আটের দশক থেকে উনিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। নবাবি শাসনের জমিদারি প্রথা কোম্পানি শাসনের ফলে কীভাবে নিশ্চিত পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল তার বিস্তারিত তথ্য রাজস্ব দপ্তরের ১৭৮০ সালের বিভিন্ন সময়ের দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায়।

মূলত ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে কর্নওয়ালিস পর্যন্ত এই সময় জুড়ে বাংলার গ্রামীণ জীবনে ভূমিকেন্দ্রিক সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা বিন্যাসের ছবি আছে ওই দপ্তরের নথিতে। বাংলার অভিজাত গোষ্ঠীর উত্থান পতনের তথ্য আর বাংলা দেশের বিভিন্ন জমিদারির ইতিহাস জানতে হলে অবশ্যই রাজস্ব দপ্তরের সাহায্য নিতে হবে। কীভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদারি প্রথায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন এনে এক নব্য ধনিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ চূড়ান্ত করেছিল সে ইতিহাস রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে সাজানো আছে।

রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রের গুরুত্ব আমরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কোম্পানি রাজত্বের সূচনা থেকে, ধরা যেতে পারে ১৭৬৫ সাল থেকে, ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত যে ইতিহাস আছে সেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গ্রাম কলকাতাকে শহরে উন্নীত করার বা কোম্পানির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ করতে পারি না। দূর সমুদ্র পেরিয়ে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই শুধু রাজস্বের ঝোলা পূর্ণ করতে আসেনি, কোম্পানির অন্য এক উদ্দেশ্য ছিল। ওই উদ্দেশ্য দেখার আগে আমরা রাজস্ব বিভাগের এক চমক জাগানো প্রয়াসের কথা লিখতে পারি। ১৭৮৭ সালের গোড়ায় কোম্পানির সেই সময়ের পরিচালক গোষ্ঠী কলকাতার উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল গার্ডেন্স বা 'বনবিতান' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করতে ভুল করেননি। দুশো বছরের বেশি সময় ধরে এই 'প্রতিষ্ঠান' আজও আমাদের চমক জাগায়। এর সূচনায় আমরা দেখি .

১৭৮৭ সালের এপ্রিলে গভর্নর জেনারেল তাঁর সাপ্তাহিক অধিবেশনে তাঁর সদস্যদের জানান যে সরকার কলকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন্স' বা 'বনবিতান' গড়ে তোলার জন্য জমি নির্দিষ্ট করেছে। তিনি জানিয়েছিলেন এই প্রস্তাবিত 'বনবিতান' সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ করে গঙ্গায় বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য এর চারধারে ছোটো ছোটো পরিখা খনন করা হবে। বনাঞ্চলের চারধার ঘেরা থাকবে বন্যজন্তু থেকে একে রক্ষার জন্য। এই বনবিতানের প্রথম পরিচালক ছিলেন কর্নেল কীড। জুন ১৭৮৭ সালে কীড এই বনবিতান নিয়ে তাঁর প্রথম প্রতিবেদন সরকারকে পাঠান (রাজস্ব দপ্তর, এপ্রিল ১৬, ১৭৮৭, ক্রমিক সংখ্যা ৯ ও জুন, ৮ ক্রমিক সংখ্যা ২১)।

রাজস্ব বিভাগের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত 'অ্যাকাউন্টস রেজিস্টার' দেখলে আমরা জানতে পারব ১৭৯৩–১৮১৮ সালের মধ্যে বাংলা বিভাগের কোন্ কোন্ জেলায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সূর্য ডোবার আগে, খাজনা দিতে না পারার জন্য, কাদের ভূসম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত জেলার মধ্যে ছিল : নদিয়া (১৭৯৩–১৮১২), যশোহর (১৭৯৩–১৮১৩), ঢাকা (১৭৯৩–১৮১৩), দিনাজপুর (ওই), চট্টগ্রাম (১৭৯৪–১৮১৭) ও রাজশাহি (ওই)। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজের এই ভূ-সম্পত্তির মধ্যেই ছিল এই সমাজের ক্ষমতার উৎস। আরও পরের ওই 'অ্যাকাউন্টস রেজিস্টার' দেখলে পাওয়া যাবে ১৮৪১–৪২ বাংলা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় খাজনা না দেওয়ার জন্য বিক্রি হয়ে যাওয়া জমির তালিকা।

১৭৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি ১১, গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে কোম্পানির উদ্দেশ্য ও প্রশাসনিক দর্শন। এই দেশ দখলে কোম্পানির কি লক্ষ্য ছিল? কর্নওয়ালিস তাঁর দুশো তিয়াত্তর পাতার মিনিটে যা শুরুতে বলেছেন : (১) রাজনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও (২) এই দেশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে আনা। ঔপনিবেশিক লালসা প্রকাশে এই গভর্নর জেনারেলের কোনো কার্পণ্য ছিল না। এই শ্বেতপত্রের বিভিন্ন অংশে গভর্নর জেনারেল একদিকে কোম্পানির লক্ষ্য প্রকাশ করেছিলেন অন্যদিকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের বিচার বিভাগে অধিক মাত্রায় নিয়োগের প্রস্তাব রাখেন (রাজস্ব বিভাগ, ফেব্রুয়ারি ১১, ১৭৯৩, ক্রমিক সংখ্যা ১)।

সূচনা পর্বে রাজস্ব বিভাগ যদি কোম্পানি শাসনের প্রথম স্তম্ভ হয় তাহলে এই পর্বের প্রশাসনের স্তরে রাজস্ব পর্ষদ ছিল দ্বিতীয় স্তম্ভ। ফলত এই দুই দপ্তর এক ভিনদেশি শাসক গোষ্ঠীর মূল প্রশাসনিক দায়ভার গ্রহণ করে চলেছিল। এই পর্ষদের হাতে চূড়ান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না ঠিকই, কিন্তু যে ক্ষমতা ছিল তাতে গ্রাম বাংলার সামাজিক জীবনে নিখুঁত পরিবর্তন আনার পক্ষে অনিবার্য ছিল।

জুন ১৭৮৬ সাল থেকে এই দপ্তরের কাগজপত্র রাজ্য মহাফেজখানায় আছে। এই সমস্ত দলিলপত্রের ওপর এক ঝলক নজর দিলে দেশের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা, দেশের পতিত জমি উদ্ধার, বণ্টন, গ্রামগঞ্জে নীল চাষের প্রবর্তন, জেলা/মহকুমা স্তরে পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন, জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন অনাথ শিশুদের বাসস্থান নির্মাণ, পাঠশালা তৈরি, হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা, কলকাতাবাসীদের জন্য গঙ্গায় স্নানের ঘাট নির্মাণ, ধনীদের বিনোদনের ব্যবস্থা হিসাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠ তৈরির সংবাদ পাওয়া যাবে। 'কালাপানি' পার হলে 'জাত' যাবে কিনা এমন বিষয় নিয়ে পর্ষদ ভাবনাচিন্তা করেছিল, এই তথ্য পাওয়া যাবে পর্ষদের জুন ২২, ১৭৮৭ সালের নথিতে, ক্রমিক সংখ্যা ৪৫। শুরু থেকে রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে কোম্পানির বিচার ব্যবস্থা যুক্ত ছিল। প্রথমে সম্ভব হলেও পরে স্বাভাবিক কারণে এই 'দ্বৈত পদ্ধতি' অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির একের পর এক

নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ অন্যদিকে এই কারণেই ক্রমবর্ধমান মামলা মোকদ্দমায় কোম্পানির শাসক গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে বিব্রত হয়ে নতুন পথ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যার পরিণতিতে স্বাধীন বিচার বিভাগ গড়ে তুলতে কোম্পানি বাধ্য হয়।

সুতরাং মে ১৭৯৩ সালে গঠিত হল কোম্পানির বিচার বিভাগ। কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সময় যেভাবে বাংলা দেশের জমিদারি প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙতে বসেছিল এবং অন্যদিকে যে নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল সেখানে যে স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্বও বাড়ছিল এটা বুঝতে কোম্পানির অসুবিধে হয়নি। ভাঙাগড়ার এই খেলায় দরকার পড়েছিল এক নতুন সম্প্রদায়কে যে সম্প্রদায়ের দায়িত্ব/কর্তব্য হবে যুযুধান দুপক্ষের হয়ে বুদ্ধি/মননের লড়াই করে যাওয়া। সমাজের উচ্চবর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মধ্যে কোম্পানি তার উকিলবাবুদের খুঁজে পেল। এই বিভাগের এই সময়ের নথিপত্রে এই নতুন উকিলবাবুদের নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে।

শুধু উকিলবাবুদের কথা নয়, মুসলিম সমাজের কাজিদের নিয়েও সরকার চিন্তিত ছিল। ঐতিহ্য আশ্রয়ী এই 'বৃত্তি' মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে আদৃত ছিল, শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রতিপত্তি, এই বৃত্তির মানুষেরা সাধারণের কাছ থেকে অর্জন করতেন। বিচার বিভাগের নথিপত্রে উকিলবাবুদের পাশে মুসলিম কাজিদের অবস্থান আদৌ বেমানান ছিল না। কোম্পানি আদালত কখনো-কখনো হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় গুরুগম্ভীর আকার নিত জজ পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যে।

ফলত আঠারো শতকের শেষ দশকের একেবারে শেষের দিকে বিচার বিভাগের নথিতে উকিল, কাজি ও জজ পণ্ডিতদের নিয়ে যথেষ্ট তথ্যের হদিস পেতে পারি আমরা। কোম্পানি শাসনের বাতাবরণে এদের পরিমার্জিত উপস্থিতি অনিবার্য ছিল এমন কথাও বলা চলে। সমাজের উচ্চবর্ণভুক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবার থেকে এই সমস্ত বৃত্তির মানুষজনকে নিযোগ করা হত। এরাই উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকদের পূর্বসূরি। ১৭৯৩–১৮০০ সালের বিচার বিভাগের নথিতে এদের সম্বন্ধে বিপুল তথ্য আছে, ব্যক্তি ধরে পরিচয় আছে।

'বিচার বিভাগ' শুরু থেকে 'সিভিল' ও 'ক্রিমিন্যাল' এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। ক্রিমিন্যাল অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কলকাতার নগরায়ণ ও কোম্পানি বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ।

রাজস্ব দপ্তর ও রাজস্ব পর্ষদের মতন বিচার (ক্রিমিন্যাল) বিভাগের নথিপত্র বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য তথ্যে পূর্ণ। এই সমস্ত নথিপত্রে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা দুশো বছরের আগের বাংলা দেশের সামাজিক চিত্রটা আমাদের সামনে অনেকটাই পালটে দিতে পারে, খুলে যেতে পারে অন্যান্য দরজা। যেমন ১৭৯৪ সালের মে মাসে ঢাকার জেলাশাসক তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই অঞ্চলের এক কুখ্যাত ডাকাত সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন যে এই কুখ্যাত রেজা খাঁর অভ্যাস হল চণ্ডীপুজোর দিন হিন্দু বালিকাদের বলি দেওয়া। মুসলিম রেজা খাঁ চণ্ডীপুজো করতেন ডাকাতি করার

জন্য? এই তথ্য অবশ্যই শিহরন জাগানো (বিচার (ক্রিমিন্যাল), মে ২৩, ১৭৯৪, ক্রমিক সংখ্যা ৬)।

বিচার বিভাগের ওই শাখার নথিতে পাওয়া যাবে ১৮০০ সালের মার্চ মাসে ঘটে যাওয়া কোম্পানি বিরোধী কাছাড় বিদ্রোহ। কাছাড়ের রাজা সিলেটের জেলাশাসককে তাঁর এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন মুঘলনেতা আগা মহম্মদ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সংগঠিত করেছে (ওই, মার্চ ১৪, ১৮০০ সাল, সংশ্লিষ্ট পত্র ৮)।

উনিশ শতক

উনিশ শতকের বিস্ময় কলকাতাকে ঘিরে। সমগ্র বাংলা বিভাগ মনে হয় কলকাতাকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছিল। এখানেই নগরায়ণের সূচনা। বাংলা দেশের ঐতিহ্য আশ্রয়ী সমাজে এখান থেকেই সংস্কারেব নৌকো ভাসান হয়, আধুনিক শিক্ষার সূচনা এখানে, শহরতলি বা গ্রাম বাংলা কলকাতার আদৃত হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে 'গ্রাম কলকাতা' বড়ো রকমের পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়ায়। রাতারাতি 'কলকাতা' নামের বর্ধিষ্ণু গ্রামটা শহরের মর্যাদা পেতে শুরু করেছিল এবং কীভাবে এই সময়ের গভর্নর জেনারেল, যুদ্ধবাজ রিচার্ড কোলি ওয়েলেসলি, কলকাতার নগরায়ণ বা বহিরাঙ্গিক বিকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই কাহিনি পাওয়া যাবে এই সময়ের কাগজপত্রে। ১৮০৪-এর জুলাই মাসে ওয়েলেসলি কলকাতা উন্নয়ন নিযে সর্বপ্রথম তাঁর গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন তাঁর পারিষদদের সামনে। কেন কলকাতা উন্নয়ন জবুরি তাঁর কাছে? এর সরাসরি উত্তর দিযেছিলেন তিনি। তাঁর ভাষায় '...The increasing extent and the population of Calcutta the capital of the British Empire in India and the seat of the supreme authority, require the serious attention of the Govt..' অবশ্যই কলকাতা সূচনার দলিল এটি (জুডিশিয়াল (ক্রিমিন্যাল), জুলাই ১৪, ১৮০৩, ক্রমিক সংখ্যা ২৫, ২৬, জুলাই ২৬, ক্রমিক সংখ্যা ২৩, ১৮০৪ সাল)। এই তারিখে নগর উন্নয়ন পর্ষদ কলকাতার বাজার সমস্যা মূলত বাজারের নিরাপত্তা নিযে আরও একটি সভায় মিলিত হযে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে যা কলকাতা উন্নযনেব প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল (জুলাই ২৬, ১৮০৪, ক্রমিক সংখ্যা ২৪)।

সরাসরি লেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম একচল্লিশ বছর (১৮৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত) কলকাতা নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে বিচার বিভাগের 'ক্রিমিন্যাল' শাখার নথিপত্রে। এই বছরের জুলাই থেকে বিচার বিভাগের দ্বৈত সত্তা (সিভিল ও ক্রিমিন্যাল) লোপ পায়, এবার শুধু বিচার বিভাগ।

ওই সময়ের মধ্যে কলকাতা সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে পাওয়া যায় শিয়ালদহের বৈঠকখানা বাজারের সঙ্গে চিৎপুরের সংযোগ ঘটানো, ১৮১৭তে কলকাতায় কলেরা মহামারি নিয়ে মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন, কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে জলপথের প্রবর্তন করা, ১৮২৯ ও ১৮৫৪ সালে চৌরঙ্গি ও এসপ্লানেডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল

গোচারণের জন্য বাৎসরিক কিস্তিতে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা, গঙ্গার পাড়ে নতুন স্নানের ঘাট নির্মাণ ও পুরোনো ঘাটের সংস্কার ইত্যাদি, শেষে বলা চলে ১৮৫৪ সালে কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে কোম্পানি কলকাতাবাসীকে চমৎকৃত করতে চেয়েছিল। কলকাতাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা কোম্পানির শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক তেমনই কোম্পানি প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো ছিল এ সময়ের কর্তাব্যক্তিদের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৭৯৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁর প্রশাসনিক শ্বেতপত্রে কোম্পানির প্রশাসনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, আমি লিখেছি সে-কথা।

কর্নওয়ালিসেব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে ১৮১৬ সালে। এই সময় কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠী বাংলা প্রশাসন ঢেলে সাজানোর ছক তৈরি করে যা অবশ্যই পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলে গিয়েছিল (রাজস্ব পর্ষদ জানুয়ারি ৩০, ১৮১৬ ; ক্রমিক সংখ্যা ২২)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার প্রজার সম্পর্কে যে পরিবর্তন এসেছিল এই সময়ের রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব পর্ষদের নথিতে সেই সম্পর্কের বিবরণ আছে। কোম্পানি প্রশাসকদের লক্ষ্য ছিল অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উপায় বের করা হলেও তারা অনেকাংশে বিচার বিভাগ পুনর্গঠন করেছিল মূলত কৃষকদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অন্তত গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা (মার্কুইজ অভ হেস্টিংস)-র লেখা এই সময়ের এক মিনিটের ওপর চোখ রাখলে একথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে। বিচার বিভাগের পুনর্গঠনের লক্ষ্য ছিল '...to protect the common peasants against aggressive exactions by the Zaminders.' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় না থাকলেও তারা অন্তত আইন আদালতের সাহায্য নিতে পাবত। লর্ড ময়রার মিনিটে স্পষ্টভাবে লেখা আছে '...The ryot has under their permanent settlement to means of redress against the extortion of the Zaminders but a suit in court of justice.' (বিচার (সিভিল) বিভাগ আগস্ট ১২, ১৮১৭, ক্রমিক সংখ্যা ১৬)।

গ্রাম কলকাতা ভেঙে যেমন গড়ে উঠেছিল নতুন কলকাতা তেমনই এই নতুন কলকাতায় পুরোনো ধ্যানধারণা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঐতিহ্য আশ্রয়ী চিন্তা চেতনায় আঘাত পড়েছিল নিশ্চিতভাবে। বর্ণাশ্রয়ী ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশে জায়গা করে নিল নতুন শিক্ষা বা পশ্চিমি শিক্ষা। ১৮১৭ সালের জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেমন সরকারের কাছে জরুরি ছিল তেমনই এই নতুন শহরকে ঘিরে বাংলার সামাজিক জীবন অল্পদিনের মধ্যে পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তিত সময়ের প্রধান পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। রাজস্ব বিভাগ, রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার (সিভিল, ক্রিমিন্যাল শাখা) বিভাগের দলিলে রামমোহন ও তাঁর পরিবার সংক্রান্ত বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে। স্থানাভাবে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোম্পানির শাসককুল পরিচিত ছিল। সেই সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধিকার চেতনা তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল। রামমোহনের আত্মমর্যাদাবোধের ছবি ও তাঁর সম্বন্ধে সরকারি রাজপুরুষদের সম্ভ্রমবোধের পরিচয় আছে, ১৮০৯ সালের বিচার বিভাগের নথিতে। সরকারি কর্মচারী ফ্রেডারিক হ্যামিলটনকে সম্মান না জানানোর জন্য রামমোহনের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ এনেছিলেন তার উত্তরে রামমোহন প্রশাসনকে যা জানিয়েছিলেন সেখানে পাওয়া যাবে রামমোহনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদার পরিচয়। কোম্পানির এক আমলার উদ্ধত আচরণে আহত রামমোহন তাঁর প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন : '...Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability, whether that respectability be derived from the society in which they born or from birth, fortune or Education.' রামমোহন এই চিঠিতে তাঁর বংশমর্যাদা পিতামহ, পিতার কর্ম জীবনের কথা সরকারকে জানিয়েছিলেন (বিচার (ক্রিমিন্যাল) জুন ১২, ১৮০৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৬)।

রামমোহন কেন্দ্রিক এই সময়ের সমাজ জীবনে আলোড়ন উঠেছিল ১৮২০ সালের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে। বাঙালি সমাজ এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসককুল যে খুব শান্তিতে ছিল এমন বলা যায় না। সতীদাহ প্রথায় আঘাত দিতে তারা ইতস্তত করছিল। তবুও রামমোহনের আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা যে হ্রাস পাচ্ছিল এমন সংবাদ সরকারের কাছে ছিল, ১৮২৮ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে আমহার্স্টের উত্তরসূরি লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেনডিস বেন্টিঙ্ক অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন। মনেপ্রাণে উদারপন্থী বেন্টিঙ্ক বুঝেছিলেন এই ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা কোনো অর্থেই আদিম বর্বরতার তুলনায় কম না। কোনো সভ্য দেশ এই প্রথা বরদাস্ত করতে পারে না। সুতরাং বেন্টিঙ্ক ভেবেছিলেন যত দ্রুত এই প্রথা রোধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় ততই মঙ্গল। গভর্নর জেনারেলের স্বাক্ষরিত সরকারি বক্তব্য আমরা খুঁজে পাব বিচাব বিভাগের নথিতে (বিচার (ক্রিমিন্যাল) ডিসেম্বর ৪, ১৮২৯, ক্রমিক সংখ্যা ১০)।

গুণগত দিক থেকে মিল না থাকলেও সরকার বিরোধী আন্দোলন হিসেবে ১৮৩০ সালে তিতুমিরের আন্দোলন কোম্পানি রাজত্বের শেষ দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ কোম্পানিকে প্রথমে বিরক্ত পরে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। আমরা প্রথমে তিতুমিরের কথা লিখতে পারি।

১৮৩২ সালের বিচার বিভাগের (ক্রিমিন্যাল) শাখার নথিতে পাওয়া যায় যে এই

সময় নিসার আলি বা তিতুমির তাঁর নিজস্ব লোকজন সংঘবন্ধ করতে শুরু করছিলেন, জমিদার—অবশ্যই সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে। এই বিদ্রোহ দমন করতে অবশ্য সরকারের অসুবিধে হয়নি (ওই, এপ্রিল ৩, ১৮৩২, ক্রমিক সংখ্যা ৫)। আরও তথ্য আছে এই শাখায়। বিদ্রোহী থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি কোম্পানির এক অনুগত মানুষের দিকে।

রামমোহনের কথা লিখেছি। রামমোহনের অনুগামীর কথা লেখা যায়। এই অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এই যুবরাজ একই সঙ্গে জমিদার ও শিল্পপতি ছিলেন। জমিদারদের কাছে শিল্পপতি আর শিল্পপতিদের কাছে জমিদার হিসেবে তাঁর পরিচয় ছিল।

ঠাকুর পরিবারের বিরাট বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী হলেও দ্বারকানাথ সরকারি চাকরির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন সরকারি চাকুরিয়া হিসাবে কোম্পানির রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা অনিবার্যভাবেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের পথ মসৃণ করে তুলবে।

১৮২২ সালে আঠাশ বছর বয়সে দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার 'সল্ট এজেন্সি'র সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। তাঁকে এই পদে নিয়োগের সুপারিশ করে চব্বিশ পরগনার সল্ট এজেন্ট ট্রেভর প্লাউডেন সরাসরি লিখেছিলেন : '...a native of very high character and respectability .. he is a person of good education and fully qualified for the situation to which he is nominated.' (বোর্ড অভ কাস্টমস (সল্ট অ্যান্ড ওপিয়াম) সল্ট প্রসিডিংস, মার্চ ১৪, ১৮২৩, ক্রমিক সংখ্যা ২১)। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বরে দ্বারকানাথ ওই বোর্ডের দেওয়ান পদে উন্নীত হন, অবশ্যই এটা তাঁর কর্মদক্ষতার নমুনা। বোর্ডের অন্যতম সদস্য এইচ. এম. পার্কার এই সময় তাঁর এক প্রতিবেদনে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা সরকারি কর্মী হিসেবে দ্বারকানাথের মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট। '.. I do not hesitate to say, the integrity of Dwarakanath Tagore, without which I should in all probability have struggled in vain against the difficulties into which the Deptt. have plunged.' (ওই, মার্চ ১, ১৮৩৪ পার্কারের মিনিট)। বস্তুত কাস্টমস, সল্ট ওপিয়াম পর্ষদের নথিতে দ্বারকানাথেব ওপর বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে তিনি কীভাবে সেরেস্তাদার দেওয়ান হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে সরকার খুশি হয়েছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ খুশি হতে পারেননি। চব্বিশ পরগনার কিছু মানুষ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে সরকারের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। ফলত এই সমস্ত তথ্য গ্রাম বাংলার একটা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা অবহিত করে (ওই, এপ্রিল ১৫, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ৪১—৪৪)। ১৮৩৪ সালের আগস্ট ১, দ্বারকানাথ সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর জায়গায় এলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর (ওই, আগস্ট ৮, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ১৫)।

দ্বারকানাথ পারিবারিক সূত্রে এক বিরাট জমিদারি পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন শাখায় যে বিশাল জমিদারি ছড়িয়েছিল, দ্বারকানাথ সেই সমস্ত জমিদারি পরিচালনায় প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মূলত 'Estate Manager'-এর দায়িত্ব পালন করতেন। নিম্ন বঙ্গে সরকারি রাজস্বের মোট আয়ের এক পঞ্চমাংশ তাঁকেই দিতে হত। (বিচার (ক্রিমিন্যাল) বিভাগ, ডিসেম্বর ১৫, ১৮৪০, ক্রমিক সংখ্যা ১–৩)।

ওই সময়ের আর এক জমিদার নন্দনের কথা লেখা যায়। রামমোহন, দ্বারকানাথের মতন উল্লেখযোগ্য না হলেও বা অনেক ক্ষেত্রেই রামমোহন দ্বারকানাথের বিপরীত মেরুতে আসীন হলেও রাধাকান্ত দেব এই সময়ে বাংলা দেশের সমাজ জীবনে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র ছিলেন। ঐতিহ্য আশ্রয়ী রাধাকান্ত দেব সমাজের প্রাগ্রসর ভাবনাচিন্তাকে দেশজ আলোয় দেখতে চেয়েছিলেন। সরকারি নথিতে ১৮২০–৩০ সালের কালে তাঁর সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই আছে। বিচার বিভাগের ক্রিমিন্যাল শাখার নথিতে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা অবসানের প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে। সতীদাহ প্রথা অবসানের পর ১৮৩০ সালে রাধাকান্ত যে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন সে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তথ্য আছে এই শাখারই ওই সময়ের নথিতে। রাধাকান্ত দেবের অন্য পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

বাংলা দেশে চা উৎপাদন ও প্রচলনে রাধাকান্তকে পথিকৃতের ভূমিকা দেওয়া যায়। ১৮৩৪ সালে রাজস্ব দপ্তরের 'টি কমিটি'র সচিব জে. গর্ডনকে লেখা তাঁর এই সময়ের চিঠি থেকে জানা যায় এই বিষয়ে তাঁর ধারণা কত স্বচ্ছ ছিল। এই চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন ধরনের চা-এর উৎপাদনে কোন অঞ্চল, কী ধরনের মাটি, আবহাওয়া দরকার (রাজস্ব পর্ষদ, মার্চ ৭, ১৮৩৪, ক্রমিক সংখ্যা ১০)।

ভারতবর্ষে চা উৎপাদনে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক উৎসাহী ছিলেন। পূর্বোক্ত 'টি কমিটি' তিনিই তৈরি করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল '...To promote the introduction of Tea Cultivation in to India.' চায়না থেকে চা-এর বীজ ও দক্ষ শ্রমিক আনা হয়। আসামে চা উৎপাদন নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় (রাজস্ব দপ্তর, ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৩৪, গভর্নর জেনারেলের চিঠি, ক্রমিক সংখ্যা ১৭৩)।

কোম্পানি প্রশাসন, ১৭৭০ সাল থেকে নানা দপ্তর, শাখাপ্রশাখায় নানা দিকে ছড়িয়ে নিঃসন্দেহে দলিল দস্তাবেজের জগতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, আরও সহজে লেখা যায় নতুন নতুন দপ্তরভুক্ত শাখা, উপশাখা নিশ্চিতভাবে দলিলপত্রের ধূসর জগতে এক নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছিল। এক ভিনদেশি শাসক গোষ্ঠীর প্রশাসনিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পূর্বতন দেশীয় শাসন পদ্ধতির পার্থক্য অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমরা ডাক বিভাগের কথা লিখতে পারি। শুরু থেকে এই বিভাগ সরকারের জেনারেল বা সাধারণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২০ সালে গভর্নর জেনারেল তাঁর এক আদেশ বলে ডাক বিভাগের দপ্তর বদল ঘটান। ডাক বিভাগ এল রাজস্ব পর্ষদের অধীনে।

১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখে লেখা চিঠিতে গভর্নর জেনারেল উল্লেখ করেছিলেন কেন ও কোন কারণে এই দপ্তর বদল করা জরুরি হয়ে উঠেছে। মার্চ ২০, ১৮২০ সাল থেকে ডাক বিভাগের কাগজপত্র-কার্য বিবরণী ইত্যাদি আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৯ সালের 'রেগুলেশন-১' অনুসারে রাজস্ব পর্ষদের নতুন নাম হয় 'সদর বোর্ড'।

ওই সমস্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা বাদ দিয়েও বলা চলে ডাক বিভাগের ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি। ডাক হরকরাদের কাহিনি, বা গ্রামাঞ্চলের ডাক পিয়নদের কথা আছে রাজস্ব দপ্তরের নথিতে। জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে 'রানার' ছুটে চলার কাহিনি আমাদের রোমাঞ্চিত করে—হয়তো বা ব্যথিত।

রাজস্ব দপ্তরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রের কথা আমি উল্লেখ করেছি। দু-চারটি নতুন বিষয়ের উল্লেখ করব আবার। যেমন ১৮২৫ সালে মে ও জুন মাসে রাজস্ব দপ্তরের কার্যবিবরণীতে (১৮ ও ১২–১৯) কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এই পরিকল্পনা করেছিল জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি।

কোম্পানির ১৮৩৩ সালে চার্টার অ্যাক্টের পর ঔপনিবেশিক প্রশাসনে ভারতীয়দের যোগদানের সুযোগ বৃদ্ধি হয়। এক অর্থে যা ছিল কোম্পানি প্রশাসনের ভারতীয়করণ। তৈরি হয় নতুন সরকারি পদ : 'ডেপুটি কালেক্টর'। রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে এই পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এই সমস্ত প্রার্থীদের সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মতন হিন্দু কলেজের তুখোড় ছাত্র। ডেপুটি পদই কোম্পানি আমলে ভারতীয়দের জন্য সৃষ্ট সর্বোচ্চ পদ। রাজস্ব দপ্তরের ১৮৩৩-৩৪ সালের পরবর্তী সময়ের কাগজপত্রে ডেপুটি পদপ্রার্থীদের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থাৎ ছাত্রদের পারিবারিক, সামাজিক পরিচয় (বর্ণ উল্লেখ করে) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রাক্-ডেপুটি যুগে বিচার বিভাগে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ পদ ছিল 'প্রিন্সিপাল সদর আমিন'—প্রিন্সিপাল সদর আমিনদের বিষয়ে জানা যাবে বিচার বিভাগ (সিভিল)-এর ১৮৩০-৩১ সালের নথিপত্রে, ফলত এই দুই দপ্তরের নথিতে বাঙালি মধ্যবর্তী শ্রেণির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাবে। সরকারি চাকুরি-নির্ভর বাঙালি মধ্যবর্তী শ্রেণি (সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'অকুপেশনাল গ্রুপ') সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের পরিচয় বিচার ও রাজস্ব দপ্তরের নথিতে পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আমলের একাধিক প্রধান-প্রধান দপ্তরের মধ্যে সাধারণ বিভাগ বা জেনারেল ডিপার্টমেন্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। চাকুরি-নির্ভর একটা সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখানে যে ধরনের তথ্য আছে তা সব সময়েই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

সাধারণ বিভাগ স্থাপিত হয় ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর ২৩-এ। প্রথমে এই দপ্তর

জনস্বার্থ সম্পর্কিত (রাজনীতি বহির্ভূত) বিষয়গুলির ওপর নজরদারি করত। শুরুতে সাধারণ বিভাগ 'পাবলিক ডিপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত ছিল। ১৮১৮ সালের জুন মাসে এই পাবলিক ডিপার্টমেন্ট সাধারণ বা জেনারেল ডিপার্টমেন্ট নামে পরিচিত হল। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত (১৭৮৩ থেকে) এই বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ে রাখা আছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই বিভাগের নথিপত্র দেখা জরুরি।

এই দপ্তরের নথিতে ১৮৩৪ সাল থেকে পাওয়া যাবে শিক্ষা, চিকিৎসা, ডাক, মুদ্রণ, সংবাদপত্র ও বিদেশের ভারতীয়দের কুলি হিসাবে পাঠানোর মতন ঘটনাবলি।

বিশদভাবে লেখা যায় মহাফেজখানার সংরক্ষিত সাধারণ বিভাগের নথিতে পাওয়া যাবে (১) শিক্ষক, (২) চিকিৎসক অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক গোষ্ঠীর কথা। এই দুই গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্য ব্যর্থতা ও তজ্জনিত কারণে তাদের ক্ষোভ অনেক নজির এই দপ্তরের দলিলপত্রে পাওয়া যায়।

এই বিভাগের জুলাই ১৮৩৬ সালের নথিতে পাওয়া যাবে কলকাতার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে জমি চেয়ে রসময় দত্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের আবেদন (সাধারণ বিভাগ জুলাই ২০, ১৮৩৮, ক্রমিক সংখ্যা ১২)। শর্তাধীনে সরকারের পক্ষ থেকে ট্যাংক স্কোয়ারে (বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার) স্যার চার্লস মেটকাফের স্মরণে গ্রন্থাগার ভবন গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (ওই, মে ২৭, ১৮৪০, ক্রমিক সংখ্যা ১৮)।

উনিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছরে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বোধকরি শিক্ষকতার জন্য বাঙালি যুবকদের আবেদন। ফলত এই সমস্যা শুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদের নিয়ে। উল্লেখ করতে পারি, ১৮২৮ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সুদূর আগ্রা স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু পাননি। একটা পদের জন্য একাধিক শিক্ষিত যুবকের ছুটে যাওয়া এবং শেষে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অনেকের ফিরে আসার মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের হতাশা, ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল।

১৮৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাজশাহির রামপুর-বোয়ালিয়া স্কুলে পণ্ডিতদের পদে নিয়োগের সংবাদে জানা যায় ওই পদের জন্য একাধিক আবেদন পড়েছিল। আবেদনকারীদের কয়েকজন দূর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, একজন আবেদনকারী এসেছিলেন সুদূর ঢাকা থেকে (ওই, জানুয়ারি ২৯, ১৮৪৪)।

শিক্ষিত তরুণদের সামনে শুধু চাকরি পাওয়াই সমস্যা ছিল না, স্বল্প বেতনের জন্য তারা যে এই পদ নিয়ে খুশি থাকতে পারতেন না এমন উদাহরণ দেওয়া যায়। আমরা রামতনু লাহিড়ীর কথা লিখতে পারি।

১৮৪৬ সালের জানুয়ারি ২৭-এ হিন্দু কলেজ থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হওয়ার পর রামতনু লাহিড়ীর মাস মাহিনা কমে যায়। ক্ষুব্ধ রামতনু সরকারের কাছে বেশি বেতন চেয়ে আবেদন রাখেন (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ২০)।

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি বিক্ষিপ্ত বলে আমরা বাতিল করতে পারি না। সাধারণ বিভাগের এমন অনেক আবেদন নিবেদন পাওয়া যাবে যা থেকে আমাদের পক্ষে চাকুরিজীবী শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের ১৮৪০ সালের কালে হতাশার আলেখ্য তৈরি করতে পারা যায়। সূচনা পর্ব থেকে শিক্ষিত বাঙালিরা যোগ্যতা অনুযায়ী যেমন কাজ পাননি তেমনই পদ অনুযায়ী বেতনও মিলত না তাঁদের।

সাধারণ বিভাগের নথিপত্র দেখলে এই সময় বাংলা দেশের স্কুল ও শিক্ষকদের হালহকিকত জানতে পারা যায়। ১৮৪৮ সালের সাধারণ বিভাগের এক প্রতিবেদন থেকে বাংলা বিভাগের সরকারি ও অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা জানতে পারি। এই প্রতিবেদন থেকে আমরা জেনেছি ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা বিভাগের (১) সরকারি-বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা (২) শিক্ষকদের সংখ্যা (৩) মাস মাহিনা (৪) বয়স ও তাদের নিযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৪৮, ক্রমিক সংখ্যা ৫১)।

ওই বিভাগের নথির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে বাঙালি চিকিৎসকদের কথা। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলার ঐতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদ্য ও হেকিমি প্রথায়, যে গুণগত পরিবর্তন এসেছিল তার পূর্ণ পরিচয় আছে এই বিভাগের নথিতে। বিশেষ করে বাঙালি চিকিৎসকদের সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে এখানে। মেডিকেল কলেজের সফল ছাত্ররা সরকারি চাকরিতে যোগ দিযে সাব অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন নামে পরিচিত হতেন। এঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরি নিয়ে যেতেন।

ওই বিভাগের মে ১৮৪৭ সালের নথি থেকে আমরা খবর পাব চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডনে পাঠরত চার ছাত্রের কথা। তীক্ষ্ণ অধ্যবসায় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কঠোর অনুশীলনে এঁরা মুগ্ধ করেছিলেন লন্ডনে এঁদেরই অভিভাবক ও শিক্ষক ডাক্তার এইচ. এইচ. গুডিবকে। তিনি এইসময তাঁর এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন : '...It is first occasion on which they have had an opportunity of showing publicly their capacity for acquiring the sciences and professional knowledge of the western world and that in such contests they are equal to the European fellow subjects ' (ওই, মে ২৬, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭)।

এই চার ছাত্র : দ্বারকানাথ বসু, ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী (বিদেশে পাড়ি দেওয়া প্রথম ভারতীয় ছাত্র)। উদাহরণ না বাড়িয়ে বরং অন্য তথ্যের স্বাদ নেওযা যাক।

১৮৫০ সালের দশক বাংলা দেশ একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনায় সমৃদ্ধ। সরকার বিরোধী রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পাশে ছিল সামাজিক পট পরিবর্তনে এক রাজকীয় পদক্ষেপ : বৌদ্ধিক চিন্তা চেতনার সর্বোচ্চ আধার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মতো ঘটনা। কলকাতার চিন্তাভাবনার রাজ্যে এ সমস্ত ঘটনা অবশ্যই পালা বদল সূচিত করেছিল।

আমি সতীদাহ নিয়ে সরকারি ভাবনার কথা লিখেছি। সতীদাহ অবসানের

অনেকদিন পর এমন প্রশ্ন তোলা অসংগত ছিল না বোধকরি, যে বাল্য বিধবাদের ভবিষ্যৎ কী! সতীদাহ অবসানের বেশ কিছু বছর পর এই সমস্যা মেটাতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আদ্যন্ত মানবিক এই মানুষটিকে সরকার শ্রদ্ধা ও ভয় করতেন।

বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনার সামাজিক উপযোগিতা মেনে নিয়ে বিধবাবিবাহ আইন গ্রহণ করার আগে সরকার জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেছিল। প্রস্তাবিত আইন সকলের কাছে কী গ্রহণীয় হবে? এমন ভাবনা কোম্পানির রাজপুরুষদের বাধ্য করেছিল বিচারকদের মতামত নিতে। বিধবাবিবাহ বিষয়ক এই ধরনের যাবতীয় তথ্যের হদিস পাওয়া যাবে বিচার ও সাধারণ বিভাগেব নথিপত্রে, বিশেষ করে ১৮৫৫–৫৭ সালের কাগজপত্রে। বিধবাবিবাহ নিয়ে বিচারকদের অভিমতের সন্ধান পাওয়া যাবে সাধারণ (সাধারণ) বিভাগের নথিতে (সাধারণ, আগস্ট ৭, ১৮৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ১৬)।

বিধবাবিবাহ আইন বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে বড়োমাপের ঘটনা, বড়ো ভাবনার জয়। অনেকদিন আগে স্বয়ং রামমোহন যেমন আমাদের অন্ধকারের জগৎটা মুছে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি ১৮৫০ সালের কালে বিদ্যাসাগর সেই কাজটিই করতে এগিয়ে আসেন। সামাজিক কল্যাণে সরকারি সাহায্য নিতে রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগবের আপত্তি ছিল না।

বিধবাবিবাহের কথা থাক। সাধারণ বিভাগের আরও কিছু জরুরি তথ্যের সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। ১৮১৭ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছর পর কলকাতায় গড়ে উঠল উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই সময়ের মধ্যে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল নানা গুণমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলা দেশের ঐতিহ্য অধ্যুষিত মাটি উচ্চশিক্ষার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। পাঠশালা-বিদ্যালয়-উচ্চবিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধিক চর্চার এই অগ্রগতি অবশ্যই এই সময়ের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

সাধারণ বিভাগের এপ্রিল ১৮৫৪ সালের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা নিয়ে রামগোপাল ঘোষের প্রতিবেদন, পরের বছরের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকার এগিয়ে আসছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, পিযারীচরণ সরকার, প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র কলকাতায় শিল্প মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য সরকারি সাহায্যের যে আবেদন করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এই বিভাগের ১৮৫৫ সালের কার্যবিবরণীতে (ওই, মে ১৫, ১৮৫৫, ক্রমিক সংখ্যা ৭৩)। এই প্রস্তাবের পক্ষে সিসিল বিডনের অভিমত আছে।

১৮৫৬ সালে কলকাতায় প্রথম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার সংবাদ পাওয়া যাবে ওই বিভাগের নভেম্বরের কার্য বিবরণীতে (ওই, নভেম্বর ২৭, ১৮৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ৯৬–৯৭), ১৮৫৭ সালে কলকাতায় গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বিপুল তথ্য নথিবন্ধ আছে সাধারণ বিভাগের এই সময়ের প্রতিবেদনে (ওই, এপ্রিল ২, ১৮৫৭, ক্রমিক সংখ্যা ৬১–৬৩ ও ৬৯)। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম অধিবেশনের কথা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর কোম্পানি রাজত্বের শেষ। কলকাতার বাইরের জগতে তখন কি চলছিল? ঔপনিবেশিক শাসন নানাভাবে সুদৃঢ় করার পাশে ছিল অখ্যাত কিছু মানুষজনের ক্ষোভ। বিদ্রোহ নয়? তিতুমিরের আন্দোলনের ঠিক তেইশ বছর পর দক্ষিণবঙ্গো কোম্পানি শাসন এক মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয় যা বোধ করি তাদের কল্পনায় ছিল না। বীরভূমে এসময় শুরু হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। দুস্থ সহায়সম্বলহীন অর্ধভুক্ত সাঁওতালরা কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল তার উপমা ইতিহাসে খুব বেশি নেই; থাকলেও এতে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব হ্রাস পাবে না।

সাঁওতাল বিদ্রোহের খবর পাওয়া যাবে বিচার বিভাগের নথিতে। রাজমহল সাহেবদের কাছে ঠাকুরের 'পরোয়ানা' পাঠিয়ে দুই সাঁওতাল বিদ্রোহী যুবক সিধু ও কানহু জানিয়েছিলেন : '. .The Thakoor has descended in the house of Sedoo Majhee...you sahib and solidiers fight with Thakoor himself... Mother Ganges will come to Thakoor's assistance.' (বিচার বিভাগ, অক্টোবর ৪, ১৮৫৫ ক্রমিক সংখ্যা ২০)।

সাহেবরা সিধু কানহু'র পরোয়ানায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল? ভয় না পেলেও কিছুটা বিব্রত হয়েছিল। সাঁওতালদের বিরুদ্ধে শুরু হয় সামরিক অভিযান। সরকারের নির্দেশ ছিল : '...the operations must be carried with trained troops.' (ওই ক্রমিক সংখ্যা ১১৯, ১২০)। ওই প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে রিচার্ডসনের তৈরি এই বিদ্রোহ ধ্বংসের রূপরেখা যেখানে দেখানো আছে কোম্পানির সিপাহি বিদ্রোহ দমনের নকশা (ওই, ক্রমিক সংখ্যা ১১৯–১২০)।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সফল হয়নি। কানহু ধরা পড়েছিল। বিচার বিভাগের ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে কানহু সাঁওতালের বক্তব্য আছে। কানহু'র কথায় শিহরন জাগে আজও (বিচার বিভাগ, ডিসেম্বর ২০, ১৮৫৫. ক্রমিক সংখ্যা ১৩১–১৩২)।

সাঁওতালদের কোম্পানি বিরোধী তীক্ষ্ণ মাদল ধ্বনি থামতে না থামতেই অশান্ত হল কোম্পানির বেতনভোগী সিপাহিরা। নানা কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সেনা ছাউনিতে নানা ধর্ম বর্ণের ভারতীয় সৈনিক সর্বশক্তিমান কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পলাশি যুদ্ধের একশো বছর উদ্‌যাপন করল বলা যায়। ভিনদেশি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সার্বিক আন্দোলন। বিদ্রোহের আগে অন্য তথ্য দেখা যাক।

১৮৫৭-এ হুগলি নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। তখনই কী পলি জমে নদীর যাত্রাপথ বুদ্ধ হয়ে পড়ছিল? এমনই নদীর ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়ে—গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে এই বিভাগেরই এপ্রিলের কার্য বিবরণীতে (ক্রমিক সংখ্যা ৩৮)।

সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে বিচার বিভাগের নথিপত্রে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যাবে। সমস্ত তথ্যের বিবরণ দেওয়া সম্ভব না। কয়েকটি উল্লেখ করব। বাংলা বিভাগের হাজারিবাগ, বাঁকুড়া, বর্ধমান, কলকাতা ও ঢাকায় যে ব্যাপক সেনা বিদ্রোহ ঘটেছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে বিচার বিভাগের ১৮৫৭ সালের (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) নথিপত্রে।

যশোহরের কোম্পানির সেনা ছাউনির একজন বিদ্রোহী, সিপাহি নিধিরামকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপে প্ররোচিত করার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যাবে এই বিভাগের নভেম্বরের কার্যবিবরণীতে (ওই, ক্রমিক সংখ্যা ১৮২)। অখ্যাত অজ্ঞাত এক সৈনিক ভিনদেশি শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন। কেন-না পরাধীনতা তাঁর পছন্দের ছিল না। সর্বত্রই এমন কিছু ঘটলে ইতিহাস অন্য খাতে বইত।

ওই স্বপ্নের অন্য দিক ছিল। বাঁকুড়ার কিছু মানুষ পরাধীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনও লক্ষ্মণরেখা টানতে প্রস্তুত ছিল না। বাঁকুড়ার 'সোনামুখী ক্লাব'-এর সদস্যরা ওই বিদ্রোহকে কি চোখে দেখেছিল? বিচার বিভাগের নথিতে পাওয়া যাবে : '.. The president of the Sonamukhi Club deeply affected at the ungrateful conduct of the sepoys at Meerut ' (ওই, আগস্ট ১০, ক্রমিক সংখ্যা ১৪৫–১৪৬)। ইতিহাস আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝে মজা করে।

৩

সাধারণ পর্ষদ : জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন

আমাদের নথির ইতিহাস থেকে বলা যায় শিক্ষা সংক্রান্ত স্বল্প কিছু তথ্যের সন্ধান মিলবে রাজস্ব দপ্তরের ১৭৮০'র ও পরবর্তীকালের দলিলপত্রে। কেন 'শিক্ষা'র মতন বিষয় রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার উত্তর আমাদের জানা নেই। ১৭৮০তে কলকাতা মাদ্রাসা নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস যে শ্বেতপত্র রচনা করেন তার সন্ধান মিলবে রাজস্ব দপ্তরের এই সময়ের নথিতে। নবাবি আমলের আইন কানুন তখনও বাতিল হয়নি বলেই গভর্নর জেনারেল কলকাতা মাদ্রাসা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি জানতেন কোম্পানির বিচার বিভাগে কলকাতা মাদ্রাসায় পড়া ছেলেদের দরকার হবে বেশি। হেস্টিংসের ভাবনায় ভুল ছিল না।

তবু পরিবর্তন যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন তাকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যায় না। কোম্পানির শাসকগোষ্ঠী, ওয়ারেন হেস্টিংসের উত্তরসূরিরা, উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষেই বুঝেছিল পূর্বাঞ্চলের এই শহর ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠবে, যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ১৮১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। স্কুলের প্রতি কলকাতার বাঙালিদের উৎসাহ দেখে বোঝা গিয়েছিল এই ভিনদেশি শিক্ষা গ্রহণে তাদের আদৌ কোনো দ্বিধা নেই, বরং তারা একটু বেশি উৎসাহী। শিক্ষার জন্য ভিন্ন ও স্বাধীন সংস্থার প্রয়োজন।

সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে কোম্পানির টেরিটোরিয়াল রেভিন্যুর সচিব হল্ট ম্যাকেনজি সরকারের কাছে পাঠানো তাঁর এক স্মারকে শিক্ষা পর্ষদ গড়ার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন সরকার তা মেনে নিয়েছিল। ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের এক সিদ্ধান্তে ম্যাকেনজির প্রস্তাব মতন শিক্ষা পর্ষদ গঠনের সংবাদ পাই আমরা। এই পর্ষদ গঠনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকত দেখা।

ন'জনের ওই শিক্ষা পর্ষদের নাম হল 'জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন', সদস্যদের অনেকেই ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ। এই শিক্ষা পর্ষদের অস্তিত্ব ছিল ১৮৪২ সালের জুলাই ১০ পর্যন্ত। জেনারেল কমিটির এরপর নাম হয় 'কাউন্সিল অভ এডুকেশন'।

জেনারেল কমিটির তত্ত্বাবধানে বাংলা বিভাগের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানান ধরনের ইংরাজি, বাংলা স্কুল। মনে হবে জেনারেল কমিটির হাতে বাংলা বিভাগে শিক্ষায় জোয়ার এসেছে। কোথায় পূর্ব বাংলার কুমিল্লা আর কোথায় পশ্চিম ভারতের আজমির, হোসেঙ্গাবাদ। সব অঞ্চলের মানুষজন কোম্পানি বাহাদুরের বদান্যতায় গড়ে ওঠা এই সমস্ত স্কুল, বিদ্যাযতনে হয়তো-বা কিছুটা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকত। এই সমস্ত স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও পারসি ভাষার চর্চা হত। জেনারেল কমিটির প্রতিবেদনে সাধারণভাবে পাওয়া যাবে এই সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা, সাধারণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া, শিক্ষকদের 'মাস' মাহিনা, শিক্ষক ছাত্রদের সামাজিক অবস্থানের পরিচয় ইত্যাদি।

১৮২৩ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত এই আঠারো বছরের ইতিহাসে বাংলা বিভাগ ও উত্তর ভারত জুড়ে যে শুধু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে পরিচিত হই তা নয়, আমরা এই সময়ের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নতুন নতুন হদিসও পেতে শুরু করি। জেনারেল কমিটির নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের শিকড়, 'শিক্ষা' নিশ্চিতভাবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের পথ হয়ে উঠেছিল। তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা ১৮২৮ সাল থেকে বাংলা দেশ ছাড়িয়ে দেশের অন্যত্র ছুটেছিল চাকরি বা শিক্ষকতার আশায়।

জেনারেল কমিটির 'কপি বুক অভ লেটারস' এই শিরোনামে রক্ষিত ১৮২৮–৩০ সালের নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি ১৮২৮ সালে আগ্রা স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের পদে অনেকের সঙ্গে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জেনারেল কমিটির কাছে পাঠানো তার বিশেষ একটি আবেদনপত্রে নিয়োগকর্তাদের জানিয়েছিলেন ওই পদের মৌখিক পরীক্ষার দিন যেন আশ্বিন মাসে ফেলা হয়, তাঁর পক্ষে ভাদ্র মাসে বাড়ি থেকে আগ্রায় যাত্রা করা সম্ভব হবে না।

ডিরোজিয়োর অন্যতম ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণমোহনের এই অনুরোধপত্র কী প্রমাণ করে? কৃষ্ণমোহন তাঁর এই অনুরোধপত্রে জানিয়েছিলেন তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁর পক্ষে হিন্দু

শাস্ত্র অনুযায়ী ভাদ্র মাসে কোনো কারণে 'গৃহত্যাগ' সম্ভব নয়। এই ধরনের চাকরির আবেদনপত্র ও বিখ্যাত শিক্ষকদের দেওয়া শংসাপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি জেনারেল কমিটির কাগজপত্র থেকে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ১৮২৩ সালের শেষের দিকে কলকাতায় যে সংস্কৃত কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন রায়। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে এই সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে রামমোহন তাঁর ক্ষোভ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন (জি. সি. পি. আই জুলাই ৩১, ১৮২৩, ডিসেম্বর ৩, ১৮২৪, খণ্ড ১)। রামমোহনের ওই চিঠি সরকারি মহলে ঝড় তুলেছিল।

সরকারের উপ-পারসিয়ান সচিব জেনারেল কমিটিকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে সংস্কৃত সম্বন্ধে রামমোহন এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন চিঠি লিখেছেন : ক্ষুব্ধ উপ-সচিব জেনারেল কমিটিকে পাঠানো তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'The letter of Rammohun Ray is not considered to call for any answer on the part of Government' (ওই)।

১৮২৩—৩০ সালের মধ্যে জেনারেল কমিটির কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারব ঐতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা আর সামাজিক আচার ব্যবহারের ওপর ইংরেজি শিক্ষা কত সূক্ষ্মভাবে তার প্রভাব ফেলে চলেছিল। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে জেনারেল কমিটির নথিপত্রে এই সংস্থার শেষ দিন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বা ইংরেজি শিক্ষার আশীর্বাদ নিয়ে কীভাবে শিক্ষিত যুবকরা চাকরির খোঁজে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল সে সমস্ত সংবাদ জেনারেল কমিটির নথি থেকে পাওয়া যাবে। এখানে আরও কিছু সংবাদ জেনারেল কমিটির নথি থেকে নেওয়া যেতে পারে। ১৮২২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের অন্যতম শাখা হিসেবে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে বৈদ্যক ও ইউনানি শ্রেণি খোলা হয়। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে জেনারেল কমিটির নথিপত্রে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অবশ্যই বাংলার 'রক্ষণশীল' সমাজকে নতুন করে দেখার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা বিশেষভাবে নজর রাখব সংস্কৃত কলেজে পাঠরত বৈদ্যক ও মাদ্রাসার ইউনানি শ্রেণির ছাত্রদের ওপর। এই দুই শ্রেণির ছাত্ররা রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে শারীরবিদ্যা বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা এই সময়ের ক্রমবর্ধমান সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় রাখে।

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা আপাত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে অথচ শঙ্কিত চিত্তে মৃত পশুদেহ ব্যবচ্ছেদে যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে জেনারেল কমিটির প্রতিবেদনে। নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের সুপার জন টাইটলার সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণির ছাত্রদের বিষয়ে এই সময়ে তাঁর এক প্রতিবেদনে লেখেন : '...I find the young men exceedingly desirous of profiting by my lessons.' টাইটলার তাঁর প্রতিবেদনে বৈদ্যক শ্রেণির ছাত্রদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছিলেন (জি. সি. পি. আই সেপ্টেম্বর ১৮২৬-ফেব্রুয়ারি ১৮২৮, পার্ট ৩, খণ্ড ৬)।

অন্যদিকে কলকাতা মাদ্রাসার ইউনানি শ্রেণির ছাত্রদের ড. রাসেলও তাঁর প্রতিবেদনে প্রশংসা করেছিলেন।

১৮৩০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৫ সালের জুন মাসে জেনারেল কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলেজ গড়ে উঠেছিল। বাংলা দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে পালা বদলের সূচনা হল এইভাবে। জেনারেল কমিটির এই সময়ের নথিতে মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। শুধু প্রশ্ন উঠছিল শিক্ষা মাধ্যম নিয়ে। জেনারেল কমিটির সদস্যরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্যতম সদস্য ট্রেভেলিযনের প্রশ্ন ছিল · বিদেশি ভাষায় লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কোন পুস্তক বাংলা, ফারসি বা হিন্দুস্থানি ভাষায় অনুবাদ করে ছাত্রদের পড়ানো হবে? (জি. সি. পি. আই, ১৮৩১-১৮৩৩, (৩) মিনিট, সি. ই. ট্রেভেলিয়ন)। ট্রেভেলিয়নের মিনিটে বিস্তারিতভাবে আলোচনা আছে কোন প্রেক্ষাপটে ইংরেজিকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনেব অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

একথা নিশ্চিতভাবে লেখা যায় ১৮২৩—১৮৪২ সালের মধ্যে ওই কমিটির মূল কার্যবিববণী, এই কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিপত্র, কমিটির বিভিন্ন সদস্যের এই সময়ে লেখা নানান বিষয়ের 'মিনিট', বিভিন্ন স্কুল কলেজের আয়-ব্যয়ের হিসাব, স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারি সাহায্য, শিক্ষকদের বেতন, স্কুল/কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষক পদের জন্য আবেদন ও আরও নানান বিষয়ের তথ্যাবলি থেকে এই সময়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষার হালহকিকত সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। জেনারেল কমিটির বিচিত্র সমস্ত নথিপত্রেব মধ্যে নানা কারণে জরুরি বোধকরি এক খণ্ডে ধরে রাখা 'চাকরির আবেদনপত্রগুলি' ১৮৩৫ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ছ'বছবের শিক্ষক পদের জন্য লেখা এই আবেদনপত্র থেকে চাকুরির জন্য শিক্ষিত তরুণদের ব্যাকুলতা বোঝা যায়। শিক্ষক পদপ্রার্থীরা আবেদনের পক্ষে তাঁদের শিক্ষকদেব শংসাপত্রও পাঠাতেন।

জেনারেল কমিটি গড়ে ওঠার প্রথম আঠারো বছরের এই ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ নয়। তবু অনেক ছোটো বড়ো সংবাদেব সাহায্যে আমরা জেনে যাই আমাদের ঐতিহ্য আশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা অতি দ্রুত পালটিয়ে যাচ্ছে, এক ভিনদেশি ভাষার অমোঘ আকর্ষণে ভেঙে পড়ছে আমাদের আজন্ম লালিত শিক্ষার দেওয়াল।

১৮৪২ সালের ১০ জানুয়ারি গভর্নব জেনারেলের এক আদেশবলে জেনারেল কমিটির অবসান ঘটে, কমিটির আর্থিক দায়ভার নিল সরকার এবং এই কমিটি 'কাউন্সিল অভ এডুকেশন' নামে পরিচিত হল। ১৮৫৫ সাল থেকে এই কাউন্সিল 'ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' হল।

প্রথমে কাউন্সিল, পরে ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নথিপত্রে বাংলাব সমাজ জীবনের ছবি মেলে। আমরা এই দুই বিভাগ/দপ্তরের নথিপত্র থেকে জানতে

পারি কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন বাংলার সমাজ জীবনে আলোড়ন তুলেছিল। ইংরাজি শিক্ষা নেওয়ার কারণ কি? শিক্ষা সংসদের সচিব বাংলা সচিবকে জানিয়েছিলেন : '...It must, however, be confessed that the hope of lucrative employment, rather than any real desire for education in itself mainly induces parents to pay for their children's education' (কার্যবিবরণী ৫, কাউন্সিল অভ এডুকেশন, ফেব্রুয়ারি ৯, ১৮৫৪)।

আবার দক্ষিণবঙ্গের স্কুল পরিদর্শক এম. এইচ. প্রাট লক্ষ করেছিলেন চতুর জমিদার শ্রেণি চাইতেন না যে তাঁদের দরিদ্র অজ্ঞ প্রজা সাধারণ ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠুক। প্রজাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখাই তাদের মনোবাসনা ছিল (দক্ষিণবঙ্গ স্কুল পরিদর্শক এম. এইচ. প্রাটের প্রতিবেদন ডি. পি. আই. ১৯৫৬)।

উপর্যুক্ত প্রধান প্রধান বিভাগ/দপ্তর ভিন্ন মহাফেজখানার সম্পদের মধ্যে কোম্পানি যুগের আরও কয়েকটি দপ্তর (স্বল্প দিনের জন্য হলেও) আমাদের ভাবনায় রাখা যায়। এই সমস্ত দপ্তরের মধ্যে পড়ে : একলেসিয়াসটিক্যাল (১৮৩৪–১৮৫৮), পলিটিক্যাল (১৮৩৪–১৮৫৮), রেলওয়ে (১৮৪৫–১৮৫৫), মেরিন (১৮৩৮–১৮৫৮)। এই সমস্ত বিভাগের তাৎক্ষণিক গুরুত্বের ওপর এক ঝলক দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। রেল দপ্তরের কথা লেখা যায়।

৪

রেল দপ্তর

ভারতবর্ষে রেলপথ সূচনার প্রেক্ষাপটে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের রেল বিভাগ গড়ে ওঠে ১৮৪৫ সালে। মে ১৮৫৫ থেকে এই বিভাগ পূর্ত দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়। কয়েকটি জরুরি নথি তথ্যের কথা বলা যায়।

বাংলায় রেলপথ প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তৈরি হয় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি। এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন আর ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন। রেলপথ তৈরি নিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে তিনি এই সময়, সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৪৫, যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে রেলপথ সূচনার অনেক প্রাথমিক তথ্য আছে (রেলওয়ে কার্যবিবরণী, সেপ্টেম্বর ১০, ১৮৪৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০)।

দূরকে নিকট বা পরকে বন্ধু করা নয়, রেলপথ তৈরি আমাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ভৌগোলিক দূরত্বের সমস্যা দূর করে রেলপথ আমাদের আর্থ-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনে। উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর বা আরও দূরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ হওয়ার চেষ্টার মধ্যে প্রমাণ হয়েছিল ভারতবর্ষ নামক উপ-মহাদেশটির দূরতম অঞ্চল আমাদের কাছে চলে আসছে। ভিনদেশি শাসক এর গুরুত্ব বুঝতে পারেনি (ওই, মার্চ ২৬, ১৮৪৬, ক্রমিক সংখ্যা ৫–৬)।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ নির্মাণ বড়ো ধরনের বিপ্লব বলে মনে করা গেলেও, এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপের শরিক বোধহয় গ্রামের সাধারণ মানুষজন হতে পারেনি। রেলপথ তৈরি তাদের অন্ধ চিন্তাভাবনায় ঢেউ তোলেনি, তারা চিন্তিত ছিল তাদের গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে। তাদের জমির ওপর রেল চললে তাদের লাভ কোথায়?

সুতরাং সরকারের রেলওয়ে কমিশনার সি. এ. ওয়াশিংটন বাংলা সরকারের সচিব জে. পি. গ্রান্টকে এপ্রিল ২৫, ১৮৫১ সালে যা জানিয়েছিলেন : '...the land for the most part are sublet in very small portion on permanent leases, are almost without exception in the hands of poor and needy ryots or lakhirajdars without capital who live from hand to mouth and can not afford to cultivate their fields to the best advantage...' (কপি বুক অভ লেটার্স, মার্চ ৩১, ১৮৫১–জুলাই ১৫, ১৮৫১)। অন্য তথ্যের কথা বলি।

ফিভার হসপিটাল কমিটি

আমি লিখেছি গ্রাম কলকাতাকে শহরে উন্নীত করার চেষ্টা শুরু হয় ১৭৭০ সালের যুগে। উনিশ শতকের সূচনায় গভর্নর জেনারেল রিচার্ড কোলি ওয়েলেসলির হাতে গ্রাম কলকাতার শাপমুক্তি ঘটেছিল। কলকাতার সম্ভাব্য নগর উন্নয়ন নিয়ে যুদ্ধবাজ গভর্নর জেনারেল রচনা করেন প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, গড়ে ওঠে কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ (১৮০৪)। বিচার (ক্রিমিন্যাল) বিভাগের নথিপত্র নিয়ে আলোচনার কালে এ বিষয়ে লিখেছি, কলকাতা নিয়ে কোম্পানির চিন্তার শেষ ছিল না।

১৮১৭ সালে কলকাতার জন্য গড়া হল 'লটারি কমিটি'। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এই কমিটি লটারি বিক্রি করে কলকাতা উন্নয়নের অর্থ জোগাড় করত। কলকাতা উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহের এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা হয় খোদ ইংল্যান্ডেই। এই ব্যবস্থা রদ করা ভিন্ন গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের আর কোনো বিকল্প ছিল না। লটারি কমিটি বাতিল করে গড়া হল 'ফিভার হসপিটাল কমিটি'। এই কমিটির প্রধান ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রান্ট, কর্মজীবনে গ্রান্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দশ খণ্ডের নথিবন্ধ (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে) এই বিপুল তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি (১) কলকাতার নগর জীবনের কথা, (২) ফিভার হসপিটাল গড়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনি, (৩) কলকাতা উন্নয়নে এই শহরের বিশিষ্ট মানুষজনের বক্তব্য, (৪) কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কথা, (৫) কলকাতার জঞ্জাল সাফাই, (৬) শহরবাসীদের পরিশ্রুত জল সববরাহের ব্যবস্থা, (৭) কলকাতায় হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ, (৮) কলকাতার কাছের অদূরবর্তী এলাকা—সল্টলেকের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো ইত্যাদি।

দশ খণ্ডের ওই প্রতিবেদনগুলির সঙ্গে আছে ছ'টি পরিশিষ্ট। ওই সমস্ত পরিশিষ্টে কলকাতার নগর জীবনের নানাবিধ তথ্য আছে। শহর কলকাতা বিষয়ক প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে পরিশিষ্ট 'সি'তে।

এই আলোচনা শেষ করব কোম্পানি শাসনে কলকাতা ও লন্ডনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান নিয়ে আলোচনার মধ্যে। কলকাতার শাসক গোষ্ঠীর দায়িত্ব ছিল লন্ডনে অবস্থিত তাদের পরিচালক গোষ্ঠীকে নিয়মিত ভারত বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা। নানান প্রশাসনিক বিষয়, নানান জটিল পদক্ষেপ সম্বন্ধে কোম্পানি শুরুতেই লন্ডনের প্রভুদের অবহিত করে রাখত, লন্ডনকে অগ্রাহ্য করে কলকাতার কোনো কিছু করার ছিল না। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কোম্পানির শাসককুল যাতে কোনো অবাঞ্ছিত অর্থাৎ কোম্পানির স্বার্থবিরোধী কিছুতে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে লন্ডনে কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ মালিক ও অধস্তন কর্মচারী উভয়ের পারস্পরিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত চিঠিপত্রের ঝাঁপি তৈরি হয়েছিল। পরামর্শ চাওয়া ও দেওয়াই ছিল ভারতবর্ষ ও লন্ডনের কর্তব্য বিশেষ। এই সমস্ত চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোম্পানির শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি, কোম্পানির কোনো সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলে লন্ডন থেকে সতর্ক বার্তা পৌঁছে যেত কলকাতায়। লেটারস টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য কোর্ট অভ ডিরেক্টরস—দেখলে এই সমস্ত বিষয় জানা যাবে।

৫

এই আলোচনায় আমি কোম্পানি আমলের প্রধান প্রধান বিভাগের কিছু নথিপত্রের ওপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মূলের খোঁজ করেছি বলেই শাখায় যায়নি। ফলত যা লিখেছি, অসম্পূর্ণ হলেও, প্রধান প্রধান দপ্তরের দু-চারটি নথির সাহায্যে আমি চেষ্টা করেছি এই সমস্ত দপ্তরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে—মনে হতে পারে হাতের তালুতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি দেখা।

১৭৫৮–১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘসময়, অফুরান ঘটনা অনিবার্য পরিবর্তন অসংখ্য কুশীলবদের বিচিত্রতর কর্মকাণ্ডের ছবি এই সমস্ত নথিতে পাওয়া যাবে, সব নথি দেখা যায় না। ইতিহাসের সব উৎসের কি খোঁজ মেলে? মেলে না বলেই ইতিহাস সব সময়েই রহস্যে ঢাকা থাকে—মহাফেজখানাও।

ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র : ১৮৫৯–১৯০০

ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র

১৮৫৮ সালে কোম্পানি রাজত্বের শেষ, ব্রিটিশ রাজের সূচনা। ১৮৫৯ সালে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী উত্তরাধিকার সূত্রে যে প্রশাসনিক কাঠামো পেয়েছিল তারই ওপর গড়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজের ইমারত। কোম্পানি শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও পালা বদলের সুনিশ্চিত হাওয়ায় ব্রিটিশ রাজের স্পর্ধিত অহমিকা কেঁপে উঠত বারেবারে।

১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল বিভাগ ছিল তেরোটি। আর এই সমস্ত বিভাগের শাখাপ্রশাখা ছিল সত্তরটি। প্রশাসনের চাহিদা মতো তৈরি হয়েছিল নতুন নতুন বিভাগ, শাখা যেমন ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে তৈরি হয় বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এই সমস্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখার নথিপত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তা আজও আমাদের সমান মনোযোগী করে রাখে। ঘটনা কত রোমাঞ্চকর ও বহুমাত্রিক হতে পারে তারই নমুনা এই সমস্ত নথিপত্র।

একথা নিঃসন্দেহে লেখা যায় ১৮৫৮ সালের উত্তরকালে ব্রিটিশ রাজকে যে ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হত তার চরিত্র ও গভীরতা কোম্পানি যুগের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের প্রস্তুতি পর্ব যদি হয় কোম্পানি যুগ, তাহলে ব্রিটিশ রাজের আমলে সেই শোষণ শাসন চূড়ান্ত আকার নিয়েছিল। কোম্পানি যুগে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই প্রতিরোধ অনেক বেশি তীব্রতা পেয়েছিল ব্রিটিশ রাজের আমলে। সরকারি নথিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

শুধু প্রতিরোধ বা বিক্ষোভের ইতিহাস নয়, এই সময় আর্থ-সামাজিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে। এখানে যেমন মাত্রা ছাড়ানো শোষণ আছে, তেমনই আছে তীব্র প্রতিরোধ, প্রতিবাদ; এই সময়ে আধুনিক হওয়ার স্বপ্নপূরণের পাশে আছে স্বপ্ন ভাঙার কথা। আসলে শোষণ, শাসন আর স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন চোখে নিয়ে সংগ্রাম প্রতিরোধের কাহিনিতে সমৃদ্ধ এই সময়ের নথিপত্র।

১

বর্তমান আলোচনার প্রথম ভাগে (১৮৫৯–১৯০০) রাজস্ব, বিচার সাধারণ বা জেনারেল, নিয়োগ ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে আলোচনার পর আমি বিশ শতকের নথিপত্রের কথা লিখব। বিশ শতকে প্রথাসিদ্ধ বিষয়ের ওপর নয়, আমি গুরুত্ব দেব মূলত অভিনব ও চিন্তার খোরাক জোগাবে এমন কিছু নথিপত্রের ওপর। এই সময়ের নথিপত্রে বিপ্লববাদ, বঙ্গভঙ্গ বা পরবর্তীকালে সাড়া জাগানো সাম্যবাদ, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন কীভাবে স্থান পেয়েছিল আমি সেদিকে নজর রাখব। আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র নিয়ে।

রাজস্ব দপ্তর

কোম্পানি রাজত্বের সূচনায় সৃষ্ট এই দপ্তর সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সময়। দশটি শাখা নিয়ে গঠিত ছিল। এই দপ্তরের নথিপত্রে পাওয়া যাবে সরকারের বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন, জমিদার কৃষক সম্পর্ক, কৃষি, ভূমি-রাজস্ব, দুর্ভিক্ষ, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, মেলা, ভূ-তত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, মূল্য তালিকা, মাছ চাষ, ভেড়ি, সেচ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোর্ট অভ ওয়ার্ডস, জমিদারি ভাগ, ভাষা, নৌ-পারাপার, অরাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ, জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ, সার্কিট হাউস সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ের দপ্তর বদল ঘটেছিল। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল বাংলা দেশের ছোটো বড়ো ভূস্বামী গোষ্ঠী। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের ক্ষমতার রাশ ছিল এঁদেরই হাতে। এঁদের ক্ষমতার উৎস ছিল লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদারির অংশ নিয়ে পারিবারিক ভাগ বাঁটোয়ারা বা গৃহ বিবাদ থেকে প্রজা-কৃষকের সংঘর্ষ বা নিত্য ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যা কখনও বিদ্রোহের চেহারা নিত—এই সময়ের নথিপত্রে পাওয়া যাবে।

১৮৫৯ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩-এর পাবনা বিদ্রোহ আর এই শতাব্দীর শেষ দশকে ঢাকার বিখ্যাত ভাওয়াল রাজ পরিবারের বিভাজন একই মুদ্রার দুদিক। লোভ লালসা ক্ষমতা দখলে রাখার চেষ্টা উলটো পথে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চিরন্তন লড়াইয়ের ছবি আমাদের সময়ের (১৮৫৯–১৯০০) ধূসর নথিতে এখনও যে কোনো অতীত সন্ধানীর কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয়। তথ্য নির্দেশ করে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নথির কথা লেখা যায়।

নদীর ওপর অধিকার সকলের। কিন্তু মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার কার? হুগলি নদীর দু'পাশের দুস্থ মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরে জীবনধারণ করত। এই সময় সরকার এক আইন জারি করে নদীতে মাছ ধরার ওপর 'কর' বসায়। ক্রুদ্ধ গঙ্গারামের নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরা সরকারের এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে (রাজস্ব দপ্তর, ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৯১)।

ওই একই বিষয়ে আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে রাজস্ব দপ্তরের জুলাই ১৯০৪

সালের নথিতে (ওই, জুলাই ১৯০৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩৩–৩৫; নভেম্বর ১৯০৪, বি, ক্রমিক সংখ্যা বি ২০৪–১৬)।

১৮৬২ সালে মানভূম জেলার ঝরিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে কয়লা বা কালো সোনার সন্ধান মিলেছিল। সরকারি রেভিন্যু সার্ভেয়ার তাঁর এক প্রতিবেদনে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এ. গ্রান্টকে এ-খবর জানিয়েছিলেন (ওই, জুন ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৬৩)।

অন্য তথ্যের সন্ধান নেওয়া যায়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মূল লক্ষ্য থাকত দুস্থ মানুষজনের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করা। কখনো-কখনো এই লক্ষ্যের বাইরে অন্য ভাবনা কাজ করত। যেমন এই সময়ের এক জার্মান ধর্ম প্রচারক সংস্থা লুথারিয়ান সম্প্রদায় ছোটোনাগপুরের কোল উপজাতিদের সামাজিক চিন্তা ভাবনার দীনতা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসে ১৮৭০-এর কালে। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রিচার্ড টেম্পল এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। লুথারিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় প্রাণিত হয়ে তিনি এসময় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' সন ১৮৭৬ সালে (ওই, আগস্ট ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ৪৭–৫৩)।

ওই সময়ের নথিতে রবীন্দ্রনাথের আলু চাষ নিয়ে মজার তথ্য পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চার পাশে আলু চাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন, সফল হননি (ওই, নভেম্বর ১৮৯৯)।

কৃষি, কৃষক, জমিদার-কৃষক ও সরকারের ভূমি রাজস্বের বিপুল তথ্য যেমন এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছিল তেমনই এই দপ্তরের নথি খুঁজলে বাংলা দেশের জমিদারদের অনেক ভাঙাগড়ার কাহিনি জানতে পারা যায়।

রাজস্ব দপ্তরের নথি থেকে এই সময়ের শহর কলকাতার অদূরে পঞ্চান্ন গ্রামে মহারানি স্বর্ণময়ী দেবীর খাসতালুকের কথা জানতে পারি। ঢাকার ভাওয়াল রাজ পরিবারের ভাগ হয়ে যাওয়ার কাহিনি এখান থেকেই পাওয়া যাবে (ওই, জুলাই ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৪–১৫, সেপ্টেম্বর ২০–২১, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬)।

রাজস্ব দপ্তরের ১৮৯৫ সালের একটা নথি থেকে আমরা পাব হিন্দুদের ধর্মীয় ভাতা তদারকির জন্য সরকারের কাছে ভারতসভার আবেদনের সংবাদ। ভারতসভা সরকারের কাছে তাদের এই আবেদনে বলেছিল হিন্দুদের ধর্মীয় ভাতা বা বৃত্তি ঠিক মতো ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এমন আইন থাকলে ধর্মীয় বৃত্তি বাবদ প্রাপ্য ভাতা যা বৃত্তির অপব্যবহার বন্ধ হবে (ওই, জুলাই ১৮৯৫, ক্রমিক সংখ্যা ৮৯–৯৪)।

রাজস্ব দপ্তরের আলোচনা শেষ করব ব্রিটিশ প্রশাসনের এক সময়ের অন্যতম স্তম্ভ রমেশচন্দ্র দত্তের চিঠি নিয়ে। ১৯০০ সালে ব্রিটিশরাজের প্রাক্তন আই. সি. এস. বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলকে বাংলা দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখান থেকে বাংলা দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত এক ভূস্বামী গোষ্ঠীর কথা যেমন জানা যায় তেমনই কৃষকদের কথাও জেনে নিতে

পারি। বাংলা দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে রমেশ দত্ত যা লিখেছেন : '.. the Bengal cultivator of the present day is better read, better informed, more self reliant and more able to defend his own interest than before.' এই ছবি কি যথার্থ? সরকারি নথির বাহিরে কেন যাব! (ওই, আগস্ট ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা ৭৭–৭৮, ৮০–৮১)।

২

মূল বিভাগ থেকে আমরা 'শাখায়' যেতে পারি। রাজস্ব দপ্তরের অন্যতম শাখা 'ভূমি অধিগ্রহণ'। এই শাখার দায়িত্ব ছিল সামাজিক ও সরকারি প্রয়োজনে জমি দখল করা। এই শাখার অজস্র নথিপত্রের মধ্যে থেকে আমরা বেছে নেব এমন কিছু নথি যা আমাদের চেনা জগৎটাকে নতুন করে চেনাবে, আমরা চমৎকৃত হব কোনো কোনো বিষয়ের অভিনবত্বে। পুরোনো নথি সব সময়েই নতুনকে চেনায়। কোন সময় কলকাতায় প্রথম আর্ট গ্যালারি তৈরি হয়? ভূমি অধিগ্রহণ শাখার নথি থেকে জানতে পারা যায় এই সময় ১৮৭৬, স্থান : ১৬৩–৬৬ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটের বাড়ি (রাজস্ব (ভূমি অধিগ্রহণ শাখা) দপ্তর, আগস্ট ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ২১)। কলেজ স্কোয়ারের অ্যালবার্ট হল এখনকার কফি হাউস, সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই শাখার ১৮৭৭ সালের নথিতে (ওই, জুন ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩০–৩১; আগস্ট, বি ৫৯–৬১)। এই শাখার ১৯০০ সালের নথিতে পাওয়া যাবে ব্যাংক অভ বেঙ্গল কলকাতায় তাদের ব্যাবসার উন্নতির কথা মনে রেখে নতুন বাড়ি করতে চাইছে (ওই, সেপ্টেম্বর ১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ২; সেপ্টেম্বর ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা ২১–৩৮)।

আর্ট গ্যালারি, অ্যালবার্ট হল বা ব্যাংক অভ বেঙ্গালের কথা থাক। আমরা এক সংবেদনশীল বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি। কবরস্থানের কথা লেখা যায়।

১৮৮০ সালের কালে কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকা দাবিহীন মুসলমানের দেহ সরকারের কাছে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছিল। সময় মতন মৃতদেহ স্থানান্তরণ না করার জন্য পচা গলা দেহে চারপাশের পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠত। প্রশাসনের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল : কোথায় ফেলা হবে ওই সমস্ত দাবিহীন দেহ? সরকার শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লোকালয়ের বাইরে এই সমস্ত মৃতদেহ সমাধিস্থ করার। আলিপুরে প্রয়োজনীয় স্থান খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক ও পরিবেশ দূষণের সমস্যা মিটেছিল এইভাবে (ওই, ডিসেম্বর ১৮৮৮, ক্রমিক সংখ্যা ১; সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, বি ৩–১১)। শহর কলকাতা ও নিকটবর্তী এলাকার কয়েকটি মুসলমান সমাধিস্থানের কথা উল্লেখ করব। এই সমস্ত সমাধিস্থলের মধ্যে পাই বাগমারি, গোবরা, একবালপুর, গার্ডেনরিচ প্রভৃতি। রাজস্ব দপ্তরের ভূমি রাজস্ব শাখায় এই বিষয়ে প্রভূত তথ্য পাওয়া যাবে। মুসলমান ভদ্রলোক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াও এই ধরনের অনেক নথিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আবার কলকাতার কবরস্থান ও শ্মশানঘাট নিয়ে আকর্ষণীয় তথ্য আছে পুর

দপ্তরের নথিপত্রে। বিশ শতক থেকে এ বিষয়ের দায়িত্ব বিশেষ করে শ্মশানঘাট বা কবরস্থান নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল পুরসভা। পুর দপ্তরের ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ সালের নথিতে পাওয়া যাবে গোবরার বিখ্যাত কবরস্থান নির্মাণের তথ্য। কলকাতা গেজেটে এই কবরস্থান তৈরির জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সেখানে লেখা আছে : '...The land is urgently required'. গোবরার রূপচাঁদ পাল লেনে এই কবরস্থান নির্মাণের জন্য ৫৭ বিঘা ১৯ কাঠা ৫ ছটাক জমি কেনা হয়েছিল।

৩

কবরস্থান নয়, আমরা এবার নজর দেব রাজস্ব দপ্তরের কৃষি শাখার দিকে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় এই শাখার আলোচ্যসূচিতে প্রাধান্য পেলেও, এখানে উল্লেখ করব সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন ধরনের তথ্য। বাংলা দেশে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কেন ? কেন না '...Flow of water is rarely steady throughout the year' (রাজস্ব (কৃষি), অক্টোবর ১২, ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০–১১)।

ওই দপ্তরের 'বন' শাখার নথি থেকে বাংলা দেশের গহন গভীর অরণ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। আমরা এই শাখার নথি থেকে জেনে নিতে পারি বন, বনাঞ্চল, এখানকার অধিবাসী, এদের জীবনধারা, গাছগাছালি, বন্য প্রাণী জগতের কথা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকার কীভাবে এসময় তৎপর হয়ে উঠেছিল সে পরিচয় পাওয়া যাবে রাজস্ব (বন) দপ্তরের নথিতে। আগস্ট ১৮৭৬'র নথি থেকে জানা যাবে 'বন বিভাগ' হিসেবে সাঁওতাল পরগনার গড়ে ওঠার ইতিহাস। এই শাখার জুন ১৮৯৩'র নথি থেকে জানতে পারা যাবে বাংলা দেশের বনাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ক্রমিক সংখ্যা ১–৪)।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির গহন বনাঞ্চল নিয়ে আইন করা হয় ১৮৮৭তে (ক্রমিক সংখ্যা মার্চ, ৩–৫; এপ্রিল, ৭–১২)। সরকার কেন 'মাল ফরেস্ট'-এ অতিথি নিবাস গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছিল, সে তথ্য জেনে নেওয়া যায়। এর জন্যে দেখা যেতে পারে এই শাখার ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর ২১ তারিখের নথি (ক্রমিক সংখ্যা ৪০–৪১)।

রাজস্ব দপ্তরের নথিপত্র নিয়ে আমাদের আলোচনার শেষ নথিটি হতে পারে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের এই সময়ের এক জমিদারের ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত। এই জমিদারবাবু প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর।

১৯০০ সালে পার্ক বালিগঞ্জ ও ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামে প্রদ্যোতকুমারের যে বিপুল ভূ-সম্পত্তি ছিল তার মধ্যে বালিগঞ্জ এলাকাতেই তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮২ বিঘা ২৬ কাঠা ও ১৪ ছটাক জমি (most valuable property), বালিগঞ্জ এলাকায় এই সময় জমির মূল্য ছিল ৫০০–৬০০ টাকা প্রতি কাঠা।

১৯০৮ সালে 'for reduction of debt of Govt.' প্রদ্যোতকুমার চেয়েছিলেন সরকার যেন এই জমির ওপর দখল নেয়। অর্থাৎ সরকারের কাছে তাঁর ঋণ মেটাতে

ওই জমি প্রদ্যোতকুমার সরকারকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রদ্যোতকুমারের বিনীত আবেদনে সরকার সাড়া দেয়নি। প্রদ্যোতকুমারের আবেদনের জবাবে সরকার থেকে তাঁকে জানানো হয় '...it dose not seem that Govt. would any use for the property at present and is therefore unable to acquire it now.' (ভূমি (ভূমি রাজস্ব) দপ্তর, নভেম্বর ১৯০৮, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৯৭–৯৯)।

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি কী ধরনের তথ্য রাজস্ব দপ্তর ও এর শাখায় শাখায় রয়ে গিয়েছে। দুস্থ মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম, ঝরিয়াতে কয়লার খোঁজ পাওয়া অথবা বাংলা দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা কেন সম্ভব নয় বা বালিগঞ্জ অঞ্চলের বিপুল ভূ-সম্পত্তির ওপর ঋণভারে জর্জরিত ঠাকুর পরিবারের এক সন্তানের মালিকানা ত্যাগের ইচ্ছার মতন বিচিত্র বিষয় নিয়ে রাজস্ব দপ্তর গড়ে উঠেছিল। আর অজস্র এমন সমস্ত নথিপত্রের মধ্য থেকে যে কটি নথির পরিচয় দিলাম সেখানে এক খণ্ডচিত্র প্রকাশ পেলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না মহাফেজখানার এইসব নথিতে বাংলা আর বাঙালির আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য এক পরিশ্রমী অতীত সন্ধানীর হাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিচার বিভাগ

রাজস্ব দপ্তরের মতন ঔপনিবেশিক সচিবালয়ে বিচার বিভাগ সমান গুরুত্বের অধিকারী ছিল। সাধারণভাবে ১৮৮৫ পর্যন্ত বিচার বিভাগের হাতে ছিল : আদালত, বিভিন্ন বিচারালয়, প্রশাসনিক আইন সংক্রান্ত বিষয়, অপরাধপ্রবণ উপজাতিদের ওপর নজর রাখা, ধৃতদেব প্রশাসনের হাতে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা নেওয়া, বিকৃত মস্তিষ্কের অপরাধী, দাঙ্গা, ভবঘুরে, মুসলিম বিবাহ নিবন্ধীকরণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বন্যপ্রাণী ধ্বংস ইত্যাদি, দেশের সীমানা নির্ধারণ, ইচ্ছাপত্রহীন সম্পত্তি, আইন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন, আইনি প্রতিবেদন প্রস্তুত, বাংলা বর্ষপঞ্জি, অ-স্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত, শিশুহত্যা, রথযাত্রা, চড়ক, মেলা, ট্রেন ডাকাতি, জাল মুদ্রা, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আচরণ, পুলিশ বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, দেহরক্ষী, নিরাপত্তা কর্মী, গবাদি পশুর খোঁয়াড়, পুলিশ থানার এলাকা নির্ধারণ, পুলিশ গেজেট, জেল সংশোধনাগারে উৎপাদিত দ্রব্য, বন্দিদের দ্বীপান্তর, সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রভৃতি। ১৮৮৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয় ওই বিভাগের অধীনে আসে তার মধ্যে ছিল সাব-জজ, মুনসেফ, বিবাহ নিবন্ধক, কাজি, সরকারি উকিল নিয়োগ, পলাতক আসামি, বন্দি সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি।

ওই সমস্ত বিষয়াবলি থেকে আমরা বুঝতে পারি আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ওই সমস্ত বিষয় শুধু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, সামাজিক দিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল। আমি কোম্পানি আমলের বিদ্রোহের কথা লিখেছি। বিদ্রোহী সিপাহির ফাঁসির কথা লিখেছি। কিন্তু লিখিনি এই বিদ্রোহের সঙ্গে রাজা-মহারাজাদের যোগাযোগের কথা। এঁরা এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। একজনের কথা লেখা যায়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। কোম্পানি বাহাদুর এই বিদ্রোহ ব্যর্থ করতে বাংলা দেশের যে সমস্ত রাজা-মহারাজার সাহায্য নিয়েছিল বর্ধমানের মহারাজা ধীরাজচাঁদ বাহাদুর তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। উল্লেখ্য ধীরাজচাঁদ সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতেও কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন।

বিচার বিভাগের নথিতে বর্ধমান মহারাজার ওই সাহায্যের স্বীকৃতি আছে। বর্ধমান বিভাগের প্রধান ১৮৬০ সালের এক চিঠিতে বাংলা সরকারের সচিবকে সরাসরি লিখেছিলেন সাঁওতাল ও সিপাহি বিদ্রোহের সময় বর্ধমান মহারাজার হৃদয় ও মন : '.. was throughly with us ' সুতরাং পূর্বোক্ত চিঠিতে মহারাজার স্তুতি করে লেখা হয়েছে : '...The Maharaja ... has large Estate and large revenue... gives the officers of this Govt. no trouble.' সুতরাং এমন অনুগত মহারাজা, কি চাইতে পারতেন সরকারের কাছ থেকে? অবশ্যই সেলাম বা 'Salute'. না, মহারাজাকে সরকারি সম্মান জানানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি (বিচার বিভাগ, মার্চ ৩, ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ১১৫–১১৭)। রাজা মহারাজার কথা থাক। এবার অন্য বিষয়ে লেখা যায়।

সিপাহি বিদ্রোহের রেশ স্মৃতিতে আশ্রয় নেওয়ার আগেই ব্রিটিশ রাজ নতুন বিদ্রোহের স্বাদ পেল। সীমিত ব্যাপ্তি হলেও, নীল বিদ্রোহ অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও সরকারকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। নদিয়ার জয়রামপুরের বাসিন্দারা এক নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। নীলচাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা জানতে পারা যায় এই চিঠি থেকে (ওই, মার্চ ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ১৪৬)।

নদিযার দূরের শহর পাবনাতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটোলাটের কাছে নীল চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভের কথা জানানো হযেছিল (ওই, সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ২২৪–২৮)।

নীলচাষিদের অরুন্তুদ কাহিনি আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ছবি আছে এই সময়ের দর্পণ, *নীল দর্পণ*-এ। সরকারের কাছে ভূস্বামী গোষ্ঠী এই গ্রন্থের প্রচার রুখতে আবেদন করেন (ওই, ক্রমিক সংখ্যা ৬৯)।

গম্ভীর থেকে হালকা বিষয়ের দিকে নজর দেব। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলের মানুষজন শিয়ালের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা পুরসভার সাহায্য চেয়ে কি উত্তর পেযেছিলেন? এই বিভাগেরই সেপ্টেম্বরের (১৮৬০) নথিতে সে তথ্য আছে (ক্রমিক সংখ্যা ৯৫–৯৭)।

১৮৬০ দশকের সূচনা বিদ্রোহ দিয়ে, এই দশকের শেষেও বিদ্রোহ দেখেছি আমবা। নীল বিদ্রোহের তুলনায় এই বিদ্রোহ বা আন্দোলনের ধার ভার আরও তীক্ষ্ণ ও মসৃণ ছিল। আমরা ওয়াহাবি আন্দোলনের কথা লিখতে পারি।

মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে বিভ্রান্ত রেখেছিল দীর্ঘ সময ধরে। একদিকে নীল আর একদিকের ওয়াহাবি আন্দোলন দুই-এ মিলে

বাংলা প্রশাসনের নীল সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছিল, যদিও নীল ও ওয়াহাবি আন্দোলনের মধ্যে মিল ছিল না কোথাও।

সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে ১৮৬০ সালের দশকের শেষ থেকে এই আন্দোলনের নেতাদের সুদূর বোম্বে ও পেশোয়ারের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি। প্রশাসন কখনো-কখনো ডাকঘরে হানা দিয়ে এমন সব চিঠি বাজেয়াপ্ত করত; সরকার নিপুণভাবে এই আন্দোলন ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা প্রশাসন মালদহ, রাজমহল ও অন্যান্য অঞ্চলে এই আন্দোলনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম অবহিত হয় (বিচার বিভাগ, জানুয়ারি ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ৩০৮–১২)।

বাংলা প্রশাসন নানাভাবে ওই আন্দোলনের উৎস ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ওই আন্দোলনের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টায় কসুর করেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদস্থ কর্মচারী মেজর রিলিকে সুদূর পেশোয়ারে পাঠানো হয়েছিল। '...to follow up certain clues in connection with the movement.' বোম্বের কথা পরে জানব (ওই, এপ্রিল ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৩০–৩১ ও ২৪৭)।

ওই বছরের আগস্টে বাংলা দেশের মালদহ, রাজমহল ও অন্যান্য অঞ্চলের ডাকঘরে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু চিঠি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। প্রশাসনের কাছে খবর ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীরা চিঠির মাধ্যমে দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে (ওই, আগস্ট ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ৯৭–৯৯)।

অন্যদিকে বোম্বের সঙ্গে বাংলা দেশের ওই আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা এমন তথ্য সংগ্রহ করা সরকারের কাছে জরুরি ছিল। সরকারের ভয় ছিল এই দুই অঞ্চলের বিদ্রোহীরা যদি একসঙ্গে মিলে সরকার বিরোধিতায় প্রাণিত হয় তার ফল সুখকর হবে না। সরকার সতর্ক হয়ে পড়েছিল (ওই, নভেম্বর ১৮৬৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৪৮)।

ফলত বিচার বিভাগের নথিতে এই সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের নানান সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে পাওয়া যাবে ১) বিদ্রোহের কারণ, ২) সরকারের দমননীতি, ৩) বিদ্রোহগুলির ব্যর্থ হওয়ার কারণ ইত্যাদি। এমনকি বাঙালি ভদ্রলোকেরা ওই সমস্ত আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গ বারবার এই সময় উঠে এসেছিল। এই আলোচনা শেষ করব এক ধর্মান্তরিত যুবক আর তার বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে।

উনিশ শতকের শেষে রাঁচি বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুড়ি-একুশ বছরের এক যুবক, বীরসা যাঁর নাম, যেভাবে সরকার বিরোধিতায় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছিল তা এই অঞ্চলের প্রশাসকদের পছন্দের ছিল না। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মতে বীরসা এই অঞ্চলের শান্তি নষ্ট করছিল। মনে হয় চল্লিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া সিধু কানহু'র স্মৃতি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে তখনও তাড়া করে ফিরছিল।

বীরসার কাহিনি আছে এই সময়ের বিচার বিভাগের পুলিশ শাখার নথিতে।

বীরসার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল? বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে লেখা এক প্রতিবেদনে ছোটোনাগপুরের বিভাগীয় প্রধান বীরসা সম্বন্ধে লিখলেন : '...The man should be brought in either as a suspected lunatic or as a person whose actions are likely to create a breach of peace.' (বিচার (পুলিশ) বিভাগ, আগস্ট ২৮, ১৮৯৫, ক্রমিক সংখ্যা ৩৮–৪৬)।

আন্দোলনের কথা থাক। আমরা অন্য তথ্যে স্বাদ নিতে পারি শুধুমাত্র তথ্য-বৈচিত্র্য বুঝতে।

১৮৫৯ সালের এক সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় সরকার চৌরঙ্গি অঞ্চলের 'মনি বস্তি' কিনে নিচ্ছে। কারণ? রাস্তা তৈরির প্রয়োজন। উপনিবেশিক কালে সাদা মানুষের চলা ফেরার জন্য মসৃণ রাস্তার দরকার হত (ওই, সেপ্টেম্বর ২২, ১৮৫৯, ক্রমিক সংখ্যা ৪৭–৪৮)।

সরকারি নথিতে চৌরঙ্গি হোয়াইট টাউন নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর আস্তানা। আবার এখানে বাস করতেন সাধারণ দুস্থ মানুষজন। থিয়েটার রোড আর সার্কুলার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলের 'বামুন বস্তি' উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাহেবদের ঘরবাড়ি তৈরির জন্য (ওই, জুন ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ৫১)।

সব কিছুই যখন নতুন করে গড়ে উঠছিল তখন খোদ কলকাতায় বহু পরিচিত 'ট্যাংক স্কোয়ার'-এর নাম পালটিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার রাখার প্রস্তাব রাখা হল অনেক আগে যে স্থানের নাম ছিল লালদিঘি। ১৮৬৫ সালে এই অঞ্চল 'ডালহৌসি' নামে পরিচিত হল (ওই, মার্চ ১৮৬৫, ক্রমিক সংখ্যা ৪২, ১০৫–১০৬)।

১৮২৯ সালে সরকারের বিচারবিভাগ সতীদাহ প্রথার অবসানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে বাঙালি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজকে বড়ো ধরনের আঘাত দিয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষ দশকে এমনই আর এক আঘাতে ওই রক্ষণশীল সমাজ আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সরকার আইনসম্মত সহবাস বা হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ থেকে বারোতে বাড়ানোর প্রস্তাব এনে রক্ষণশীল সমাজকে আরও এক আঘাতের মুখে এনে ফেলে। বাঙালি হিন্দু সমাজ এই সরকারি পদক্ষেপে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বিচার বিভাগের ১৮৯৩ সালের নথিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আছে।

৪

জেনারেল বা সাধারণ বিভাগ

জেনারেল বা সাধারণ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ছিল বাংলা বিভাগের শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এর সীমানার একদিকে ছিল সুদূর আরাকান বিভাগ, অন্যদিকে বাংলা দেশের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম। মাঝখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি-জয়ন্তিয়া অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। উল্লেখ্য কোম্পানি যুগে শিক্ষার আলাদা কোনো বিভাগ ছিল না। শিক্ষার কোনো বিষয় দেখত জেনারেল, আর কোনো বিষয়ের ওপর

নজরদারি করত কাউন্সিল অভ এডুকেশন বা শিক্ষা পর্ষদ। ১৮৫৯ সাল থেকে মূল দায় নিয়েছিল জেনারেল বা সাধারণ বিভাগ। কাউন্সিল অভ এডুকেশন ডি পি আই বা ডাইরেক্টর অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে পরিচিত হল।

প্রথমে 'জেনারেল' পরে 'এডুকেশন' বিভাগ ব্রিটিশ রাজের আমলে বাংলা দেশের গ্রাম শহরে শিক্ষা প্রসারের যে দায়িত্ব নিয়েছিল সেখানে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না : শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ই শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টিবলয়ে থাকত।

আমরা বর্তমান আলোচনা শুরু করতে পারি সুদূর আরাকান থেকে। ১৮৬০ সালে সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অংশে শিক্ষার প্রসার কীভাবে ঘটেছিল তার পরিচয় জানতে পারা যায়। ১৮৬২ সালের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে কীভাবে আরাকান অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে শিক্ষা বিভাগ যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার পরিচয়। সাধারণ বা জেনারেল বিভাগের প্রতিবেদনে পাওয়া যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরি পাওয়ার সংবাদ (সাধারণ বিভাগ, জুন ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৫)।

আমাদের কাছে প্রশ্ন উঠতে পারে ওই শিক্ষার দরজা সকলের কাছে সমানভাবে খোলা ছিল? বারবনিতাদের ছেলেরা কি 'ভদ্র' সন্তানদের সঙ্গে একাসনে বসে এই শিক্ষা নিতে পারত? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে শিক্ষা বিভাগের নথিতে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্ট বারবনিতারা সমাজের চোখে এখনও সতত নিন্দনীয়, উনিশ শতকে এঁরা ঘৃণার বিষয় ছিলেন। পরিচিত সমাজ সভ্যতার স্বীকৃত আলোর ছটা এদের ঘরে পৌঁছোত না, সভ্য সমাজের অনুশাসনের সামনে এঁদের উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে শিক্ষিত মানুষজনের অসুবিধে হত। তাদের অসহায় শিশুদের সামনে শিক্ষার আলো ঝলমলে জগতে প্রবেশের পথ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে বা কোনো তরুণ আধিকারিক নিজের রুচি শিক্ষা নিয়ে যখন এঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করতেন তখন তাঁকে প্রশাসনিক স্তরে কৈফিয়ত দিতে হত। যেমন হয়েছিল বালাশোরের জেলা শাসককে (ওই, অক্টোবর ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৫৭–৬১)।

ওড়িশা বাংলা দেশে সর্বত্রই চিত্রটা ছিল একই। বারবনিতাদের সন্তানদের শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ ছিল না। বাঙালি প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা বারংবার বিব্রত হয়েছিল এক যুক্তিহীন আবেগের সামনে। সরকারি নথিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে (ওই, ডিসেম্বর ১৮৭৮, ক্রমিক সংখ্যা ১–৪; এপ্রিল ১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১–১৭; ডিসেম্বর ১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৮–২০)।

ওই বিতর্কিত জগৎ থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি বাঙালি ভদ্রলোকদের এক পরিচ্ছন্ন সমাজে যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাচর্চা হত। নারী শিক্ষার কথা বলা চলে।

১৮৫০ সাল থেকে বাংলা দেশে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বঙ্গ-ললনাদের ঘরের বাইরে চলে আসা স্বাভাবিক ছিল। এক

সময় যাঁদের বোঝানো হয়েছিল শিক্ষিত হওয়া পাপ অপরাধ তাঁদের সামনে এসময় খুলে গিয়েছিল এক অধরা স্বপ্নের জগৎ। বঙ্গ-ললনারা ঘরের বাইরে পা রেখে জানিয়েছিলেন অকারণে তাঁদের নষ্ট হয়েছে অনেক সময়, বহুদিন, এখন নষ্ট হবে না কোনো দিন।

১৮৫৯ সালের শুরুতে বেথুন স্কুলের সম্পাদক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শিক্ষা বিভাগের সচিব সি. জে. বাকল্যান্ডকে এই স্কুল সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা অবশ্যই আমাদের কাছে প্রামাণ্য দলিল হতে পারে। এরই সঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি এই স্কুলের অগ্রগতির ইতিকথা। ছাত্রীদের মনোভাব জানা যাবে এই প্রতিবেদন থেকে (ওই, এপ্রিল ১৮৫৯, ক্রমিক সংখ্যা ২৫)।

ওই তথ্য সাধারণ উদাহরণ মাত্র। ১৮৫৯ সালের পর অবশ্যই ওই স্কুল সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে সাধারণ বিভাগের প্রতি বছরের কার্য বিবরণীতে। বাঙালি মেয়েদের শিক্ষিত হওযাব ধারাবাহিক পরিচয় এই সমস্ত তথ্যে আছে। দু-চারটি উদাহবণ দেওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র এক সরকারি বিভাগের কর্মকাণ্ড বুঝে নিতে।

১৮৬০ সালে বেথুন স্কুল নিয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল অনিবার্যভাবে উৎসাহী হযে পড়েছিলেন। এই সময়ের সাড়া জাগানো কযেকজন ব্যক্তিত্ব বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেমন শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মহেশ ন্যাযরত্ন, পিযারীচরণ সরকার। একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর তুলনায বড়ো লাভ আর কী হতে পারত; সাধারণ বিভাগের নথিতে এঁদের বিষযে বিস্তারিত তথ্য আছে (ওই, মে ১৮৬৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০৭; জানুযাবি ১৮৬৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৬০–৬১; এপ্রিল ১৮৭৩, ক্রমিক সংখ্যা ১২; জুন ১৮৭৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ২)।

বেথুন স্কুল নিযে কারোরই মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, তবু ১৮৭০ সালের কালে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোথাও যেন সন্দেহের কালো মেঘ জমে উঠেছিল। সন্দেহ জমেছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার মনে। সন্দেহের কারণ কি? বেথুন স্কুল নিযে এমন তথ্যের সন্ধান করা জরুরি (ওই, মার্চ ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা ১)।

বেথুন স্কুলের পুনর্গঠনের ইতিহাস পাওয়া যাবে ১৮৭৯ সালের নথিতে (ওই, জুন ১৮৭০, ক্রমিক সংখ্যা ১২–১৫)। পুনর্গঠনের পথে ওই বিদ্যাযতনে নতুন 'কলেজ' শ্রেণিযুক্ত হল (ওই, ১৮৭৯, ক্রমিক সংখ্যা ১৬–১৮)।

বেথুন স্কুল, কলেজ ছাড়িযে কিছু দূর গেলে পথে পড়বে প্রেসিডেন্সি কলেজ। সূচনাপর্ব থেকে এই কলেজ ঘিরে সাধারণের কৌতূহল ছিল, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিযে এই কলেজ সকলের বিস্ময আর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ে। সরকারি নথিতে তেমনই তথ্য আছে।

১৮৫৯ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম একচল্লিশ বছবে সাধাবণ বিভাগেব নথিতে ওই কলেজ নিয়ে যে অজস্র তথ্য আছে তার মধ্যে দু-চারটে উদাহবণ হিসেবে নেওযা যেতে পারে যা প্রেসিডেন্সি কলেজের কৌলীন্য প্রমাণের তথ্য হতে

পারে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র কি বাংলা দেশের অন্য কলেজের ছাত্রদের তুলনায় সব বিষয়ে একটু বেশি সুযোগ পেতেন? এখানকার ছেলেরা যে সুযোগ পান অন্য কলেজের ছাত্ররা কি সেই সুযোগ পেতে পারেন না—এমন প্রশ্ন উঠতে দেরি হয়নি বা শিক্ষা বিভাগের কাছেও এমন প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত ছিল না (ওই, জানুয়ারি ২০, ১৮৫৯, ক্রমিক সংখ্যা ৮)।

ওই কলেজে আইন পড়ানো শুরু হয় ১৮৬১ সালে। ঢাকা ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ছাত্ররা কলকাতামুখী হয় এই কলেজে পড়ার জন্যে। আসলে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ছিল আইন নিয়ে পড়ার, আইন ব্যাবসা বাঙালি ভদ্রলোকদের কাছে আকর্ষণের বৃত্তি ছিল (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ২০–২১)। তবু প্রেসিডেন্সি থেকে আইন বিষয়ে পঠন-পাঠন উঠিয়ে দেওয়া হয় ১৮৬৪ সালে (ওই, সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪–৬)।

অনিবার্য প্রয়োজনে প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের জন্য জমি কেনা হয় ১৮৭২ সালে (ওই, অক্টোবর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ৭৬–৭৭)।

চিন্তা চেতনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ অন্য সমস্ত কলেজের আগে ছিল। তবু এই কলেজের দরজা ছাত্রীদের কাছে বন্ধ ছিল। কেন? শতাব্দীর শেষে প্রশ্ন উঠেছিল ছাত্রীরা কেন এখানে পড়ার সুযোগ পাবে না? সংগত সামাজিক প্রশ্ন, বিষয় হিসেবে উল্লেখযোগ্য বটে (ওই, সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩৩)।

প্রেসিডেন্সি বা বেথুন কলেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিত ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মধ্যবিত্ত মানুষজনের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানোয় কোনো বাধা আসেনি। ইংরেজি শিক্ষার অর্থনৈতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পাহাড়ি উপজাতি গোষ্ঠী কীভাবে এই শিক্ষা নিয়েছিল? দীর্ঘদিনের অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে যারা দিন কাটাত তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এত সহজ ছিল? হয়তো না, তবু চমক জাগানো এই কাজটিই করা হল হয়তো বা একটু ঝুঁকি নিয়ে (ওই, নভেম্বর ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ৪৩–৪৫)।

উত্তর-পূর্ব ভারতে যে কাজ করতে ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, উত্তরবঙ্গে সে কাজটি অনায়াসেই করা হয়েছিল। এই অঞ্চলের সঙ্গে ইতিমধ্যে কলকাতার যোগাযোগ ঘটেছিল রেলপথে। রেলের কল্যাণে ব্যাবসা-বাণিজ্য বাড়ছিল, উত্তরবঙ্গ ক্রমে ক্রমে সকলের অনেক কাছে চলে আসতে থাকে। এখানকার স্থায়ী নীরবতা ভেঙে গিয়েছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দৌলতে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে ১৮৮৩ সালে গড়ে উঠল কার্শিয়াং সরকারি রেল স্কুল। রেলের তত্ত্বাবধানে এটাই বাংলা দেশের প্রথম স্কুল। এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে এই স্কুলের বড়ো ভূমিকা ছিল (ওই, এপ্রিল ১৮৮৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪–৬)।

উনিশ শতকের প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা প্রসারের পাশে চারুকলাও নিজের স্থানটি এসময়

ঠিক করে নিয়েছিল। অন্তত সরকার এ বিষয়ে যে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এমন সংবাদ আমাদের জানা। ১৮৭৬ সালে স্বয়ং প্রাদেশিক শাসনকর্তা এ বিষয়ে কলকাতায় চারুকলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে তাঁর সদর্থক মনোভাব ব্যক্ত করলেন তাঁর এক মিনিট-এ। বাংলা দেশে শিল্পকলা চর্চার ইতিহাসে এই মিনিট সতত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে (ওই, ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ১)। শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ের জন্য বহুবাজার অঞ্চলে নতুন বাড়ি কেনা হল। নতুন মহাবিদ্যালয় ঘিরে সীমিত হলেও অভিনব জ্ঞানচর্চার বাতাবরণ গড়ে উঠল, অবশ্যই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং সরকার বাহাদুর (ওই, অক্টোবর ১৮৭৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫০–৫২; ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪–৫)।

১৮৮৭ সালে চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর্ট গ্যালারি ও ভারতীয় জাদুঘর পুনর্গঠনের দিকে নজর দেওয়া হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে এই মহাবিদ্যালয়কে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সুপারের পদ তৈরি হয়। কলেজের নতুন সুপার হলেন বিখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞ ই. বি. হ্যাভেল (ওই, এপ্রিল ১৮৮৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ২১–২২; জুলাই ১৮৯৬, ক্রমিক সংখ্যা ২৩–২৪)।

বাংলা বিভাগের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই কলকাতা মাদ্রাসা। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা মাদ্রাসা মুসলিম জ্ঞানচর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। ইতিবাচক সরকারি উদ্যমে কোনো ঘাটতি ছিল না। ১৮৬৪ সাল থেকে মাদ্রাসা নিয়ে সরকারি ভাবনায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। বাংলা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মাদ্রাসার মিল, অমিল কোথায় বা স্পষ্ট করে লেখা যায় দেশের এক ও অভিন্ন শিক্ষা কাঠামোয় ঠিক কোথায় মাদ্রাসার স্থান? এমন প্রশ্ন সরকারি মহলে উঠেছিল। মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার এগিয়ে এল।

এই ভাবনা থেকে ১৮৬৭ সালে মাদ্রাসা সংস্কার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তৈরি করা হয় দীর্ঘ প্রতিবেদন (এপ্রিল ১৮৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ১৩–১৪; মার্চ ১৮৬৮, ক্রমিক সংখ্যা ১৭–৩৬)।

মাদ্রাসা পঠন-পাঠনে মুসলিম সমাজের উচ্চবর্ণের ছেলেরা বেশি প্রাধান্য পেতেন, মূলত রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসায় উচ্চবর্ণের সন্তানদের অলিখিত প্রাধান্য ছিল। সরকারও এই উচ্চবর্ণের সন্তানদের দিকে একটু বেশি ঝুঁকতেন। ফলত এমন ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ের শিক্ষা বিষয়ক পরিবর্তিত অবস্থার ভিন্ন মেরুতে ছিল এই চিন্তা।

সুতরাং ১৮৭২ সালে এক সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হল ভবিষ্যতে 'গুড বার্থ'-এর শংসাপত্র কলকাতা মাদ্রাসায় পড়ার জন্য লাগবে না। অবশ্যই এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ১৪–১৬)।

ওই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে ইংরেজি পঠন-পাঠন

বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানো নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সরকার কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ১৮৬৭ সালের মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে অবশ্যই এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল (সেপ্টেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ২৪; অক্টোবর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ৯৫–৯৭)।

১৮৯২ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় কলকাতার প্রাদেশিক শাসনকর্তার আগ্রহে গড়ে ওঠে 'ডিবেটিং ক্লাব'। আমাদের স্মরণে আছে হেনরি ডিরোজিয়ো'র কথা, যিনি ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তার দীনতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গড়ে তুলেছিলেন 'আকাদেমি অ্যাসোসিয়েশন'। এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তা চেতনায় বিপ্লব এনেছিল।

সুতরাং কলকাতা মাদ্রাসার ডিবেটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাচর্চা থেকে মুক্তি দিয়ে হৃদযবৃত্তি চর্চার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেছিলেন (ডিসেম্বর ১৮৯২, ক্রমিক সংখ্যা ৩৬–৩৯)। ওই ঘটনার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসার জন্য তৈরি হল কিছু নিয়মকানুন। এই সমস্ত বিধি মাদ্রাসা পরিচালন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল (জুন ১৮৯৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৬–২০)। বিশ শতকেও মাদ্রাসার উন্নয়নের প্রশ্ন সরকারের ভাবনাচিন্তার মধ্যে ছিল (১৯০৩ জুন, ক্রমিক সংখ্যা বি ৬৬–৬৯; জুলাই, বি ১৫–১৯)। ছাত্রদের জন্য তৈরি হল 'কমনরুম' মুক্ত মনে ছাত্রদের মেলামেশার জায়গা। ছাত্রদের ভাবনাচিন্তা বিকাশে ক্লাসরুম, কমনরুম—দুইয়েরই প্রয়োজন থাকে সমানভাবে (এপ্রিল ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ৭৫–৮৫)।

ওই সমস্ত তথ্য মাদ্রাসার অজস্র তথ্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ উদাহরণ মাত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসাব উন্নতি যেমন ঘটেছিল, তেমনই তথ্যের ভাণ্ডার স্বাভাবিক কারণে পূর্ণ হযে উঠেছিল। রক্ষণশীলতার তকমা মাদ্রাসা থেকে সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও সময় ও পরিস্থিতির চাপে মাদ্রাসার পুরোনো ঐতিহ্যের পাশে নিশ্চিতভাবে স্থান করে নিয়েছিল আধুনিকতার চমক জাগানো আবেদন। এই ইতিহাস বিশ শতকের নথিতে পাওয়া যাবে।

ফলত আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে কীভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা শহর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনই শিক্ষার নানাবিধ প্রকাশে এই সময় চিহ্নিত হয়ে আছে—এর চমকপ্রদ উদাহরণ প্রাচ্য দেশীয় রীতি নীতিতে শিল্পচর্চার সূচনা। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ভাগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন নিয়েও ওই সাধারণ বিভাগে আলোচনা হত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল বহুবিবাহ সমস্যা। এই সমস্যায় বাঙালি হিন্দু সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সরকারকে বিধবা বিবাহের মতন, এই সমস্যা দূর করার জন্য আইনের সাহায্য নিতে চেয়েছিল। রাধাকান্তের আপত্তি ছিল এখানে। ১৮২৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সতীদাহ প্রথা নিয়ে তাঁর মনোভাব ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি। সুতরাং ১৮৬৬ সালে সরকার যখন আইন

করে এই প্রথার অবসান নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তখন রাধাকান্ত দেব সেখানে তাঁর আপত্তি নথিবদ্ধ করে রাখলেন।

বহুবিবাহ প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব বর্ধমানের মহারাজা ধীরাজ মহতাব চাঁদ বাহাদুর। মহারাজা সরকারের ওপর চাপ দিয়ে এই প্রথা বন্ধে আইনের সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। বহুবিবাহ সংক্রান্ত এমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ বা জেনারেল ডিপার্টমেন্টে (সাধারণ বিভাগ, মে ১৮৬৬, ক্রমিক সংখ্যা ৭৩, ৭৫)।

সাধারণ বিভাগের বিষয়সূচিতে দেশের ভাষা ও দেশনায়কদের স্মরণে রাখার মতন বিষয় ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে 'ভাষা'র মতন সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে অত্যন্ত সতর্কে পা ফেলতে হয়েছিল। বাংলা বিভাগের বিরাট ভূ-বৈচিত্র্যের মধ্যে 'নানা ভাষা' 'নানা মত' সাধারণ বিভাগের নথিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বারবার 'বাংলা', 'অহম' ও 'অসমিয়া' ভাষা নিয়ে আসামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

সরকার 'অহম' ভাষাকেই আসামের উপত্যকা অঞ্চলে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন কিন্তু গোয়ালপাড়ার স্কুল কলেজ আদালতে বাংলা ভাষাই অসমিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে—এমন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছিল।

১৮৭৪ সালে ওই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকাবের কাছে যে স্মারক জমা দেওয়া হয় সেখানে আসামের সর্বত্রই মাতৃভাষা হিসাবে 'অসমিয়া' গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয় (ওই, জানুয়ারি ১৮৭৪, ক্রমিক সংখ্যা ১–১৪)।

বাংলা ও অসমিয়া ভাষা নিয়ে এসময় তুলনামূলক আলোচনা করেন স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্ত (ওই, জুলাই ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ১০৯–১১১; নভেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ৩০–৩৮)।

রমেশচন্দ্রের ওই আলোচনার আগে অবশ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁর এক 'মিনিট'-এ লিখেছিলেন বাংলা বিভাগের নিম্ন প্রদেশসমূহ অর্থাৎ আসাম, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সরকারি স্কুলে, কলেজে এমনকি সরকারি দপ্তরে মাতৃভাষাই ব্যবহার করা উচিত (ওই, ডিসেম্বর ১৮৭১, ক্রমিক সংখ্যা ১৭–১৯)।

ভাষা থেকে আমরা অন্য তথ্যের সন্ধান নিতে পারি। ঔপনিবেশিক শাসককুল এ শহর গড়ে তুলেছিল, নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে। সরকারি আমলাদের অনেকেই কলকাতা গড়ার কাজে যুক্ত ছিল। এই সমস্ত প্রশাসকদের স্মৃতি কলকাতাবাসীর মনে অমলিন রাখতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে সরকার এগিয়ে আসে। ১৮৭২ সালে কলকাতা ময়দানে ঔপনিবেশিক শাসকদের মর্মর মূর্তি স্থাপন নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলাপ আলোচনা শুরু হয় (ওই, জুলাই ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০১–১০৩)।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কলকাতা ময়দানের পূর্ব দিকের শেষপ্রান্তে যে রাস্তা পার্ক স্ট্রিট থেকে আরম্ভ করে ফোর্ট উইলিয়ামে এসে শেষ হয়েছে সেখানে স্যার

জেমস আউটরামের অশ্বারূঢ় মূর্তি বসানো হবে (সেপ্টেম্বর ১৮৭২, ক্রমিক সংখ্যা ১১৬–১১৮)। এই মূর্তির একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক দম্ভ ও শৌর্য, অন্যদিকে ছিল অনুপম শৈলীর পরিচয়। সাধারণ বিভাগের নথি নিয়ে আলোচনা শেষ করব মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা লিখে। অধ্যাপক শাস্ত্রী বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৯-এর ২০ ডিসেম্বর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এক আবেদনপত্রে পদোন্নতি দাবি করেছিলেন কর্মজীবনে তাঁর সাফল্য ও বিশেষ সাহিত্যকীর্তির জন্য।

হরপ্রসাদ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সরকারি হেয়ার স্কুলে, পরে সংস্কৃত কলেজ ও কিছুদিন বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান পদে কাজ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক হন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই সময়ে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্য সম্মেলনে হরপ্রসাদ তাঁর 'Nepalese palm leaf Manuscripts' পাঠিয়ে এখানকার পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলেন।

ঈর্ষণীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হরপ্রসাদের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। সরকারিভাবে বলা হয় : '...he is not entitled to promotion immediately. . his claims will be duly considered when they actually begin to exist.' (জুলাই ১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ৬–১১)।

ওই আলোচনার শেষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা লিখব।

ঠাকুরবাড়ির অবন ঠাকুর সরকারি শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হন ১৯০৫-এ। এই তথ্য আছে সাধারণ বিভাগের আগস্ট, অক্টোবরের নথিতে (ক্রমিক সংখ্যা বি ৭৬–৯০; বি ৩১–৩২)।

৫

সাধারণ বিভাগের বিবিধ শাখা

মূল বিভাগের মতন বিবিধ শাখার বিষয়বস্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা কয়েকটি নথির কথা উল্লেখ করতে পারি। বিবিধ শাখার হরেক রকম বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রন্থাগার। এখানকার নথি থেকে জানা যায় কোন বছর এবং কীভাবে বাংলা সচিবালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল (সাধারণ (বিবিধ) জানুয়ারি ১৮৬৪, ক্রমিক সংখ্যা ৬৫–৬৬; মার্চ, ক্রমিক সংখ্যা ২৫–২৭)।

সচিবালয়ের ওই গ্রন্থাগার ভিন্ন কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির কথা বলা যায়। ১৮৮৮ সালের অক্টোবরে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় (ওই, অক্টোবর ১৮৮৮, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫/৬)।

১৮৯০ সালের নথিতে পাওয়া যাবে ওই গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে

প্রভৃত তথ্য (ওই, এপ্রিল ১৮৯০, ক্রমিক সংখ্যা ১–১২)।

১৯০১ সালে পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গো কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংযুক্তকরণের সংবাদ আছে (ওই, এপ্রিল ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা বি ১–১৫)।

এই সময়ে বাংলা দেশে সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশের আগে সরকারের অনুমতি লাগত। এই অনুমতি দিত বিবিধ শাখা। এক্ষেত্রে বরিশালের অখ্যাত *বঙ্গাদর্পণ* ও বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গাদর্শন* সম্পাদকের মধ্যে কোনো ফারাক করত না বিবিধ শাখা। *বঙ্গাদর্শন* কিছুদিন বঙ্কিম অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদনা করেন। এই সময় সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানের সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। সরকারের কাছে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার অনুমতি চাইলে তাঁকে শর্তাধীনে এই অনুমতি দেওয়া হয়। *বঙ্গাদর্শন* সম্পাদনার কালে তাঁর সরকারি কাজ যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্রকে সতর্ক করে দেওয়া হয় (ওই, মার্চ ১৮৭৮, ক্রমিক সংখ্যা বি ১–২; মে ১৮৭৮, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩–৫)।

বিবিধ শাখার নথিপত্রের বিরাট অংশ জুড়ে আছে ডাকহরকরা, ডাক ব্যবস্থার কথা। কীভাবে ধীরে ধীরে এখানে অনিবার্য পরিবর্তন এসেছিল বা কীভাবে এই ব্যবস্থার ফলে শহর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এসেছিল সব তথ্য পাওয়া যাবে এই শাখার নথিপত্রে।

বিবিধ শাখায় পাওয়া যাবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে গৃহীত বিশেষ বিবাহ বিধি '৩' নিয়ে আলোচনা। ১৮৮২ সালে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে কোনো পুরুষ তাঁর স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন কি? (ওই, আগস্ট ১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা বি ১–৫)।

আমরা এই আলোচনা শেষ করব বিশ শতকের গোড়ায় এসে। আমি ইতিমধ্যে সাধারণ বিভাগ থেকে উদাহরণ নিয়ে কলকাতার ময়দান ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের মর্মর মূর্তি দিয়ে সাজানোর কথা লিখেছি। হডেন গার্ডেন্সের সামনে স্যার আউটরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি।

বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজে এই কলেজেরই দুই বিখ্যাত প্রাক্তনীর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা লিখব। এই দুই প্রাক্তনী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কলেজের নাম : সংস্কৃত কলেজ। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা এ. পেডলার বাংলার শিক্ষা সচিবকে এক চিঠি দিয়ে সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। শিক্ষা অধিকর্তা এঁদের 'Eminent Sanskritists' হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। শিক্ষাসচিব এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। পেডলারের এই চিঠির সূত্র ধরে সমস্ত স্কুল ও কলেজে বিখ্যাত মানুষজনের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (ওই, ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ২৭৬–২৭৭)।

নিয়োগ শাখা

নিয়োগ শাখা দপ্তর মার্চ ১৮৬৬ সালে 'স্বাধীন'ভাবে গড়ে উঠে ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ সালে 'নিয়োগ' মুখ্যসচিবের অধীনে পূর্ণ দপ্তরের মর্যাদা পায়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে বাংলা সরকারের সদ্য গঠিত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এই দপ্তরকে নিয়ে আসা হল।

ওই দপ্তরের কাজের মধ্যে সরকারি আধিকারিকদের চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ছিল : নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিভাগীয় পরীক্ষা, সরকারি কর্মীদের গোপন চারিত্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ইত্যাদি।

সরকারি চাকরি সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তথ্য হিসেবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। এগুলি সাধারণ ও চিরাচরিত বিষয়। আমরা অচিরাচরিত ও খুবই আকর্ষণীয় বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি। এমন একটি বিষয় হতে পারে 'প্রেসরুম' প্রতিষ্ঠা।

সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এ মহাকরণে রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে প্রেসরুম প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল : '...to afford greater facilities to the press.' আসলে বঙ্গভঙ্গের সূচনাকালে সরকার নানা অছিলায় সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছিল। যথার্থ সংবাদ পরিবেশনের অর্থ কি সরকারের স্বার্থরক্ষা করে সংবাদ প্রচার করা? হয়তো, ঔপনিবেশিক যুগের 'প্রেসরুম' প্রতিষ্ঠায় এর বাইরে কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল? অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বয়ং মতিলাল ঘোষ সরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রেসরুম সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে নিয়োগ দপ্তরের ১৯০৫-এর নথিতে (সেপ্টেম্বর ১৯০৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ২২৮–২৫০)।

৬

রাজনৈতিক দপ্তর

কোম্পানি ও ব্রিটিশরাজের আমলে রাজনৈতিক দপ্তরের ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব বারবার পালটেছিল সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সচিবালয়ের ক্ষমতার অলিন্দে রাজনৈতিক দপ্তর নিশ্চিতভাবে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কিছুটা এগিয়েছিল, বিশ শতকের গোড়া থেকে এই অবস্থা আরও পালটিয়ে যায়। এই শতকের সূচনায় রাজনৈতিক দপ্তরের অজস্র নথিপত্রের মধ্যে কিছু নথির ওপর 'গোপন' তকমা লাগানো হল। সাধারণ দলিল দস্তাবেজের তুলনায় এই সমস্ত 'গোপন' নথির ধার ও ভার অন্যরকম ছিল। রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম প্রশাখা 'আই বি' তৈরি করে এর দলিল দস্তাবেজ গোপন হিসাবে চিহ্নিত হল। কেন? এর উত্তর পরে খুঁজব।

রাজনৈতিক দপ্তর যে সমস্ত বিষয়ের ওপর নজরদারি করত তার মধ্যে পাওয়া যায় কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রাজপুরুষদের দেখভাল ও ছোটোনাগপুর, ওড়িশা'র করদ রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিকিম, ভুটান বিষয়ক ঘটনা, প্রাক্তন রাজা, মহারাজা ও নবাব উত্তরপুরুষদের রাজন্যভাতা প্রদান ও এঁদের মৃত্যুতে শোকযাত্রায় অর্থ সাহায্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারি সম্মেলন,

ইউরোপীয় আধিকারিকদের মৃত্যুর খতিয়ান, দত্তক নেওয়া, বিদেশি প্রত্যর্পণ, রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রকাশনার ওপর নজরদারি, অনুগৃহীত ব্যক্তিকে রাজ খেতাব প্রদান ইত্যাদি, বিশ শতকে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আপত্তিজনক প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ, রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে পাক্ষিক প্রতিবেদন তৈরি, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আবেদন পরীক্ষা করা, রাজনৈতিক আশ্রয়, মক্কায় হজ যাত্রা, রাজ উপাধি প্রদান ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

ওই তালিকা দেখে আমরা বুঝতে পারি রাজনৈতিক দপ্তরের হাতে কী ধরনের দায়িত্ব ছিল যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অনিবার্যভাবেই পালটিয়ে যেত বারেবারে। এই সময়ের ঝঞ্ঝামুখর দিনে এই দপ্তরই ছিল সব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, বিপ্লবীদের খোঁজখবর রাখা এই দপ্তরেরই কাজ ছিল। আমরা কয়েকটি নথির ওপর নজর দিতে পারি।

কোন তথ্য দিয়ে এই লেখা শুরু করব? সব তথ্য সময়ের বিচারে সমান গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অতীত ঘটনা হিসেবে সতত স্মরণযোগ্য। আর্কাইভস-এর ভাঁড়ারে সব কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখ, অপরাধ, শাস্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা, যুদ্ধ বা শান্তির বাণী।

অপহরণের সংবাদ দিয়ে এই আলোচনা শুরু করা যায়। নারী অপহরণ সবকালেই ছিল, আমাদের আলোচনার কালেও। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও দার্জিলিং থেকে এক গৃহবধূ ও মাহুত অপহৃত হয় ১৮৬০-৬১ সালে। দার্জিলিং থেকে জনৈক লক্ষ্মণ দাস বৈরাগীর স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়, পুলিশি তৎপরতায় অপরাধী ধরাও পড়ে এবং শাস্তি হয়, ১৮৬০ সালেব ঘটনা (ডিসেম্বর ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ১৩২–৩৫)।

ভুটিয়ারা কোচবিহার থেকে একসঙ্গে চার মাহুতকে অপহরণ করেছিল, কী হয় এর ফলে? প্রয়োজনীয় তথ্য আছে রাজনৈতিক দপ্তরের এই সময়ের প্রতিবেদনে (অক্টোবর ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ৬–৮)।

কোচবিহারের কথা যখন উঠল তখন গুরুগম্ভীর বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যায়। এই সময় কোচবিহার ও অন্যান্য করদ রাজ্যের আইনানুগ উত্তরাধিকারীর অভাবে দত্তক উত্তরাধিকারী নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় সরকার থেকে। কোচবিহারের সঙ্গে কটকের ষোলোটি করদ রাজ্যের রাজাদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বড়ো ধরনের ঘটনা এটি (এপ্রিল ১৮৬২, ক্রমিক সংখ্যা ২৫–২৮)।

রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সরকারের অনুগত ও সমাজের মান্যগণ্যদের রাজ উপাধিতে ভূষিত করা। ব্রিটিশ রাজারানির প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসাবে মূলত এই সমস্ত রাজখেতাব দেশের প্রভাবশালীদের প্রদান করা হত। ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা করে রাজখেতাব মিলেছে এমন উদাহরণ মেলা কঠিন।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উত্তরপুরুষ রাজা রাধাকান্ত দেব এমনই এক রাজ অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। রাধাকান্তের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর

সুসম্পর্ক ছিল। রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার বিরোধিতা তিনি করলেও ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধতা তিনি করেননি। অথচ রাধাকান্তের পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। রাধাকান্তের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক কীর্তি *শব্দকল্পদ্রুম* রচনা। উল্লেখ্য, সরকার যে বহুবিবাহ বন্ধে আইন গ্রহণ করেনি সেখানেও রাধাকান্তের অবদান ছিল।

সুতরাং এমনই অনুগত ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে ব্রিটিশ প্রশাসন রাজখেতাব দিতে ভুল করেনি। ১৮৬৭ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই নথিতে গভর্নর জেনারেলকে লেখা রাজা রাধাকান্তের চিঠি পাওয়া যাবে (মার্চ ১৮৬৭, ক্রমিক সংখ্যা ৪৬–৪৭)।

একথা লিখতে বাধা নেই যে বাংলা দেশের ধনাঢ্য রাজপরিবারগুলি রাজভক্ত ছিল। এমন একটি পরিবার ছিল মুক্তাগাছার আচার্যচৌধুরি বংশ। এই পরিবারের সূর্যকান্ত সরকারের অনুগত হলেও দেশ ও দশের কথা ভাবতেন। এমন মানুষ খেতাব পাওয়ার অধিকারী। ১৮৮০ সালে সূর্যকান্তকে রাজখেতাব দেওয়া হয় (মে ১৮৮০, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৬–১৮)। যোগ্য ব্যক্তিকে রাজখেতাব দিতে ব্রিটিশ শাসককুলের যেমন আপত্তি ছিল না, তেমনই কারোর ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেদের আভিজাত্য বাড়াতে দিতে ব্রিটিশ রাজের পছন্দ ছিল না। আর ছিল না বলেই বর্ধমানের মহারাজা আফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুরকে তাঁর নামের আগে 'হিজ হাইনেস' ব্যবহার করার অনুমতি না দিয়ে ব্রিটিশরাজ রাজা প্রজার মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছিল (ওই, জুন ১৮৮৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ৬৭)।

রাজখেতাব থেকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি ঔপনিবেশিক আর্থিক বদান্যতার দিকে। যাঁরা একসময় এ দেশের শাসক গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন সেই সমস্ত পরিবারের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শন করা এই সময়কার নব্য শাসকগোষ্ঠী তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। রাজন্য ভাতা দেওয়া বা রাজপরিবারের কারোর মৃত্যুতে শেষ যাত্রায় অর্থ সাহায্য করা সেই দায়িত্বের মধ্যে ছিল।

সরকার কী পরিমাণ বার্ধক্য ভাতা দিতেন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দির বা কলকাতায় স্থানান্তরিত অযোধ্যা বা মহীশূরের রাজা মহারাজার উত্তরপুরুষদের? এই সংবাদ বেদনার। শোক মিছিলে অর্থ সাহায্য করা ব্রিটিশ রাজপুরুষ বা প্রশাসনিক কর্তারা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই নিয়েছিলেন। এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে এইসব তথ্য পাওয়া যাবে। উদাহরণ দেওয়া যায়।

মহারাজা টিপু সুলতানের পৌত্রীর অন্ত্যেষ্টিতে কত খরচ হয়েছিল? এমন তথ্য জানা আমাদের কাছে জরুরি না হলেও আমরা এই খোঁজ নিতে কৌতূহলী হয়ে উঠি। রাজনৈতিক দপ্তরের ১৮৮১ সালের নথিতে এই সংবাদ আছে (জুলাই ১৮৮১, ক্রমিক সংখ্যা বি ৬৮–৬৯)।

আমি উল্লেখ করেছি রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে মুর্শিদাবাদের রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যাদের বার্ধক্যভাতা ও সম্পর্কিত বিষয়ের চমক জাগানো তথ্য আছে। এই পরিবারের সরকারি দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকার বেদনাদায়ক ইতিহাসের

খোঁজ এই সময়ের নথিতে মিলবে।

রাজপরিবারের কথা থাক। বাংলা দেশের ধনকুবের জগৎ শেঠ পরিবারের কথা বলা যায়। ১৮৬৫ সালে এই পরিবারের উত্তরপুরুষদের জন্য ভারত সচিব 'লাইফ পেনশন' মঞ্জুর করেন। পরিমাণ ছিল মাসিক ৮০০ টাকা। ১৮৬৫ সালের অক্টোবরের নথিতে এই তথ্য পাওয়া যাবে। এই পরিবারের বার্ধক্য ভাতা নিয়ে আরও তথ্য পাওয়া যাবে, ১৮৮২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের নথিতে (ওই, অক্টোবর ১৮৬৫, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫৪; সেপ্টেম্বর ১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা বি ৮৯–৯১; নভেম্বর ১৮৮২, ক্রমিক সংখ্যা বি ১০৭)।

মুর্শিদাবাদ নিয়ে ব্রিটিশ রাজের উৎসাহ কখনও যায়নি। এখানকার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক সরকার সতত সচেতন ছিল। এখানে সরকারি প্রতিনিধিও থাকতেন। ১৮৭৬-এ ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সরকারকে তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠান যা এক সময়ের বাংলার এই রাজধানীকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে (ওই, অক্টোবর ১৮৭৬, ক্রমিক সংখ্যা ৮–১৩)।

মুর্শিদাবাদের সমাজ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান। বিখ্যাত খোশবাগ ও রোশনবাগ সমাধিতে অনুষ্ঠিত এমনই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা ১৮৯২ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে পাওযা যাবে (ওই, আগস্ট ১৮৯২, ক্রমিক সংখ্যা ১১১–১১২)।

মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা দার্জিলিং-এর 'ঘুম'-এর দিকে নজর দিতে পারি। 'ঘুম'-এর বৌদ্ধ মঠমন্দির এই অঞ্চলের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনধর্ম ও মঠের কথা রাজনৈতিক দপ্তরের ১৮৮৬ ও পরবর্তীকালের নথিতে পাওয়া যাবে (ওই, নভেম্বর ১৮৮৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৩২–৩৪; ওই, অক্টোবর ১৯০৭, ক্রমিক সংখ্যা বি ৮৭–৮৮)।

খোশবাগের ধর্মীয় উৎসব বা ঘুমের বৌদ্ধ মঠ নয়। এবার আমরা দেখব অন্য নথি। আমি লিখেছি ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাঙালি ভদ্রলোক ও রাজন্যবর্গের খামতি ছিল না। রাজারানির অনুগ্রহ এঁরা চাইতে পারতেন। কিন্তু একটু বিসদৃশ লাগে যখন দেখি কলকাতার বৌদ্ধিক সমাজ বা লিটারারি সোসাইটি ভক্তিভরে ইংল্যান্ডেশ্বরী বা রানির জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে কলকাতা বা বাংলা দেশের পক্ষ থেকে। এই সময়ের বাঙালিদের রাজভক্তির পবিচয় স্বয়ং রাজারানি জানতেন—এমন ভাবা যায়। (ওই, জুন ১৮৮৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৪১; আগস্ট ১৮৮৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ৫৭–৫৮)।

আমি লিখেছি স্থায়ী দলিলপত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক মনন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের ছবি সরকারি নথি ভিন্ন আর কোথায় এমনভাবে ধরা পড়ে? সরকারি নথি থেকেই আমরা জানতে পারি সিংভূম-এর কোনো সম্প্রদায়ের বিয়ের রীতিপদ্ধতি কীভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পালটিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক

দপ্তর ওই পরিবর্তন নথিবন্ধ করেছিল (এপ্রিল ১৮৬৮, ক্রমিক সংখ্যা ৬৯–৭১)।

আবার ওই দপ্তরের নথিতে পাওয়া যাবে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের প্রতি কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালিদের মনোভাব। ১৮৯৩-এ ডিউক অভ ইয়র্ক-এর বিবাহ স্মরণে এই সময়ের কলকাতার অন্যতম ধনী রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লন্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কৃতজ্ঞতার নমুনা হিসাবে (জুলাই ১৮৯৩, ক্রমিক সংখ্যা বি ২৭–২৯)।

আসলে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। রাজপরিবারের কারোর বিয়েতে যেমন অর্থ সাহায্য করতে উচ্চবিত্তের মানুষজনের অসুবিধা হত না, তেমনই কারোর সিংহাসন প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দের সীমা থাকত না। সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৩ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের রাজা হন। তারপর ?

সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন প্রাপ্তির ঘটনায় সারা বাংলা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র দেখলে বোঝা যায় বাংলা দেশের তেত্রিশটি পুরসভা কীভাবে এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সরকারি প্রতিবেদন দেখলে মনে হয় আমাদের ঘরের মানুষ যেন রাজা হয়েছেন।

লাগামছাড়া উচ্ছ্বাস এমনই ছিল যে রাজার মঙ্গল কামনায় বাংলা দেশের এক আধা গ্রাম আধা শহর ইছামতীর তীরের ছোটো টাকীর পুরসভার উদ্যোগে এখানে হরি সংকীর্তনের দল পথে নেমেছিল। বাংলা দেশের অন্যান্য পুরসভার চিত্র একই ছিল। ওড়িশা'র কথা বলা চলে।

ওড়িশার বিভাগীয় প্রধান স্বয়ং কে. জি. গুপ্ত বাংলার মুখ্যসচিবকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানিয়েছিলেন নতুন রাজার অভিষেকে এই অঞ্চলের মানুষের প্রতিক্রিয়া। কে. জি. গুপ্ত মুখ্য সচিবকে লিখেছিলেন : '...I gave a dinner party to officials at night followed by a garden party on the afternoon of the 2nd (January) which was very largely attended' (ওই, জুলাই ১৯০৩, ক্রমিক সংখ্যা ২৫)।

ওই সবই ছিল সরকার অনুমোদিত সংস্থা। ওই সমস্ত সংস্থার মনোভাব বোঝা যায়। কলকাতার বিখ্যাত মানুষজন ওই ঘটনায় উৎফুল্ল হয়েছিলেন এমন উদাহরণও পাওয়া যাবে এই দপ্তরের নথিতে (ওই, মার্চ ১৯০৩, বি ৪৪–৫০)।

রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম শাখা ছিল 'পুলিশ'। এই সময়কার পুলিশ শাখার নথিতে বিচিত্র ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্যের মধ্যে আছে 'রেল দুর্ঘটনা', দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীর শারীরিক পরীক্ষার আইন প্রণয়ন, ভারতীয় পুলিশ আইন, আঙুলের ছাপ নিয়ে অপরাধী শনাক্তকরণ, দেশের সাধারণ শান্তি বজায় রাখা, রথযাত্রার সময় সুষ্ঠু পুলিশি ব্যবস্থা, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, ভবঘুরে আইন ও কলকাতায় বারবনিতাদের ওপর নজরদারি ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে পুলিশ শাখার কাজের ধার ও ভার খোদ রাজনৈতিক দপ্তরের তুলনায় ভিন্ন মানের হলেও সাযুজ্যপূর্ণ ছিল।

রেল ও দুর্ঘটনা সমান্তরাল পথে চলত। দুর্ঘটনা এখানে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির শারীরিক পরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অথচ প্রশাসনিক ও আইনগত দিক থেকে এমন বিধি প্রণয়ন করা জরুরি ছিল। ১৮৬১ সালে পুলিশ শাখা এই ধরনের এক গুচ্ছ আইন গ্রহণ করে (ওই (পুলিশ), জুলাই ১৮৬১, ক্রমিক সংখ্যা ৯০–৯১)। পুলিশ শাখার পরিচিত দায়িত্ব ছিল সাধারণের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা। শান্তি ভাঙলে কি শাস্তি হওয়া উচিত বা শান্তি না-ভাঙার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এ বিষয়ে রাজনৈতিক দপ্তর ১৮৩০ সালে প্রথম আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে পুলিশ নয়, রাজনৈতিক দপ্তরের বিচার শাখা (রাজনৈতিক (বিচার), মে ১৮৬০, ক্রমিক সংখ্যা ৪৭৪–৭৫)।

একটা অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখা যেমন স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে জরুরি ছিল, তেমনই দেশের শান্তি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাও আরও জরুরি ছিল। তবু প্রশাসনের নজর এড়িয়ে অনেক জায়গায় দাঙ্গা বাধত, হিন্দু মুসলমানের সামাজিক সম্প্রীতি বড়ো রকমের প্রশ্নের মুখে এসে পড়ত। এই দাঙ্গার সময় পুলিশ কি করত? ওড়িশার ভদ্রক ও বর্ধমানে এমনই দাঙ্গার বিবরণ আছে রাজনৈতিক দপ্তরের পুলিশ শাখায় (ওই, জুলাই ১৮৯৪, ক্রমিক সংখ্যা ২১–৪৩)।

অপরাধীদের নানাভাবে ধরা হয়। কিন্তু আঙুলের ছাপ নিয়ে? ১৮৯৬ সালে পুলিশ শাখা এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে (ওই, জুলাই ১৮৯৬, ক্রমিক সংখ্যা বি ১৭৭–৭৮; এপ্রিল ১৮৯৯, ক্রমিক সংখ্যা ১০–১১)।

পেশায় যারা অপরাধী তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য রাখা পুলিশের পক্ষে অপরিহার্য। আর এই অপরিহার্য কাজটি ঔপনিবেশিক পুলিশ করেছিল অত্যন্ত দক্ষতায়। অপরাধীদের শ্রেণি বিভাগ করে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য 'কার্ড'-এ তুলে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯০০ সালে (ওই, ডিসেম্বর ১৯০০, ক্রমিক সংখ্যা ৪১–৪২)।

বিশ শতকের শুরুতে শহর কলকাতার পুলিশ বিব্রত হয়ে উঠেছিল বারবনিতাদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিয়ে। এদের রাশ টানার ব্যবস্থা নেওয়া প্রশাসনের পক্ষে দায় হয়ে উঠল। ১৯০১ সালে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে এল (ডিসেম্বর ১৯০১, ক্রমিক সংখ্যা ৭৪–৭৬)। বিশ শতকে আমরা অন্য ছবি দেখব।

বিশ শতক : রাজনৈতিক 'গোপন' নথিতে রাজবিরোধী আন্দোলনের খণ্ডচিত্র

আঠারো-উনিশ শতকে কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের বিভিন্ন দপ্তরের কিছু নথিপত্রের সাহায্যে আমি চেষ্টা করেছি ওই সমস্ত নথি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের গুরুত্ব তুলে ধরতে। অজস্র নথিপত্রের মধ্য থেকে এমন কিছু তথ্যের সন্ধান করেছি যা একই সঙ্গে সরকারি কাগজপত্র সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বাড়াতে ও সেই সময় সম্বন্ধে অনেকাংশে অবহিত করতে পারে। পরিবর্তিত সময়ের ছবি পাওয়া যায় সরকারি দলিলের অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে।

সরকারি নথি সম্বন্ধে আমাদের সীমিত ধারণা পালটিয়ে যাবে যদি আমরা জেনে নিতে পারি আমাদের সুখপাঠ্য ইতিহাসের স্বরূপ প্রশাসনের দলিল দস্তাবেজের পাতায় কীভাবে অক্ষর শব্দ বাক্যের আকারে শৃঙ্খলিত থাকে। ঔপনিবেশিক সরকার তাদের শোষণ, আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা আর ওই শোষণের বিরুদ্ধে আমাদেরই প্রতিরোধের কাহিনি তাদের নথির পাতায় একই সঙ্গে লিখে রেখেছিল। তারা কি জানত উনিশ-বিশ শতকে তাদের তৈরি নথিপত্র আমাদেরই গর্বিত করবে, বাংলা বাঙালির অহংকারী হওয়ার মতন ঔপনিবেশিক যুগের নথিপত্রে একই সঙ্গে সুখকর ও বেদনাদায়ক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় স্বাধীন যুগের মসনদে বসে। এখানেই মহাফেজখানার মজা আর ইতিহাসের উল্লাস।

যে সমস্ত বিষয় নিয়ে উনিশ শতকের আলোচনা যেখানে শেষ করেছি, বিশ শতক সেখান থেকে শুরু করতে পারতাম। এখানে দলিলের ধারাবাহিকতা থাকত ঠিকই, কিন্তু তাতে দলিল দস্তাবেজের বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব ধরা পড়ত না। নথিপত্রের বৈচিত্র্য বোঝাতে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, ব্রিটিশ রাজের অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিছু নথিপত্রের ওপর দৃষ্টি দেব। বিশ শতকের এই সমস্ত নথিপত্রে এক পরাধীন জাতির নিরন্তর সংগ্রাম আর যুদ্ধ জয়ের তথ্য আছে। এই সময়ের নথিতে সন্ধান পাওয়া যাবে এক নতুন সমাজ দর্শনের নব নব চিন্তা ও চেতনা ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামের সংবাদ।

১

বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারত ভূমির এই অঙ্গরাজ্য জুড়ে

যে নিরন্তর সংগ্রাম শুরু হয় তার কাহিনিতে রাজনৈতিক দপ্তর সমৃদ্ধ। এই শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য সরকারি স্তরেও উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পবিবর্তন এসেছিল। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে এই সময় রাজনৈতিক দপ্তরের কিছু সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ নথি 'গোপন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বঙ্গভঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা যে কোনো ধবনের সরকারি বিরোধিতার দলিলপত্র জরুরি ও 'গোপন' মোড়কে রাখা হল। চরিত্র অনুযায়ী স্থায়ী অর্থাৎ 'এ' শ্রেণিভুক্ত হলেও যেহেতু 'গোপন' তকমা'ব আড়ালে ছিল ঠিক সেই কারণে এই সমস্ত নথি ছাপানো হত না। অন্যান্য 'এ' শ্রেণিভুক্ত নথির মতন। আমি এইসব গোপন নথির কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব, 'ফাইল নং' উল্লেখ না করে।

এই সময়ে রাজনৈতিক দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যে কোনো প্রকার সরকার বিবোধিতা--সে গান গাওয়া হতে পাবে, হতে পারে সরকার বিরোধী যে কোনো প্রকার প্রকাশনা বা মাঠে ময়দানে ভাষণের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা, প্রশাসন মনে করলে ওই গান, ওই ভাষণ বা লেখনী স্তব্ধ করে দিতে পারত। বঙ্গভঙ্গ ভিন্ন, বিশ শতকের সূচনা থেকে জন্ম নেওয়া বিপ্লবী আন্দোলন, পরবর্তীকালে সাম্যবাদী ভাবনাচিন্তার প্রসার, বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনও এই সমস্ত ধ্যান-ধারণার সমর্থনে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ওপর সরকারের শ্যেনদৃষ্টি ছিল। এই সমস্ত ঘটনা ও তার ওপব তৈরি নথির ওপর 'গোপন' এই ছাপ দিয়ে প্রশাসন যে দলিল দস্তাবেজ তৈবি করেছিল তাব সঙ্গো প্রথাসিদ্ধ নথিপত্রের মিল ছিল না।

রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন নথিপত্রে বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি আন্দোলন ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে যে তথ্য আছে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব নয়, আমি এখানে শুধুমাত্র বিশেষ কিছু দলিলের কথা লিখব শুধু এই সমস্ত নথিপত্রের গুরুত্ব বোঝাতে।

ওই সমস্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে বিশ শতকের সূচনা থেকে বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যাবে। কীভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল তার ছবি আছে এই সময়ের নথিপত্রে। দেশভাগের মতন ঘটনা যে কোনো সংবেদনশীল জাতিকে যুগপৎভাবে হতাশ ও বিদ্রোহী করে তোলে--বাঙালিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু ঘটেনি। বাংলা ভাগকে কেন্দ্র করে একটা জাতির উত্তাল হওয়ার, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনিতে সরকারের 'গোপন' নথিপত্র পূর্ণ।

বঙ্গভঙ্গ কেন? ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ কি অনিবার্য ছিল? এমন সব প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার জন্য সরকারি নথির সাহায্য নিতে হয়। প্রশাসন মনে করেছিল বাংলা বিভাগের দীর্ঘ ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্য থেকে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাজের জন্য এই বিভাগ অনিবার্য। বিহার, ওড়িশা, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে যে বিরাট প্রদেশের ভার প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হত তার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সরকারি নথিতে (১৯০৩) আলোচনা আছে। প্রশাসনিক কারণে

বাংলা ভাগ হলে ক্ষতি কি? নথিতে এর উত্তর আছে।

১৯০৪ সালে বাংলা সরকারকে বাংলা বিভাগের ভৌগোলিক সীমারেখা হ্রাস করা নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করতে দেখি। এ বিষয়ে একাধিক নথিব সন্ধান পাওয়া যাবে 'গোপন' নথিতে।

বঙ্গভঙ্গের কারণ প্রশাসনিক না রাজনৈতিক তার উত্তর খুঁজবেন ঐতিহাসিকরা; এই ভাগ রদ করা যায়নি। রদ করা যায়নি ক্ষোভ, যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা বাংলা, সরকার বিরোধী সভা সমিতি সংগঠন গড়ে উঠেছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, গঠন করা হয়েছিল 'স্বদেশি' তহবিল। স্বাভাবিক ও অনিবার্য কারণে এই সমস্ত সভা সমিতি নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগঠনের ইতিহাস রচনা করা হয়, এই ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে সংগঠনের লক্ষ্য ও কার্যাবলি। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাংলা ভাগের মতন ঘটনা দুই বাংলার বা পূর্ব-পশ্চিমের মানুষজনের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পর এক নিষেধের বেড়াজালে দুই বাংলার মানুষজনকে ঘিরে ফেলা হয়। নিষেধের রাজ্যে ছাত্রদের পায়ে বেড়ি পরানো হয়। সরকারি নথিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

ওই ঘটনায় বাংলা প্রশাসন ছাত্রদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অস্থায়ী মুখ্যসচিব আর ডব্লিউ কার্লাইল অক্টোবর ১০, ১৯০৫-এ তাঁর এক নির্দেশে বাংলা দেশের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিলে তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমন শর্ত ওই বিজ্ঞপ্তি বা সার্কুলারে ছিল। 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে কুখ্যাত এই সতর্কবার্তা অবশ্যই বঙ্গভঙ্গের গাম্ভীর্য প্রমাণ করে!

রাজনৈতিক দপ্তরের ১৯০৬ সালের এক নথিতে 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই গান ১৯০৫ সালের বিক্ষুব্ধ সময়ে যেভাবে সরকার বিরোধী চিন্তা চেতনায় এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার জন্ম দিয়েছিল তার নমুনা সরকারের কাছে ছিল না।

ওই কুখ্যাত বিজ্ঞপ্তি ও কঠোর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের ধার ভার বেড়েছিল দিনে দিনে। কীভাবে স্বদেশি ভাবনা সরকার বিরোধী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল তার নজির আছে এই সমস্ত নথিতে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কোম্পানি তাদের তৈরি চটি জুতো কৌশলে দেশীয় বলে বিক্রির চেষ্টা করেছিল, সর্বোপরি এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সময়ের দলিল দস্তাবেজে।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে বা বয়কটের ডাকে গ্রামবাংলার মানুষজন কীভাবে সাড়া দিয়েছিল বা স্বদেশিয়ানার সঙ্গে কোনোপ্রকার ছল-চাতুরি করা যেত না, করলে কি হতে পারত?

সুতরাং বাংলা দেশের কোনো এক গ্রামের ব্যবসায়ীরা যখন নারায়ণ-লক্ষ্মীর নামে

শপথ নিয়েও বিলাতি বস্ত্র বিক্রি করে তাদের এই শপথ ভাঙে তখন তাদের সামাজিক দিক থেকে বয়কট করা হয়। সরস্বতী পুজোয় এদের বাড়িতে পুজো করার পুরোহিত পাওয়া যায়নি, নাপিত, ধোপাও এদের জন্য বন্ধ করা হয়। এদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দপ্তরের নথি থেকে এমন তথ্যের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

এবার অন্য তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গাভঙ্গের হোতা যদি লর্ড কার্জন হন, তাহলে এর বাস্তবায়নের ভার ছিল বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে। নিশ্চিত মনে বঙ্গাভঙ্গা বাস্তবায়িত করে ছোটোলাট ফ্রেজারের মুখে যে তৃপ্তির ছায়া দেখা গিয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কোন ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয়?

স্বদেশি'র সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যদি সামাজিক দিক থেকে ওই বিশ্বাসঘাতকদের 'একঘরে' করে দেওয়া, তাহলে লেখা যায় বাংলা বাঙালির সঙ্গো ভৌগোলিক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যাঁরা বা যিনি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন তাঁদের জন্য শাস্তিও ঠিক করা ছিল।

ডিসেম্বর ৬, ১৯০৭ সালে ভ্রমণরত বাংলার ছোটোলাট এন্ড্রুজ ফ্রেজারের ট্রেন মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে লাইনচ্যুত করে ছোটোলাটকে দুর্ঘটনার মুখে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনার মধ্যে একটা জাতির ঘৃণা আর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এমন ভাবা যেতে পারে। ব্রিটিশ রাজপুরুষের চোখে এখানে সন্ত্রাসের ছবি ভেসে উঠেছিল। ওই ঘটনার নেপথ্য নায়ক কারা ছিলেন? বারীন ঘোষ, বিধুভূষণ সরকার, প্রফুল্ল চাকী'র মতন বিপ্লবীদের নাম উঠল ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকায়। একদিকে স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া আর অন্যদিকে বিপ্লবীদের এক নিশ্চিত আবির্ভাবে বাংলা দেশের দেহমনে এক সুতীব্র আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল। 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে' যে ঝড় উঠেছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ নিশ্চিতভাবে ভেসে যেতে বসেছিল। ঔপনিবেশিক অঙ্গারাজ্য হিসেবে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব ছিল বঙ্গাভঙ্গা নিয়ে ঘটতে থাকা সব কিছু কেন্দ্রকে জানানো। ১৯০৭-এ কেন্দ্রকে বঙ্গাভঙ্গা বিরোধী ও বয়কট নিয়ে যে প্রতিবেদন পাঠানো হয় সেখানে প্রত্যাশা মতো বাংলা দেশের এক সুগভীর অস্থিরতার ছবি ফুটে উঠেছে।

বঙ্গাভঙ্গা কোনো বাঙালি মেনে নিতে পারেনি। অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের আপামর মানুষ প্রতি মুহূর্তে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বঙ্গাভঙ্গা বাঙালির মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এই দিনটার স্মরণে 'শোক' দিবস পালন করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল। ১৯০৭ সালে বঙ্গাভঙ্গা দিবস পালন করা হয়।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯০৮ সালে আগস্ট ৭-এ কলকাতার গ্রিয়ার পার্কের স্বদেশি সভা নিয়ে সরকারি প্রতিবেদনে প্রশাসনের ভয়ের ছবি আছে। কলকাতার বিভিন্ন পার্ক ময়দানে সরকার এই ধরনের সভা নিষিদ্ধ করা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল।

১৯০৮-এ আগস্টে কলকাতার নগরপাল মুখ্যসচিবকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন: (১) কীভাবে স্বদেশি সভায় ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছেন, (২) সাধারণ মানুষজনের ওপর বিশেষ করে ছাত্রদের ওপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাব, (৩) ঠিক সন্ধ্যার মুহূর্তে এই সমস্ত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয় বলে পুলিশের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না, কেন? নগরপাল কারণ হিসাবে 'মিসারেবলি লিট' এবং 'টোটালি আনলিট' এই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন।

গ্রিয়ার পার্কের স্বদেশি সভার প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয়েই, এই সভার রেশ না কাটতেই সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল ভবিষ্যতে সভা সমিতির ওপর। ১৯০৮ সালের আগস্ট ২২-এ ১৪৪ ধারা অনুসারে কলকাতার মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতার মাঠ ময়দানে রাজনৈতিক সভাসমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

ওই একই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেন চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক। এই দুই বিজ্ঞপ্তির ফলে কলকাতা ও শহরতলির অনেক মাঠ ময়দান ও অন্যান্য 'পাবলিক প্লেস'-এ সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হল। যে সমস্ত মাঠ ময়দান ওই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ছিল : বালিগঞ্জ ময়দান, শিকদার পাড়ার মাঠ, হরিশ মুখার্জী পার্ক, সুবার্বান হসপিটাল রোডের উত্তব দিকের রাস্তা, চেতলা সেন্ট্রাল রোডের উত্তর-দক্ষিণ দিকের মিউনিসিপ্যাল স্কোয়ার। এই সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে ছিল ২৯৪/১, ২৯৪/২ আপার সার্কুলার রোডের 'ফেডারেশন হল'।

ওই সময়ের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে বিশেষ একটি নথির কথা লেখা যায়। এই নথি কলকাতা ও বাংলা দেশের কিছু প্রভাবশালী ও পরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কিত। এঁদের সম্পর্কে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার পুলিশ প্রধান ও কলকাতা পুলিশের নগবপালকে এক নির্দেশে বলা হয় : '...to keep a close watch on the movement & doings of the...prominent persons connected with political agitation.'

ওই সমস্ত 'প্রমিনেন্ট' ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন : সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

ওই নথিতে বাংলা দেশের আরও কিছু বিক্ষুব্ধদের ঠিকানাসহ পরিচয় দেওয়া আছে। এই তালিকার ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ললিতমোহন ঘোষাল, পাঁচকড়ি ব্যানার্জী, রামানন্দ চ্যাটার্জী, রাজেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পি. মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুন্দরীমোহন দাস, অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আশুতোষ দাস, পূর্ণচন্দ্র সেন প্রমুখ। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পাওয়া যাবে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম সম্পর্কিত রাজনৈতিক দপ্তরের (গোপন) নথিতে।

বঙ্গভঙ্গ ঘিরে যে উন্মাদনা সারাদেশে তৈরি হয়েছিল তাতে শামিল হয়ে পড়েছিলেন অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বহুদিনের লালিত ঐতিহ্য আর হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ইতিহাস মিলেমিশে যে সামাজিক বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল তা নষ্ট হতে দিতে চাননি এই সমস্ত প্রৌঢ় মানুষজন। ইতিহাস আর ঐক্যের সাক্ষী ছিলেন এঁরা, প্রশাসনে যুক্ত থেকে সরকারের বিরোধিতা করা মার্জনাহীন

অপরাধ, যে কোনো সরকারি কর্মীই তা জানতেন। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার উত্তরকালে রাজনীতিতে যোগ দিতে বা সরকারের বিরুদ্ধতা করতে বাধা কোথায় ?

সুতরাং ১৯০৮-এর এক সরকারি নথি থেকে জানতে পারা যায় কীভাবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সরকার মেনে নিতে পারেননি প্রৌঢ় এই সমস্ত প্রাক্তন রাজকর্মীদের কর্মকাণ্ড। এদের কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮-এ এক সরকারি আদেশনামায় বিভাগীয় প্রধানদের এ বিষয়ে সতর্ক হওযার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাঁচি, ওড়িশা, কটক, দার্জিলিং ও চুঁচুড়া থেকে সরকার যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল সেখানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা যে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন এমন কোনো সংবাদ ছিল না অবশ্য।

সাধারণ থেকে বিশেষে যাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সারা দেশের উত্তাল হওয়ার সঙ্গে সরকারি বক্তব্য আমরা জেনেছি। বাংলা দেশের অনেক মহকুমা শহরের মধ্য থেকে দু-একটা মহকুমা শহরের কথা জেনে নিতে বাধা নেই। এই সময়ের বাংলা দেশের অন্যতম মহকুমা শহর হিসেবে ময়মনসিং জেলার, 'কিশোরগঞ্জ' পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসে। জেলা প্রশাসন কি চোখে 'কিশোরগঞ্জ'কে দেখেছিল। এখানকার কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতি কীভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল ?—সরকার সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে তৈরি করেছিল এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে বাংলা দেশের এই মহকুমা শহর আমাদের কাছে নতুনভাবে প্রতিভাত হয। এই ইতিহাস আমাদের গর্বিত করে।

পূর্ব বাংলার 'কিশোরগঞ্জ' থেকে আমরা ফিবে আসতে পারি বর্ধমানে বা প্রেসিডেন্সি বিভাগে। কী ঘটেছিল বর্ধমানে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্য জেলা বা মহকুমা শহবে ? এই ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে জরুরি শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গের বৈচিত্র্য বোঝার জন্য। বঙ্গভঙ্গ কি বাংলা দেশে 'রক্তগঙ্গা' বইয়ে দিতে পেরেছিল ? না পারলেও 'রক্তগঙ্গা' নামের এক প্রকাশনা নিষিদ্ধ হযেছিল, সরকারি নথিতে এ তথ্য পাওযা যাবে।

আমাদের আলোচনা দীর্ঘ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমস্ত নথির মূল বক্তব্য একই ছিল। ব্যক্তি ঘটনা ভিন্নতর হলেও সরকার বিরোধিতা আর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধতা করা বা স্বদেশির জন্য উল্লাস সর্বত্রই সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

সুতরাং বাংলা দেশের হৃদয় হতে উঠে আসা এক চেতনাকে এক সুগভীর আবেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখা হয় অক্টোবর ১৭, ১৯১১ সালে। রাখিবন্ধনের গান আকাশে বাতাসে ১৯১১ সালে যেমনভাবে অনুরণিত হয়েছিল সরকারি নথির ভাষ্যে সেই অনুরণনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, আমরা আপ্লুত হই। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৫-এ স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আবেদন রেখেছিলেন ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে বঙ্গভঙ্গ উৎসব করতে। বঙ্গভঙ্গের অবসান হতে দেরি

হয়নি। বিধির বাঁধন কি কাটা যায়?

২

আমি বঙ্গাভঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্রের উদাহরণ দিয়েছি। ১৯০৫ সালে সরকার বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে প্রশাসন বাধ্য হয়েছিল রাজনৈতিক দপ্তরের অধীনে এক নতুন প্রশাসনিক শাখা গড়ে তুলতে, ১৯০৬ সালে। আই. বি. নামে পরিচিত এই নতুন শাখা আর তার তৈরি নতুন নতুন নথি নিশ্চিতভাবে 'রেকর্ডরুম' বা 'মহাফেজখানা'র জগতে নতুন সংযোজন।

সদ্য গঠিত ওই শাখার নথিপত্রে বঙ্গাভঙ্গাবিরোধী যে তথ্যের সন্ধান পাই আমরা তার সঙ্গে রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন নথিপত্রের অমিল খুব ছিল না। বরং বলাও চলে রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' তকমা দেওয়া নথিপত্র ও সরকারের অন্য স্বাধীন এক শাখার নথিপত্র একে অপরের পরিপূরক ছিল। আই. বি. শাখার নথিপত্রের উদাহরণ তুলে আমরা এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিতে পারি।

১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে উপস্থিত জাতীয় নেতাদের গতিবিধির ওপর নজর রেখে গোয়েন্দা শাখা প্রস্তুত করেছিল এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভারতবাসীর কাল্পনিক 'ভারতমাতা'র ছবি ওই শাখার নথিতে স্থান করে নিয়েছে।

বঙ্গাভঙ্গের উত্তাল সময়ে বাংলা দেশের এক মুকুন্দ দাস ওরফে মুকুন্দলাল দাস কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলার ডাক দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে শুরু করেন। এমন মানুষ যে সরকারের চোখে বিপজ্জনক হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। মুকুন্দ দাস সম্বন্ধে সরকার যা নথিবন্ধ করেছে : '.. One Mukundalal Das has been touring the district of Faridpur and this leader has attracted attention by seditious nature of performance...' পূর্ব বাংলার পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিং উত্তাল ছিল গোয়েন্দাদের চোখে। সরকারের 'চোখে' নেতা, এই মুকুন্দলালের ডাকে অনেকে বোধকরি ঘর ছেড়েছিলেন।

বঙ্গাভঙ্গ রদ হয় ১৯১১ সালে, এবং এই বছরের শেষে কলকাতায় শুরু হয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন। অনিবার্যভাবেই বঙ্গাভঙ্গের মতন ঘটনা এই সম্মেলনের ওপর ছায়া ফেলেছিল। এই সম্মেলনে বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতির ভাষণে বাঙালির প্রাণের মনের কথা ধরা পড়েছিল। তৃপ্ত সভাপতি যা বলেছিলেন : '...we have passed through the vale of tears through the valley of the shadow of death and emerged in to the uplands of life.' ১৯১১ থেকে পিছিয়ে এসে দেখতে পারি অন্য ছবি। এ ছবি বিপ্লবীদের, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের। ব্রিটিশরাজ এ ছবি দেখে খুশি হয়নি—এমন কথা লেখা যায়।

বঙ্গাভঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলির মধ্যে অন্যতম মানিকতলা বা আলিপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত ঘটনা। এই ঘটনার উৎপত্তি অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের মানিকতলার

যৌথ মালিকানাধীন বাগান বাড়িতে। এখানে ধর্মালোচনার পাশে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এবং এই কাজটি করতেন ফ্রান্স ফেরত হেমচন্দ্র দাস। আই. বি'র ১৯০৮-০৯ সালের নথিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য আছে।

১৯০৮ সালের মে মাসে বাংলা বিভাগের পুলিশপ্রধান বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে আলিপুর বোমা মামলা সংক্রান্ত যে চিঠি লেখেন সেখানে তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরির প্রক্রিয়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং খোদ বিপ্লবীদের ইতিহাস জানিয়েছিলেন। এই মামলার তালিকা তৈবি করেন কলকাতার নগরপাল স্বয়ং। ওই তালিকায় যে সমস্ত অপরাধীদের পরিচয় দেওয়া আছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন : অরবিন্দ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র দাস, দেবব্রত বসু, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ।

আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ওই মামলা ও সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে অরবিন্দ মে–জুলাই ১৯০৯ সালে যে বক্তব্য রাখেন রাজনৈতিক দপ্তরে নজর এড়ায়নি তা। এই দপ্তরের নথিতে অরবিন্দ বিষযে অনেক বিস্ফোরক তথ্য আছে। এ বিষয়ে নথির সংখ্যা পাঁচ।

আমরা কিছু নথির কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে কোনো ক্রমিক সংখ্যা ছিল না, যা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। (১) পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগঠন, বিশেষ করে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কথা, (২) ১৯০৯ সালে মৌলবি মজাবুল হকের দেওয়া মেদিনীপুর বোমা মামলা সম্পর্কিত ডায়েরি, (৩) বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা, (৪) যুগান্তর গোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রতিবেদন, (৫) মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র বিষযে বর্ধমান বিভাগীয় প্রধান (কমিশনার)-এর তৈরি প্রতিবেদন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। ১৯০৯ সালে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মূল নথির পাশাপাশি এ সমস্ত নথি প্রশাসনিক ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল।

১৯১০ সালের জেল শাখার একাধিক গোপন নথিতে পাওয়া যাবে সরকারের চোখে বিপজ্জনক বিপ্লবীদের সুদূর আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠানো নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এঁদের মধ্যে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা ছিলেন।

উদাহরণ কত দেওয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক ও আই বি শাখার নথিতে এই সময়ের বাংলা দেশের সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যাবে। আসলে এই সময়ের পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছিল যে সরকার সব কিছুতে বিপ্লবীদের ছায়া দেখত। যেমন উত্তর কলকাতায় মহাকালী পাঠশালা নিয়ে এসময় সরকার চিন্তিত হযে উঠেছিল। প্রশাসন মনে করেছিল এই পাঠশালা বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ডের আখড়া হয়ে উঠেছে। কলকাতা পুলিশের প্রধান চার্লস টেগার্ট মনে করতেন এই প্রতিষ্ঠান হল '..a rendezvous of all political suspects.' মহাকালী পাঠশালা থেকে আমরা আরও দূবে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শান্তির ছায়া ছিল, তবু সরকারের চোখে এখানেও অশান্তি ছিল। শহর কলকাতা থেকে অনেক দূরের এক গ্রামের বিদ্যায়তন জেলা প্রশাসনকে বিব্রত করেছিল কীভাবে? সরকাব এমনই সন্দেহ

পোষণ করত। এখানকার অনেক শিক্ষক সন্দেহভাজনদের তালিকায় উঠে এসেছিলেন। সরকার কীভাবে এই শিক্ষকদের দেখেছিলেন তার বর্ণনা আছে সরকারের গোপন প্রতিবেদনে।

বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড দমনে প্রশাসন যতই কঠোর হয়েছে, বিপ্লবীরা ততই নতুন উদ্যমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন, এঁরা থামতে জানতেন না। আর জানতেন না বলেই ব্রিটিশ প্রশাসন এঁদের ভয় পেত। কার্লাইলের কালা বিজ্ঞপ্তি থেকে মহাকালী পাঠশালা বা শান্তিনিকেতন সর্বত্রই এবং সব সময়েই ছাত্ররা প্রশাসনিক যন্ত্রণার শিকার হতেন। প্রশাসন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভয় পেত। ১৯১৩ সালের এক সরকারি প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি বাংলা দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভে ছাত্র ও শিক্ষকরা কীভাবে অংশ নিয়েছেন।

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি বিক্ষিপ্ত হলেও, এই সমস্ত উদাহরণ সূত্র হিসেবে নিয়ে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব যে বাংলা দেশের প্রতিটি জেলায় বিপ্লবীরা তাদের কর্মকাণ্ডের জাল বিছিয়েছিল। আমরা ফরাসি শাসনাধীন চন্দননগরের কথা বলতে পারি। ১৯১৩ সালের জুলাইতে আই. বি-র পুলিশ সুপার চার্লস টেগার্ট চন্দননগরের বিপ্লবীদের নিয়ে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এই প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে এখান থেকে বিনা বাধায় ব্রিটিশ শাসিত এলাকায় অস্ত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে আলিপুর ও ডালহৌসী বোমা মামলার আসামিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—এমন তথ্য টেগার্টের বক্তব্য এবং তা পাওয়া যাবে রাজনৈতিক দপ্তরেব 'গোপন' প্রতিবেদনে। চন্দননগরের বিপ্লবীদের যাঁরা 'চন্দননগর গ্যাং' নামে পবিচিত ছিলেন, তাঁদের তালিকা ওই প্রতিবেদনে দেওয়া হযেছে।

৩

রাজনৈতিক (গোপন) ও আই. বি. শাখার কাগজপত্রে পাওয়া যাবে 'বাজ বিরোধী' গ্রন্থের নিষিদ্ধকরণের তথ্য। যে কাব্য, নাটক, উপন্যাস সরকারের পছন্দের ছিল না সেই প্রকাশনার ওপর 'সরকার বিরোধী' তকমা লাগিযে নিষিদ্ধ করা হত। এইভাবেই নিষিদ্ধ হযেছিল বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল ও গিরিশচন্দ্রের উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, কবিতা, নাটক। পরে নিষিদ্ধের তালিকায় আসেন রবীন্দ্রনাথ। প্রশাসনিক বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যুক্তি পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে এই সমস্ত সৃষ্টিকর্মের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সরকারি ভযের ছবি। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, নজরুল বা গিরিশচন্দ্র বোমা ছুড়ে বিপ্লবী হননি, এঁদের লেখনী সরকারের কাছে বোমার তুলনায় অবশ্যই ভয়ংকর ছিল। *মৃণালিনী* থেকে *সিরাজদ্দৌল্লা*, *ধূমকেতু*, *বিষের বাঁশী*, *পথের দাবী* বা *প্রলয় শিখা*—বাংলা প্রশাসন অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এই সমস্ত প্রকাশনায়। ১৯৩০'র *বিশ্বভারতী* পত্রিকাও নিষিদ্ধ হয়েছিল।

গত শতাব্দীর বিশের দশকে এদেশের রাজনীতিতে 'অসহযোগিতা'র সূচনা অবশ্যই এ সময়ের অন্যতম প্রধান ঘটনা। অসহযোগ আন্দোলন আপাত দৃষ্টিতে

যতখানি নিরীহ ছিল, অন্তরশক্তিতে ততই কঠিন কঠোর ছিল। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাত্মা গান্ধির অনেক বক্তব্যই চিত্তরঞ্জন দাশ মানতে পারেননি।

ছাত্রদের ওপর অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার বর্ণনা আছে ওই দপ্তরেরই নথিতে। প্রথম দিকে ছাত্ররা এই আন্দোলনের প্রভাবে ভাসলেও পরের দিকে সেখানে ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। বাংলা বিভাগের এক জেলাশাসক তাঁর জেলার স্কুল কলেজ সম্বন্ধে এমনই প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন।

১৯২১'র মার্চে কুমিল্লা জেলাশাসক বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে পাঠানো তাঁর প্রতিবেদনে যা জানিয়েছিলেন : '...Victoria College re-opened today... practically no cases of picketing is in progress... In my opinion the whole situation is very much less serious now than it was fourteen years ago at the time of Swadesh agitation.' স্বদেশি আন্দোলনের স্মৃতি তখনও ব্রিটিশ প্রশাসকদের তাড়া করে চলছিল।

বাংলা দেশ একই সঙ্গে বিপ্লবী ও অহিংসবাদীদের কার্যকলাপে মুখর হয়ে থাকত এই সময়ে। বিপ্লবীরা চেষ্টা করতেন সুযোগ পেলেই তাদের ওপর অত্যাচারের বদলা নিতে।

১৯২৪ সালের কলকাতা পুলিশের নগরপাল চার্লস টেগার্টের অনেক অত্যাচারের সাক্ষী ছিলেন সেই সময়কার বিপ্লবীরা। এমন অত্যাচারীর নিধন স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন।

বিপ্লবী যুগান্তর দলের (হুগলির জ্যোতিষ ঘোষ ও ভূপতি মজুমদার গোষ্ঠী) গোপীমোহন সাহা কুখ্যাত টেগার্টকে হত্যার ছক করেন ১৯২৪-এ। গোপীমোহন তাঁর কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন, টেগার্টকে হত্যার বদলে তিনি হত্যা করেন মি. ডে নামক জনৈক ইউরোপীয়কে। এই ঘটনার ঠিক ষোলো বছর আগে ক্ষুদিরাম এমনই ভুল করেছিলেন। ধৃত গোপীমোহন আশা করেছিলেন তিনি ব্যর্থ হলেও অন্যরা হবেন না।

এই সময়ের নথিপত্রে আরও পাওয়া যাবে চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ দল'-এর কাহিনি। বাবু সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর পৌর রাজনীতির কথায় এই সময়ের নথিপত্র পূর্ণ।

অহিংসা বা হিংসার রাজনীতি নয়, এবার নজর দেওয়া যেতে পাবে এক ভিন্নতর সমাজদর্শনের ওপর। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া রাশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের ঢেউ বাংলা দেশের তটভূমি প্লাবিত না করলেও, নব্য পলিতে বাংলার উর্বর ভূমি ঋদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ের সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে এই সমস্ত তথ্যের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত নথিপত্র থেকে আমরা এ সংবাদও জেনে নিতে পারি ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র কীভাবে এই সমস্ত পত্রপত্রিকার কণ্ঠরোধ করতে এগিয়ে এসেছিল। কোনো পত্রিকা নিষিদ্ধ করার আগে প্রশাসন তার যুক্তি দেখাত নিপুণভাবে।

যেমন *ধূমকেতু* নিষিদ্ধ করার আগে প্রশাসন এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে পত্রিকাটি সরাসরি বলশেভিক মতবাদ প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২০'র দশকের রাজনৈতিক (গোপন) ও আই. বি. শাখার নথিপত্রে এই সময়ে নিষিদ্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, যার মধ্যে *লাঙল* ও *গণবাণী* ছিল, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারা যায়।

১৯২৯ সালের আই. বি. ও রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া থেকে তাঁর শেষযাত্রার দিন পর্যন্ত কলকাতা কীভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে এখানে। সরকারি নথিতে ভুল সংবাদ ছিল না।

ফলত বিশ শতকের সূচনা থেকে যতীন দাসের মৃত্যু পর্যন্ত এই নাতিদীর্ঘ পথে ব্রিটিশ রাজ এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি। সরকারি দলিলপত্রের ওপর নজর রাখলে বোঝা যাবে ব্রিটিশ প্রশাসন কীভাবে সতত উদ্বিগ্ন থাকত বিপ্লবীদের মর্জি মেজাজ নিয়ে। রাজ্য মহাফেজখানায় ১৯৩৪ পর্যন্ত গোয়েন্দা দপ্তরের নথি আছে।

৪

১৯৩০ সালে শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সারা ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। হিংসাবিহীন আন্দোলনের ডাকে অনেকে ঘর ছেড়েছিলেন, ছেড়েছিলেন কোর্ট-কাছারি। বিপ্লব পুরুষের কেন একচেটিয়া হবে? মহিলারা পিছিয়ে ছিলেন না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা বিভাগের প্রতিটি জেলা কীভাবে আলোড়িত হয়েছিল তার পরিচয় আছে এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে। বাখরগঞ্জের মহিলা সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা উচিত—এমন তথ্য এই সময়ের নথিতে আছে।

সত্যাগ্রহের কথা থাক। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা মহকুমার প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই আন্দোলন ব্যর্থ করতে যখন সচেষ্ট ছিলেন, তখনই ঘটল বাংলা দেশের এক বন্দর শহরে এই শতাব্দীর অনেক সাড়া জাগানো ঘটনার অন্যতম—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল। এপ্রিল ১৯, ১৯৩০ সালে এই ঘটনা চট্টগ্রামের ব্রিটিশ আধিকারিকরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের নথিতে পাওয়া যাবে কীভাবে বিদ্রোহীরা রেল ও পুলিশের অস্ত্রাগার দখল নিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা কটা গাড়ি নিয়ে এই অস্ত্রাগার দখল নিতে এসেছিলেন? এমন সংবাদে আমরা চমৎকৃত হই। এই ঘটনা ও পরবর্তী সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল তথ্য আছে রাজনৈতিক ও আই. বি. শাখার নথিতে।

অস্ত্রাগার দখল থেকে আমরা ফিরে যেতে পারি গ্রাম বাংলার মাঠে ময়দানে। বাংলা দেশের কৃষক সম্প্রদায় কীভাবে এক নতুন চেতনায় প্রাণিত হয়ে সরকার বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন তার পরিচয় আছে এই সময়ের নথিতে। উদাহরণ দেওয়া যায়, ১৯৩৭ সালের এক নথি থেকে আমরা জানতে পারি এই বছরে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ

চ্যাটার্জী, মুজফ্ফর আহমেদ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম মুখার্জীর মতন সমাজবাদে বিশ্বাসী তরুণরা। প্রশাসন লক্ষ করেছিল বর্ধমানের কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা প্রভাব ফেলেছে। ১৯৩৮ সালের এক নথি থেকে জানা যায় যে হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের প্রভাবে হাওড়ার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার প্রসার ঘটতে শুরু করেছে—হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে : '...ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের কত কাছে জেলার গ্রামগুলি...সুতরাং বিস্ময়ের ঘটনা নয় যে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা খুব দ্রুত প্রসাব লাভ করেছে গ্রামের অভ্যন্তরে।'

রাজনৈতিক দপ্তরের ১৯৩৭-৩৮ সালের নথিপত্র দেখলে বোঝা যাবে বর্ধমান হাওড়ার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সরকারকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। সরকার স্বীকার করেছিল : '...Communists fomented mass rising on a small scale.' এই সমস্ত আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এন. রায়ের মতন ব্যক্তিত্ব। হাওড়ার শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে সংসদে প্রশ্ন উঠেছিল।

ওই অশান্ত আবহাওয়ায় আমরা সন্ধান করতে পারি মহাফেজখানার বিচিত্র নথিপত্র। রাজনৈতিক দপ্তর ও আই. বি. শাখার মধ্য তিরিশের নথিপত্র সুভাষচন্দ্রের ওপর নানান তথ্যপূর্ণ। আমরা সুভাষচন্দ্রের ওপর রাজনৈতিক দপ্তরের সাধারণ একটা নথির—সুভাষচন্দ্রের চিন যাত্রার ওপর এক নজর দৃষ্টি দিতে পারি। সুভাষচন্দ্রের যে কোনো কাজে সরকারেব আপত্তি ছিল, সুভাষচন্দ্রের চিন যাত্রায় সরকারের আপত্তি ছিল, সরকার মনে করত সুভাষের কলকাতায় থাকা তাদেরই পক্ষে সুবিধার কারণ হবে। কেন ? ১৯৩৯ সালের এক নথিতে লেখা আছে : '...as per as Congress politics are concerned Subhas Bose's presence in Bengal is an advantage to Govt. It prevents unity in the Extremist ranks..' বাংলা প্রশাসন নিজেদেরই স্বার্থে সুভাষকে কলকাতায় রাখতে চেয়েছিল। ঐক্যহীন কংগ্রেস বাংলা সরকারের সতত কাম্য ছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে সাধারণের মধ্যে নানা কারণে মধ্য ত্রিশ থেকে তীব্র অসন্তোষ বেড়ে উঠেছিল। কৃষক শ্রমিকের ক্ষোভে সরকার অশনি সংকেত পেয়েছিল। সাম্যবাদী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী কিছু তরুণ সর্বত্রই নতুন ভাবনার কথা বলতে লাগলেন। আর এমনই এক পটভূমিতে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাম্যবাদীরা এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে তাঁরা এগিয়ে এলেন। সামগ্রিক অবস্থা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে খুব সুখকর ছিল না। প্রশাসন সতর্ক হয়ে উঠল।

সরকারি নথি থেকে পাওয়া যায় ১৯৪০ সালের জানুয়ারি ২৭, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতায় যুদ্ধবিরোধী ও রাজদ্রোহমূলক প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ।

ওই পুলিশি অভিযানে যাঁদের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভবানীশংকর সেন, মুজফ্ফর আহমেদ, অবনী লাহিড়ী, সুশীল দাশগুপ্ত, আবদুল মোমিন, প্রমোদ সেন, মিস শান্তি সরকার, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কলকাতার অন্যতম দৈনিক *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকায় পরের দিন এই পুলিশি

অভিযানের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। পুলিশের এ হেন আচরণ শরৎচন্দ্র বসু কীভাবে দেখেছিলেন, সরকারি নথিতে এর উত্তর আছে।

অজস্র তথ্য, বিচিত্র উপকরণ দিয়ে রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র সাজানো। ঘটনা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নথিপত্রের বিষয়বস্তু পালটিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। একদিকে দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন, অন্যদিকে দেশের বাইরে যুদ্ধ : ব্রিটিশরাজের বড়োই দুর্দিন তখন। বিপ্লবীদের ওপর প্রশাসনের যেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল তেমনই সরকারি সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তাদের ছিল। সরকারি নথিতে এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতীতে এই সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন ড. আলেকজান্ডার অরনসন, জাতিতে জার্মান ইহুদি। ড. আলেকজান্ডার ১৯৩৭ থেকে বিশ্বভারতীতে পড়াচ্ছিলেন। জার্মান ইহুদি ছিলেন বলেই ড. আলেকজান্ডারকে যুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর ৪-এ এক চিঠি দিয়ে ড. আলেকজান্ডারের মুক্তির দাবি করলেন যাতে তিনি বিশ্বভারতীতে পড়ানোর কাজ করতে পারেন। ড. আলেকজান্ডার মুক্তি পেয়েছিলেন।

ওই নথি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বোধকরি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে প্রশাসনের ভাবনাচিন্তা। এই বিপ্লবী লাহোর ষড়যন্ত্রখ্যাত বটুকেশ্বর দত্ত বা ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের শ্রীমতী কল্পনা দত্ত হতে পাবেন। ১৯৪০ সালে সরকারি নথিতে এই দু-জন সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এঁদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ না হলেও, এঁদের বর্ণময় জীবনের প্রেক্ষিতে জরুরি হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নায়ক বটুকেশ্বর দত্তের চলাফেরার ওপর সরকারি বিধিনিষেধ ছিল ১৯৪০ সালে। তাঁর কলকাতা বা বাংলা দেশে প্রবেশাধিকার ছিল না। সরকার মনে করেছিল বটুকেশ্বরের মতন পোড়খাওয়া বিপ্লবী রাজনীতি সচেতন বাংলা দেশে এলে এখানকার রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে দেখলে হয়তো পুরোনো পথের কথা ভাবতে শুরু করবেন। সুতরাং এমন মানুষের কলকাতায় আসার অনুমতি দিতে সরকার প্রস্তুত ছিল না।

সুতরাং বাংলা দেশে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বটুকেশ্বর দত্ত বাংলা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম যে আবেদন করেন তাতে সরকার সাড়া দেয়নি। দত্ত এরপরেও একই আবেদন করেন। বটুকেশ্বর এই সময় কানপুর জেলা কংগ্রেস ও ইউ. পি. ফরোয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি ছিলেন। থাকতেন কানপুরের ২৪/৩০ মল রোডে। বটুকেশ্বরের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি। কল্পনা দত্তের কথা লেখা যায়।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রী সাম্যবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কল্পনা দত্তকে কলকাতা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রামে অন্তরিন করে রাখে। চট্টগ্রাম ছেড়ে তাঁর যাওয়ার অধিকার ছিল না।

এই গ্রেপ্তার কল্পনা মেনে নিতে পারেননি। কিছুদিন পর অবশ্য কল্পনা দত্তকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ওপর এই সময় পুলিশের নজর ছিল।

বিপ্লবীরা কোথায় যান বা কাদের সঙ্গে দেখা করেন এমন সংবাদ গোয়েন্দারা সব সময়েই সংগ্রহ করতেন। কল্পনা দত্তকে কলকাতায় আসার অনুমতি দিলেও তাঁকে পুলিশের দৃষ্টির বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি।

১৯৪০ সালে ওই সমস্ত বা প্রশাসনিক ইতিকর্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাংলা প্রশাসন শরৎচন্দ্রেব বিখ্যাত উপন্যাস *পথের দাবী*-র ওপর নতুন করে বিধি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, ১৯২৭-এ *পথের দাবী* নিষিদ্ধ হলেও ও ১৯৩৯-এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

মুক্ত *পথের দাবী*-র নাট্যরূপ দিয়ে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এই সময়। অভিনয়ের আবেদন সব সময়েই সাধারণের মধ্যে তাৎক্ষণিক সাড়া ফেলে বা দর্শকরা সহজেই নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করে উত্তেজিত হয়ে পড়েন—এই সহজ সত্য বুঝতে বাংলা প্রশাসন ভুল করেননি। সুতরাং এই সময়ের তরুণ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত *পথের দাবী*-র নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা নিলে সরকার তা মেনে নিতে পারেনি। এই প্রস্তাবিত নাট্যাভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৪০ সালে।

উল্লিখিত সরকারি তথ্যে সরকার বিরোধিতা ও পালটা সরকারি আঘাত সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। ওই সরকারি বিরুদ্ধতার নমুনা নানা মাত্রার হতে পারত যেমন বিদ্রোহ, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি। উপনিবেশ বিরোধী ভাবনাচিন্তার মধ্যে দিয়ে সরকার বিরোধিতার নিপুণ বাতাবরণ গড়ে তোলা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল। আমি কয়েকটির উদাহরণ দিয়েছি, এর বাইরের ভাণ্ডারও বিশাল।

শুরু থেকে রাজনৈতিক দপ্তর ও ১৯৩৭'র এপ্রিল থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন নথিপত্রের বড়ো একটা অংশে বাংলা বিভাগের ভূম্যধিকারী ও প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্যে ওই সমস্ত পরিবারের উত্থান ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাবে। এই সময়ের বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই সমস্ত ভূম্যধিকারী পরিবারের পরিচয় সংগ্রহে রাখা সরকারের কাছে জরুরি ছিল।

১৯৪২ সালে স্ববাষ্ট্র দপ্তরের গোপন এক নথিতে বাংলা প্রশাসনের প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবারের কথা জানা যায়। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলকাতা, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও চব্বিশ পরগনার সেই সময়ের বিখ্যাত পরিবারগুলির কথা আমরা জানতে পারি সরকারি নথি থেকে। জেলা কলকাতার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কলকাতার বারোটি প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে তালিকাব প্রথম স্থানটি অবশ্যই ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির, শেষ স্থানটি নির্দিষ্ট ছিল রামমোহনের উত্তরপুরুষের জন্য। এই তালিকায় মুসলমান পরিবার ছিল একটি। এই স্থানটি দখল করেছিলেন উনিশ শতকের বাংলা দেশের সমাজ সংস্কার

আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ নবাব আবদুল লতিফের উত্তরপুরুষ নবাব এ. এফ. আবদুর রহমান। আবদুর রহমান সরকারের খুব কাছের মানুষ ছিলেন।

তেমনই খুলনা জেলার কাটুনিয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় এখানকার রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বসন্ত রায়, রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। মুঘল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে এর যুদ্ধ আজ ইতিহাসের সুখকর স্মৃতি। ১৯৪২ সালে এই পরিবারের প্রধান ছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানির হাট' মনে পড়বে।

এই নথি থেকে আমাদের উল্লিখিত বারোটি পরিবারের সরকারি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস জানতে পারব আমরা। এই সমস্ত উপাদানের সঙ্গে পাওয়া যাবে এই সমস্ত পরিবারের কুলপঞ্জি। এই সমস্ত কুলপঞ্জির ওপর নজর রাখলে সময় ও ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সমস্ত পরিবারের শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে। ঠাকুর পরিবারের এমনই কুলপঞ্জি থেকে এই পরিবারের খ্যাত অখ্যাত ব্যক্তিদের নানান শাখা প্রশাখায় যুক্ত থাকার হদিস পাই আমরা।

পুরোনো পারিবারিক তথ্যসমৃদ্ধ নথির কথা লিখেছি; এবার লেখা যাক এই সময়ের যুদ্ধের কথা। একদিকে যুদ্ধ আর অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন এই সময়ের অস্থিরতা জানিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গোষ্ঠীর এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষজন খুব উৎসাহী ছিল না, বরং সন্ত্রস্ত ছিল।

এই যুদ্ধ এক ভিনদেশি শাসকগোষ্ঠীর জন্য শুরু হয়েছে—এমন ধারণা সাধারণের মধ্যে ছিল বলেই, সরকার স্বীকার করেছিল, সাধারণের মধ্যে এই যুদ্ধ নিয়ে এক ধরনের উদাসীনতা আছে। ঘৃণা নয়?

সরকার ওই অবস্থায় সাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য এই সময় গঠন করল প্রচারমূলক সংগঠন বা 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন'। প্রচারের মাধ্যমে শুরু থেকে এই সংগঠন যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে সদর্থক ভাবনা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল। কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সরকারি বক্তব্য প্রকাশ করা হতে থাকে। ঢাকা কেন্দ্র থেকে দিনের পর দিন বিশেষ আলোচনা প্রকাশ করা হয়। নাটক ও গানের বিশেষ অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয়, লক্ষ্য ছিল যুদ্ধের পক্ষে ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনমত তৈরি করা। সরকারি নথিতে এই 'ওয়ার ফ্রন্ট' সম্বন্ধে লেখা আছে : '...the object...was to help and maintain public moral and to rouse an anti-fascist mentality in the people ..' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে অন্য যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায়। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর। এই যুদ্ধকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বলতে বাধা কোথায়?

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক শাখার নথি, গোপন নথি, সরকার বিরোধী ওই আন্দোলনের সংবাদে পূর্ণ। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলা দেশের অখ্যাত এক মহকুমা শহর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, এখানে উড়েছিল এক স্বাধীন সরকারের পতাকা। এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন

পরাধীনতার মধ্যে থেকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিশ্চয় তমলুকের মানুষজন তাঁদের নেতাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। তমলুকের জাতীয় সরকারের জন্য যে কোনো জাতি গর্বিত হতে পারে।

এই আলোচনায় ছেদ টানব বিশেষ কয়েকটি নথির কথা উল্লেখ করে। আগস্ট আন্দোলনের জোয়ারে ভারতবর্ষ ভেসে গিয়েছিল। শহর গ্রাম মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল জোয়ারের জলে। নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধির গ্রেফতারের সংবাদে সারা ভারতের মতন শহর কলকাতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ সালের রাজনৈতিক দপ্তরের এক নথিতে লেখা আছে : 'Chorus of protests was raised from every quarter of the city.. fire. broke out here. there and every where...' এই নথিতে আর যা লেখা আছে 'What Calcutta thinks today, the rest of Bengal think to-morrow' অন্যদিকে শহর ঢাকা সম্বন্ধে লেখা আছে : '...Dacca, the nursery of revolutionary activities since the birth of National Movement.' যে সরকারি আধিকারিক বাংলা দেশে ১৯৪২-৪৩ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে তাঁর এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন লেখা যায়। এই সময়ের নথিতেও দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপেরও সংবাদ আছে।

রাজনৈতিক দপ্তরের নথি স্বাভাবিক কারণে এই সময়ের রাজনীতি আর সামাজিক বিবরণে পূর্ণ। জেলা প্রধানদের বর্ণনায় বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক ছবি পাওয়া যাবে, অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রসঙ্গে ক্ষুধার্ত মানুষের ট্রেন লুটের সংবাদ উঠে আসবে আর জাপানিরা কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী ইস্তাহার বিমান থেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল দেশের বিভিন্ন অংশে সে তথ্য আমাদের সরকারি নথি সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলে।

১৯৪৬-৪৭-এর নথিতে পাওয়া যাবে এই সময়ে কলকাতা ও শহরতলিতে ঘটে যাওয়া কুখ্যাত দাঙ্গাহাঙ্গামার সংবাদ। এই দাঙ্গা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত, একদিকে শহর কলকাতা, হাওড়া ও অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আর অন্য দিকে আসন্ন স্বাধীনতার সংবাদে এই সময়ের রাজনৈতিক দপ্তরের 'গোপন' দলিল দস্তাবেজে সুচিত্রিত হয়ে আছে। স্বাধীনতা নিয়ে বাবু জয়প্রকাশ নারায়ণ আসানসোল, বর্ধমানে কি বলেছিলেন ? আমাদের জানা দরকার। আবার স্বাধীনতার 'ক্ষত' বাংলা ভাগ নিয়ে শ্রীরামপুরে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সম্মেলন থেকে আমরা জেনে নিতে পারি। এই সংবাদে কোনো সংবেদনশীল বাঙালি খুশি হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের কোনো একদিন মুর্শিদাবাদের সদ্য নির্মিত এক মসজিদের সামনে গান গাওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের সংবাদ নিতে পারি এই সময়ের গোপন এক দলিল থেকে।

এই সময়ের সাড়া জাগানো সংবাদ ছিল 'তে-ভাগা' আন্দোলন বা দুস্থ সহায় সম্বলহীন কৃষকদের সংগ্রাম ক্ষমতাবান জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ১৯৪৭-এর গোড়া থেকে সারা বাংলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারের রাজস্ব পর্ষদের কর্তাব্যক্তিদের কাছে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে খবর আসছিল '...A

movement for the Tebhaga system is going on foot. .. it was organised by the local Krishak Samity who professes affiliation with the communist party.' ভূস্বামীরা কি চোখে দেখেছিল এই আন্দোলন? সরকারি ভাষ্যে পাওয়া যায় ' the attitude of the land lord is stern towards the movement' তে-ভাগা আন্দোলন সংক্রান্ত বিপুল তথ্য পাওয়া যাবে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের ভূমি রাজস্ব শাখার নথিতে। এই নথি গোপন নয়, সুতরাং তে-ভাগার জন্য দেখা যেতে পারে এই নথিটি : File No. 6M-3/47, Prog B. December 1948. Nos 15–107.

(১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দপ্তরের কোনো নথি আর 'গোপন' নয়)

সময়ের রসায়ন : ঔপনিবেশিক যুগের নথিপত্র

বাংলা দেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা থেকে ব্রিটিশ রাজের শেষ দিন পর্যন্ত বিপুল নথিপত্র শাসক গোষ্ঠী তৈরি করেছিল তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মনে হয় এই সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। কোম্পানি ও ব্রিটিশরাজের প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই সমস্ত নথিপত্র তৈরি হয়েছিল। অবশ্য একথা ঠিক কোম্পানি আমলের প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা ব্রিটিশ রাজের হাতে আরও তীক্ষ্ণ ও মসৃণ হয়ে উঠেছিল। 'ফাইল' বা নথি 'তৈরির জন্য তৈরি করতে হবে'--কোম্পানি আমলের এই অলিখিত ব্যবস্থা ব্রিটিশরাজের আমলে পাল্টিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নথিপত্র বা দলিল দস্তাবেজের কৌলিন্য ঠিক করে দিয়েছিল—কোম্পানি আমলে নথিপত্রের কৌলিন্য ছিল না।

ফলত ১৯৪৭ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৮–১৮৫৮) ও ব্রিটিশরাজের (১৮৫৯–আগস্ট ১৪, ১৯৪৭) নথিপত্রের গুণগত পার্থক্য না থাকলেও চরিত্রগত ফারাক ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালন পদ্ধতি অনুসারে নথিপত্রের বৈশিষ্ট্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত প্রকার দলিল দস্তাবেজের 'মান'ও নির্দিষ্ট হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন বলে মনে হলেও নথিপত্রের 'মান'ই ভবিষ্যৎ মহাফেজখানার কাছে অতি জরুরি হয়ে পড়ে।

কোম্পানি আমলের নথিপত্র ছিল মূলত দু-ধরনের : ১. ও. সি. (অরিজিনাল কনসালটেশন) বা মূল বিবেচ্যপত্র ও ২. মূলপত্রের প্রতিলিপির উপর গৃহীত সরকারের সাপ্তাহিক সিদ্ধান্ত, নির্দেশ যা প্রসিডিংস বা কার্যবিবরণী নামে ক্রম পর্যায়ে নথিবদ্ধ করা হত। কোম্পানি আমলের নথিপত্রের মূল্যায়ন বা বর্গীকরণ করা হত না।

ফলত কোম্পানি যুগে গুরুত্বহীন বা অকিঞ্চিৎকর প্রশাসনিক মূল্যের নথি সংরক্ষণ করা হত। ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চাকরির আবেদনপত্র বা ১৮৪৪-এ বাংলা দেশের এক অখ্যাত স্কুলের 'পন্ডিত' পদপ্রার্থীদের আবেদন কোন্ কারণে সংরক্ষণ করা হয়েছিল তা জানা নেই। ১৮৪০-র কালে 'জনৈক' ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরির আবেদনপত্র কেন সংরক্ষণ করা হয়েছিল? এই সময় তিনি 'দয়ার সাগর' হননি বা তাঁর সামাজিক আন্দোলন তাঁকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসেনি। এই সমস্ত চিঠিপত্রের সীমাহীন গুরুত্ব আজ স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে

সেদিন এই সমস্ত নথিপত্রের কোনো প্রশাসনিক মূল্য ছিল না। কোম্পানি আমলে সব কিছুই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হত প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে।

১৮৫৮-এ কোম্পানি আমলের শেষ, ১৮৫৯-এ ব্রিটিশরাজের সূচনা, সুতরাং পাল্টিয়ে গেল পুরোনো রেকর্ড কিপিং ব্যবস্থা। এই সময় থেকে কোম্পানি আমলের সাপ্তাহিক অধিবেশনের পরিবর্তে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁর পরিষদের অধিবেশন বা সভা প্রতিমাসে আহ্বান করার ব্যবস্থা নেনন। এইভাবে শুরু হল 'মান্থলি প্রসিডিংস'। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২০-র কালে শুরু হল 'কোয়ার্টারলি প্রসিডিংস'।

ঐ সময় অর্থাৎ ১৮৬০-র সূচনায় নথিপত্রের বর্গীকরণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হল। সরকারের সমস্ত নথিপত্র স্থায়ীভাবে সংরক্ষণযোগ্য হতে পারে না— এই নির্ভুল সিদ্ধান্ত মেনে দলিল দস্তাবেজের বর্গীকরণ করা হতে লাগল। সমস্ত দলিল দস্তাবেজের মধ্যে থেকে কিছু নথিপত্রে (স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে) 'এ' তকমা দেওয়া হল; কয়েক বছরের জন্য সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্র 'বি'ও একান্তই মূল্যহীন নথিপত্র 'সি' শ্রেণীভুক্ত হল। নির্দিষ্ট সময় শেষে অর্থাৎ পাঁচ, দশ বা পনেরো কুড়ি বছর পর ঐ 'বি' নথির মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে হয় ধ্বংস না হয় স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওযা হত— এই ধরনের নথি 'বি'— পার্মানেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হল। কোম্পানি আমলে এমনতর ব্যবস্থা ছিল না। আবার ব্রিটিশরাজের আমল থেকেই 'এ' চিহ্নিত নথিপত্র মুদ্রিত হতে থাকে, কোম্পানি আমলে সব কিছু হাতে লেখা ছিল।

কোম্পানি যুগে গৃহীত সব কিছুই অবশ্য ব্রিটিশ রাজের আমলে পাল্টায়নি। আবার প্রশাসনিক কার্যবিবরণীর 'নথি অনুসন্ধান সংখ্যা' স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও ছিল। কেন ওই ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানো হয়নি এমনতর প্রশ্ন করা যায়। যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রসিডিংস-এর ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল ঔপনিবেশিক যুগে, সে ব্যবস্থা স্বাধীনতা উত্তরকালে ছিল না। বর্তমানে যে 'ফাইলিং' ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় সেখানে 'প্রসিডিংস নাম্বার' দেওয়া যায় না। অথচ স্বাধীনতার অনেক পরেও ঐ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হত। ঔপনিবেশিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে দেরি লেগেছিল অবশ্যই।

বর্তমান সময়ে মহাফেজখানার সার্বিক প্রেক্ষাপটে 'রেকর্ড কিপিং'-এ কোনো উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির নব নব বিপ্লবের উষাকালে দাঁড়িয়ে শুধু আশা করা যায় নথিপত্র সংস্করণে চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা পাল্টিয়ে যাবে : ১৭৫৮-এর সঙ্গে ২০০৬-এর পার্থক্য শুধু সময়ে নয় এই পার্থক্য গড়ে উঠছে নথিপত্র সংরক্ষণে, তথ্য সংরক্ষণ নিয়ে সৃষ্টিমূলক ভাবনাচিন্তায়, কেন না ঔপনিবেশিক কাল থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এটাই ইতিহাস, এই ইতিহাস খুঁজতে হবে মহাফেজখানার দলিলপত্রে।

আর্কাইভস ও এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে যা আমি লিখেছি সে সবই বাংলা সচিবালযের আর্কাইভস গড়ে ওঠার এক ধারাবাহিক ইতিহাস। ১৯১০ থেকে বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত রাজ্য মহাফেজখানার তিন বাড়িতে যা কিছু ঘটেছিল তার বিবরণ এখানে দেওযার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের পরিচিত অ-পরিচিত উপকরণ, সরকারি নিয়ম বিধি ও দেশবিদেশের গবেষকদের নিয়ে আজকের আর্কাইভস বা মহাফেজখানা নিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, এই ইতিহাস মহাফেজখানার নিত্য আত্মপ্রকাশের দলিল হতে পারে। এই ইতিহাস, আরও উন্নত, ঋদ্ধ হতে পারত যদি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে নথিপত্রের হস্তান্তরে ভারসাম্য বজায় থাকত। সে কাহিনি লেখা যেতে পারে।

১

১৯৩০'র দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল দিল্লিতে কলকাতা থেকে 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিস' বা কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয় স্থানান্তরণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। ১৯২৬-এ দিল্লিতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের নতুন ভবন নির্মাণ শেষে এখানেই নভেম্বরে স্থাপিত হল এই দপ্তরের নতুন শাখা।[১] এবং এই শাখা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে দিল্লিতে কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। নথিপত্র স্থানান্তরণের চূড়ান্ত দিনক্ষণ অবশ্য ঠিক হয়নি।

১৯৩৬-এর সূচনায় জানা গেল যে দিল্লির ওই নতুন বাড়িতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮৩৩ পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হবে।[২] এই সংবাদ সরকারিভাবে জানানো না হলেও এর বিরুদ্ধে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী মহল কিছুটা শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

দিল্লিতে কোম্পানি আমলের নথিপত্রের সম্ভাব্য স্থানান্তরণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাডেমি কাউন্সিল বা শিক্ষা সংসদ। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ শিক্ষা সংসদ তাদের এক সিদ্ধান্তে জানিয়েছিলেন যে কলকাতা থেকে দিল্লিতে নথিপত্র স্থানান্তরণের যে কোনো প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা। শিক্ষা সংসদ মনে করেছিল (১) কলকাতা ওই সমস্ত নথিপত্র ব্যবহারের উপযুক্ত স্থান, (২) দিল্লির আবহাওয়া এই সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষণের পক্ষে অনুপযুক্ত, (৩) স্থানান্তরণের সময় নথিপত্রের ক্ষতি হবে। পরিশেষে বলা হয়েছিল কলকাতার ঐতিহাসিকদের কথাও ভাবা দরকার, এই সমস্ত নথিপত্র বাংলা দেশে ব্রিটিশ শাসনের

সূচনা সম্পর্কিত।

বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯২৬-এ এক চিঠিতে শিক্ষা সংসদের গৃহীত ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এপ্রিল ১৯৩৬-এ কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয় থেকে বাংলা সরকারকে জানানো হল কলকাতা থেকে দিল্লিতে নথিপত্র স্থানান্তরণের বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।[৩] এই আপাত সুখ সংবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জুলাই ১৫, ১৮৩৬-এ কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্মসচিব বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় নথি সংগ্রহালয় যত দ্রুত সম্ভব দিল্লিতে নিয়ে আসা হবে। এবং মে ১৮৩৭'র মধ্যে এই স্থানান্তরণের কাজ শেষ হবে।[৪]

কোম্পানি আমলের সূচনা থেকে ১৮৩৩'র চার্টার অ্যাক্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কোম্পানি প্রশাসন যে সমস্ত বিভাগ গড়েছিল রাজস্ব ও বিচার ভিন্ন তার মধ্যে ছিল পাবলিক, সিক্রেট, পলিটিক্যাল, জেনারেল, ফিনান্স, আর পর্ষদের মধ্যে ছিল রেভিন্যু, হসপিটাল, মেডিকেলের মতন একাধিক সংস্থা। এই সমস্ত বিভাগ ও পর্ষদের দলিল দস্তাবেজে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আরও নানাবিধ ঘটনাবলি সুনিপুণভাবে বিধৃত। কিন্তু ঘটনা হল এই সমস্ত বিভাগ ও পর্ষদের মধ্যে শুধুমাত্র রাজস্ব বিভাগ, রাজস্ব পর্ষদ ও বিচার বিভাগ ও এই সমস্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট গৌণ শাখা উপশাখা প্রাদেশিক 'রেকর্ডরুম'-এ ছিল। অন্য সমস্ত বিভাগ ও নথিপত্র 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরুম'-এর হেপাজতে ছিল। কেন এই সমস্ত নথিপত্র প্রাদেশিক রেকর্ডরুমে ছিল না, সে কারণ অজ্ঞাত। কোম্পানি আমলের সূচনা থেকে ১৮৩৩-র চার্টার অ্যাক্ট পর্যন্ত এই সময়ের নথিপত্রের প্রকৃত মালিকানা কার হাতে থাকা উচিত এই জরুরি প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই এবার উঠে এল। এর উত্তর খুঁজতে হবে এই সময়ের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে।

পরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে লেখা যায় পলাশি যুদ্ধের পর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সাফল্য ১৭৬৫তে দেওয়ানি লাভ নিশ্চিতভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা বিহার ওড়িশার প্রকৃত শাসকের মর্যাদা দেয়। এই অঞ্চল ঘিরে ভবিষ্যতে কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ছক তৈরি হয়েছিল। সুদূর আরাকান, তেনাসিরিন পর্যন্ত বাংলা বিভাগের সীমানা বিস্তৃত ছিল কোম্পানির অধিকৃত ও উপঢৌকন প্রাপ্ত অঞ্চল সমূহ নিয়ে। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ১৭৭৩-এর ভারত বিধি অনুসারে 'গভর্নর জেনারেল' হিসেবে পরিচিত হলেন। প্রকৃত পরিচয়ে হলেন 'গভর্নর জেনারেল অভ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গাল'। বাংলা বিভাগ মাদ্রাজ ও বোম্বে বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হল। বাংলা সরকারই প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বা সুপ্রিম গভর্নমেন্ট হিসেবেই ক্ষমতা ভোগ করত।

১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্টে বাংলা সরকারের ওই ক্ষমতার অবসান ঘটে। বাংলার

'গভর্নর জেনারেল' ভারতের 'গভর্নর জেনারেল' হলেন, বাংলা বিভাগের জন্য একজন 'ডেপুটি গভর্নর' নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। ১৮৩৪ থেকে ভারত সরকারের জন্য ভিন্ন নথিপত্র তৈরি হতে শুরু করল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে অবশ্য যে ১৮৪৩ পর্যন্ত যৌথ সচিবালয় ব্যবস্থা ছিল। পরে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হল।

উপর্যুক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে ১৮৩৪ পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র প্রকৃতপক্ষে বাংলা সরকারের যে সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে—'সুপ্রিম গভর্নমেন্ট' হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময়ের নথিপত্র, আগেই লিখেছি, মূলত বাংলা প্রশাসন ও এর ইতিহাস সম্পর্কিত।

২

১৯৩৬-এ এক বিভাগীয় 'নোট'-এ বলা হল (১) কলকাতায় এই সমস্ত নথিপত্র রাখা হলে গবেষকদের সুবিধা হবে, ভিন্ন প্রদেশের গবেষকরা কলকাতায় এসে এই সমস্ত নথিপত্র দেখতে পছন্দ করে থাকেন, (২) সরকারি নথিপত্র মূলত দু ধরনের (ক) মূল নথি (ও. সি.) ও (খ) এর অনুলিপি যা প্রসিডিংস নামে পরিচিত।[৫] কেন্দ্রের কাছ থেকে যে কোনো এক ধরনের নথি চাওয়া যেতে পারে। উপর্যুক্ত প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ এক নিম্নবর্গীয় কর্মীর যিনি ইতিহাস বা নথি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু নথিপত্রের গুরুত্ব ও গবেষকদের প্রয়োজন বুঝতেন। যথোপযুক্ত প্রস্তাব সন্দেহ নেই।

ওই বিভাগীয় 'নোট' পড়ে বোঝা যায় রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা কোম্পানি আমলের নথিপত্র নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। এখানকার এক সাধারণ কর্মীর এমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে ১৮৩৩ পর্যন্ত সমস্ত নথিপত্র তাদেরই প্রাপ্য, যেহেতু এই সমস্ত নথিপত্রে মূলত স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রশাসন ও ইতিহাসই নথিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আবার লেখা হল :

They (Imperial Record Office) may perhaps also be requested to consider, if it is not possible to keep the Imperial Records Department in Calcutta, the desirability and necessity of transfering the duplicate set records of Bengal Until 1834... to the local Govt in view of the fact that these records deal largely with the history and administration of the Presidency of Bengal কিপার এই 'নোট' মেনে নিয়ে লিখলেন, ১৮৩৪ পর্যন্ত কোম্পানি আমলের সমস্ত নথির অনুলিপি দিল্লির কাছে চাওয়া যেতে পারে, সামরিক ও বিদেশ দপ্তর ভিন্ন।[৬]

প্রয়োজন ও নীতিগত দিক সমস্ত বিষয় আলোচনা ও নথিবদ্ধ করে শিক্ষা বিভাগের অভিমত নিয়ে প্রস্তাবটি রাজনৈতিক দপ্তরের উপসচিবের কাছে পেশ করা হল। প্রস্তাবের সঙ্গে দিল্লিকে লেখা প্রস্তাবিত অনুরোধপত্রের খসড়া ছিল। তদানীন্তন কিপার অভ রেকর্ডসই এই খসড়া প্রস্তুত করেছিল।[৭]

উপসচিব নীতিগতভাবে ওই প্রস্তাব মেনে নিলেও তাঁর সন্দেহ ছিল ওই প্রস্তাবের

পরিণতি নিয়ে। তিনি লিখলেন বর্তমান অবস্থায় প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না।[৮] সুতরাং নথিটি তিনি পাঠালেন মুখ্যসচিবের কাছে।

মুখ্যসচিব ১৯ আগস্ট '৩৬-এ লিখলেন 'I do not think it is worthwhile pursuing this matter. Delhi is the Imperial Capital and with the advent of federation the argument for transfer will become stronger.'[৯] মুখ্যসচিবের বক্তব্য জানার পর নথিটি এই তারিখেই ক্লোজ করে দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক মহাফেজখানাকে রাজস্ব পর্ষদ, রাজস্ব বিচারবিভাগ ও এই দুই বিভাগের শাখা উপশাখার নথিপত্র নিয়েই খুশি থাকতে হল। অথচ যে কারণে এই সমস্ত নথিপত্র তদানীন্তন সরকারকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল সেই একই কারণে পাবলিক পরে জেনারেল, হসপিটাল বা মেডিকেল বোর্ডের নথিপত্র পাওয়া গেলে আমাদের মহাফেজখানা পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকেও ঋদ্ধ হতে পারত। এখানকার এক সাধারণ কর্মী যা বুঝেছিলেন সরকারের প্রশাসনিক প্রধান সেই সরল সত্য বোঝেননি অথবা বুঝতে চাননি। 'রেকর্ডরুম'কেও কেন্দ্রের হাতে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। আর্কাইভসের সূচনা বঞ্চনা দিয়ে, এটাই ইতিহাস।

শেষের কথা

গ্রন্থের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বলা চলে মহাফেজখানার অনেক কিছু জানা থাকলেও, বেশি কিছু সব সময়ই অজানা থাকে। সকলের দৃষ্টি বলয়ে সব কিছু না রাখাই মহাফেজখানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক যুগে, পরে স্বাধীন বাংলা দেশের এক রেকর্ডরুম তথা মহাফেজখানা এর ব্যতিক্রমী ছিল না। মহাফেজখানার প্রাক্-গঠন পর্ব ও সকলের কাছে অজানা থাকে।

মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ বা নথিপত্রের স্রষ্টার কথা জানা যায় না। দলিল দস্তাবেজ তৈরির নেপথ্য ইতিহাস সকলের কাছে অজানা থাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। দলিল দস্তাবেজ তৈরি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন শেষে মহাফেজখানায় স্থানান্তরনের দীর্ঘ পর্বটিকে, পনেরো, কুড়ি, পঁচিশ বছর হতে পারে, বলা হয় 'রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট'-এর কাল। এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নথিপত্রের মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের সময়েই প্রশ্ন তোলা হয় সমস্ত দলিলপত্র কেন 'আর্কাইভস' হবে বা মহাফেজখানায় স্থান পাবে? সব 'রেকর্ডস' আর্কাইভস হতে পারে না। 'রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট'-এর শেষে যেখানে 'আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট'-এ সূচনা সেখানে।

বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে ঘোরাফেরা না করে শুধু বলা চলে 'আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট'-এর অন্যতম অংশ নথিপত্রের সুষ্ঠু পরিচর্যা বা 'কনজারভেশন অফ রেকর্ডস'। নথিপত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচর্যার সুযোগ বা পরিকাঠামো না থাকলে নথিপত্র সংরক্ষণ করা বহুলাংশে অর্থহীন হয়ে পড়ে, ধ্বংস করার জন্য নথিপত্র সংগ্রহ করা হয় না। সৃষ্টি ও সংরক্ষণ পরস্পরের পরিপূরক। নথিপত্র সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে সংরক্ষণ করা যে কোনো মহাফেজখানার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নথিপত্রের পরিচর্যা বা 'কনজারভেশন অফ রেকর্ডস' নিয়ে এখানে লেখার সুযোগ নেই। শুধু দায়িত্ব নিয়ে লেখা যায় নথিপরিচর্যার প্রাথমিক শর্তাবলি পূরণ না হলে কীভাবে ১৭৭০–৭১-এর নথিপত্র আজও দেখার সুযোগ পান গবেষকরা। দূর বিদেশের কোনো গবেষক যখন তাঁর চাহিদার নথিটি পেয়ে উৎফুল্ল হন তখন রাজ্য মহাফেজখানার গুরুত্ব ও বিশ্বজুড়ে এর দায়বদ্ধতা প্রমাণ হয়ে পড়ে।

ঐ দুই বিষয় নিয়ে আমি লিখিনি। রেকর্ড ও আর্কাইভস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভিন্ন দুটি গ্রন্থ হতে পারে। মহাফেজখানার অজানা দলিল দস্তাবেজের মতন সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সাধারণের কাছে সতত অজানা থেকে যায়। কিছু চেনা কিছু অচেনা উপকরণ, উপাদান নিয়ে মহাফেজখানার নভোমণ্ডল গড়ে ওঠে।

সে যা হোক, অনেক সীমাবন্ধতা নিয়ে ঔপনিবেশিক কালের রেকর্ডরুম যা মহাফেজখানা গড়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল সচিবালয়ের রেকর্ডরুম হিসেবে, অল্পদিনের পর সেই রেকর্ডরুমই সমাজ বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে আর্কাইভসের মর্যাদা পেল। বিচিত্র বিষয়, আরও বিচিত্রতর উপকরণ আর গবেষণার জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা হল এর সম্পদ। একটু ভাবলে মনে হবে এমন প্রতিষ্ঠানই তো উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের মর্যাদা পেতে পারে। মহাফেজখানার নথিপত্র সমাজ-ইতিহাসের উৎস মুখ। এই উৎস থেকে মণি-মাণিক্য খুঁজে লিখতে হয় দেশ আর দশের ইতিহাস। সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার জন্য এত বিচিত্র তথ্য বিষয় আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

আর্কাইভস ও রেকর্ডস রুম দুটি ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন ধারণা। ফলত এক পরস্পরবিরোধী ধারণার মধ্য থেকে আজকের মহাফেজখানার সূচনা হয়েছিল। স্ববিরোধিতা থাকলেও অবশ্য সংঘাত ছিল না। আধা চলতি (সেমি কারেন্ট), অচলতি (নন কারেন্ট), নথিপত্র সংরক্ষণ, স্থায়ী নথিপত্র সংগ্রহ, পরিচর্যা ও শেষে গবেষকদের হাতে এই নথিপত্র তুলে দিয়ে ঔপনিবেশিক কালের 'রেকর্ডরুম' বা আর্কাইভস একই সঙ্গে প্রশাসনিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক দায়িত্ব পালন করছিল।

১

নামে কি যায় আসে? এই আপ্তবাক্য মনে রেখে আমাদের পক্ষে লেখা সম্ভব যে ঔপনিবেশিক যুগের রেকর্ডরুম নামক আপাত অপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা উত্তরকালে, ভারতের এক অঙ্গ রাজ্যে, স্টেট আর্কাইভসের মর্যাদা পেয়েছিল। প্রশাসনিক ও ব্যাবহারিক কারণে এই নতুন নাম যথাযথ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা যে প্রথা পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত হত, স্বাধীন আর্কাইভসের সেই পদ্ধতি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গবেষকদের স্বার্থে, সেই সমস্ত পদ্ধতি নিয়মকানুন অনেক সহজ করা হয়। পরাধীন দেশে প্রশাসনিক কারণেই নথিপত্র সংরক্ষণ করা হত, গবেষকদের স্বার্থ পরে চিন্তা করা হত। স্বাধীন দেশে চিত্রটা ভিন্ন হয়ে পড়ে!

ওই রেকর্ডরুম বা এখনকার আর্কাইভস গঠনে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ভূমিকা স্মরণীয়। শ্রীনাথ আর ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে সতত নিন্দিত বাঙালি বাবুদেরই হাত ধরে আজকের আর্কাইভসের সূচনা হয়, সঠিক অর্থে ১৯১০'র ফেব্রুয়ারিতে। এই সময়ে শ্রীনাথ চক্রবর্তী অস্থায়ী বিশেষ আধিকারিক থেকে স্থায়ী কিপার অভ রেকর্ডস হলেন। ১৯০৪ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজের নথিপত্র গুছিয়ে রেকর্ডরুম গড়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার অবসান ঘটে ১৯১০-এ শ্রীনাথের স্থায়ী কিপার পদে নিয়োগের মধ্য দিয়ে। এরপরের ইতিহাস রেকর্ডরুম গুছিয়ে তোলার ইতিহাস।

১৯১০–১৬'র মধ্যে রাজনৈতিক দপ্তরের এই শাখাটিকে নিপুণ দক্ষতায় এক

অভিনব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন শ্রীনাথই। এখানকার নথিপত্র ব্যবহারের জন্য তৈরি হতে লাগল নথি ব্যবহার সহায়িকা বা ব্যবহার মাধ্যম। দূর দূর অঞ্চল থেকে সরকারি নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপির জন্য আবেদন আসতে লাগল, রেকর্ডরুম ঘিরে এক ধরনের প্রত্যাশা জাগতে শুরু করে অনেকের মধ্যে। ১৯২০'র দশক থেকে বাংলা সচিবালয়ের এক শাখা থেকেই রেনেসাঁসের চর্চা শুরু। সরকারি দলিলের পাতায় পাতায় খোঁজা হতে লাগল বাঙালির ইতিহাসের উপকরণ।

প্রথম থেকেই সচিবালয়ের ওই রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ঐতিহাসিক ও চলতি শাখায় বিভক্ত ছিল। সূচনাকাল থেকে তিন বছরের পুরোনো নথিপত্র রেকর্ডরুম-এ পাঠিয়ে দেওয়া হত মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের জন্য, সরকারিভাবে এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে 'triennial accession of records', বিশ শতকের তিন বছরের পুরোনো নথিপত্র রেকর্ডরুমে স্থানান্তরণের ফলে গড়ে ওঠে চলতি শাখা। 'ঐতিহাসিক শাখা' গড়ে উঠেছিল প্রথমে রাজস্বপর্ষদ ও কোম্পানির ১৮৫৮ পর্যন্ত নথিপত্রের সাহায্যে, পরে ঐতিহাসিক শাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল ১৯০০ পর্যন্ত। ১৯০১ থেকে চলতি শাখা। 'আর্কাইভস'-এ এভাবে কোনো বিভাজন রেখা টানা যায় না। ভারতবর্ষের কোনো আর্কাইভস-ই এমনতরো ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি। 'ঐতিহাসিক' 'চলতি' শাখাকে সময়ের বেড়াজালে ধরে রাখা হয়েছিল প্রশাসনিক কারণে ; না হলে ক্ষতি হত ?

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঔপনিবেশিক যুগের 'রেকর্ডরুম' বা 'রেকর্ড অফিস' আর্কাইভস নামে পরিচিত হল সর্বত্র। তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর নির্ভর করার দিন শেষ হল। এখন ১৯৪৭ পর্যন্ত নথিপত্র গবেষকরা বিনা দ্বিধায় দেখতে পারেন। পরবর্তী পর্যায়ের নথিপত্র নিয়ে কাজ চলছে।

২

স্বাধীনতা-উত্তরকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছি আমি। আরও দু-একটা বিষয় উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করব 'মহাফেজখানা' শুরু থেকে এক বিষম পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই এক সময়ের বাংলা সচিবালয়ের রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ দুই স্বাধীন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। সরকারি বক্তব্য থেকে আমরা যা পেয়েছি '.. at the time of partition secretariat records of the Calcutta Record Room were divided between the two Governments on the alternate years basis for the period from 1921–42 .. all the papers of even years were taken by East Bengal and those of odd years retained in West Bengal.'[১] উভয় বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের ছবি দ্বিখণ্ডিত হল রাজনীতির নিপুণ ছকে।

রাজনৈতিক কারণে মহাফেজখানা এভাবে ভাগ করা যায় না 'ইভেন' ও 'অড' সংখ্যা অনুসরণে দলিল দস্তাবেজ দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায় মহাফেজখানার মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আঘাত পড়ল। দলিল দস্তাবেজের 'অবিভাজ্য' ধারাবাহিকতাই মহাফেজখানার অন্যতম মৌলিক পরিচয় হতে পারে।

ফলত ১৯৩০-এর শেষের দিকে দিল্লির জাতীয় অভিলেখালয়ের সঙ্গে কোম্প'নি যুগের নথিপত্রের মালিকানা বদল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনৈতিক কাবণে যৌথ বাংলার নথিপত্রেব মধ্যে দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষার প্রশ্ন স্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি করে নেওযা বা ১৯৫৪-৫৫ সালে স্থানাভাবের কারণে ১৮৩৪ পর্যন্ত কোম্পানি 'দলিলপত্র' অনা সংস্থার[২] হাতে হস্তান্তরণেব চেষ্টা স্বাভাবিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের পথে, মনে হতে পাবে, বাধা হয়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগেব পরে স্বাধীন রাষ্ট্রের এত বাধাবিপত্তি নিযেও রাজ্য মহাফেজখানা প্রায় দুশো বছরের (১৭৫৮–১৯৪৭) ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে আপন সম্পদে নিশ্চিন্তভাবে প্রকাশ হযেছিল নিত্যদিন : বড়ো গাছেই ঝড় ওঠে। প্রকৃতির নিযমে এটাই গাছের ভাগ্য।

রাজ্য মহাফেজখানার প্রাণভোমরা এরই দলিল দস্তাবেজ।

৩

সরকারি নথিপত্র ঠিক অর্থেই দূর অতীতের প্রশাসনিক দর্পণ, যে দর্পণ একজন প্রশাসক ব্যবহার করেন তাঁব প্রশাসনিক প্রয়োজনে, একজন সমাজবিজ্ঞানী ব্যবহার করেন তাঁর বৌদ্ধিক কর্মকাণ্ডের জন্য। প্রশাসনের তাৎক্ষণিক প্রযোজনে আর্কাইভসের দরকার পড়ে না, সরকারি নথির দরকার হয় বর্তমান ঘটনার তথ্যসূত্র খোঁজার জন্য, গবেষকদের কাছে এটাই ইতিহাসের তথ্য, আচার্য যদুনাথের ভাষায় 'র-মেটেরিয়ালস'। সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখে প্রমাণ করা যায় সরকার কোনো কিছুই গোপন করে না। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বা তারও আগে প্রশাসনে কী ধরনেব স্বচ্ছতা ছিল সেই তথ্য পেয়ে যাই পুরোনো নথি বা আর্কাইভস থেকে।

সরকারের ছোটো বড়ো সব বিভাগ/শাখা প্রশাখার অজস্র নথিপত্র নিয়ে গড়ে ওঠে 'এক' আর্কাইভস বা মহাফেজখানা, প্রত্যক্ষভাবে যা প্রশাসনের কাজে লাগে না, পরোক্ষে সমাজ-মানুষের প্রয়োজনে লাগে। একদিকে সমাজ-মানুষ আর অন্যদিকে সরকার—এই দুইয়ের মাঝে থাকে আর্কাইভস। দূর অতীতের অদেখা সময় আর সমাজ আর্কাইভসের ধূসর নভোমণ্ডলে সতত অস্থির হতে থাকে কারও হাতে উদ্ধারের জন্য—অহল্যার শাপমুক্তি ?

রাজ্য মহাফেজখানার ঐতিহ্য আশ্রয়ী ধ্যানধারণায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে ১৯৮০'র দশকে। ঔপনিবেশিককালে বেসরকারি নথিপত্র সংগ্রহের জন্য যে উৎসাহ আমরা ইতিহাসবিদদের মধ্যে দেখেছিলাম তা নানা কারণে ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৮০'র কালে রাজ্য মহাফেজখানা নতুন করে বেসরকারি নথিপত্র সংগ্রহে উদ্যোগী হয়। পরিচিত সরকারি দলিল দস্তাবেজের পাশে অ-চিরাচরিত বেসরকারি নথিপত্র মহাফেজখানার চেনা জগৎটায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৯৮-এ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল মহাফেজখানার নতুন বাড়ি।

ওই বাড়িতেই একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় গড়ে ওঠে ব্যাবহারিক শাখার ফটো শাখা আর্কাইভস যা মহাফেজখানার ধারণা পালটিয়ে দিয়েছে। রাজ্য মহাফেজখানার ছবি ও বাজেয়াপ্ত চিঠির সংগ্রহ শাখা ধারাবাহিকতার পাশে অনিবার্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত রেখেছে। স্বাধীনতার সন্ধানে ঘরছাড়া বিপ্লবীদের ছবি আর বিপুল পরিমাণের বাজেয়াপ্ত চিঠিপত্র এই প্রতিষ্ঠানের অহংকারের সম্পদ। এখন শহর কলকাতায় মহাফেজখানার তিন শাখা সতত মুখর থাকে নবীন-প্রবীণ খ্যাত অখ্যাত গবেষকদের নিত্য অতীত চর্চায় : এখানে আধুনিকতা, রক্ষণশীলতা, সর্বহারা, সাম্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, মন্দির-মসজিদ-গির্জা আর সমাজ বিজ্ঞানের বিচিত্র সমস্ত প্রকার তথ্য সব সময়েই সুরক্ষিত।

রাজ্য মহাফেজখানার তিনটি শাখা

১. ঐতিহাসিক শাখা, ৬ ভবানী দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০৭৩
   এখানে সংরক্ষিত নথিপত্রের সময়সীমা ১৭৫[illegible] -১৯০০
২. 'চলতি' শাখা, মহাকরণ, অঞ্চল ২, ভূমিতল, কলকাতা
   এখানে সংরক্ষিত নথিপত্রের সময়সীমা ১৯০১-
৩. ব্যাবহারিক শাখা, ৪৩ শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা ৭০০ ০১৭
   এখানে মূলত গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র ১৯০৬ থেকে সংরক্ষিত করা হচ্ছে।

তথ্য নির্দেশিকা

১ সংজ্ঞার খোঁজে

১ Schellenberg, T R , Modern Archives Principles and Techniques, U S A 1965, পৃ. ৫

২ Purnendu Basu, Archives and Records What are Why? NAI New Delhi, 1961, পৃ. ৮–৯

৩ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *এবং এই সময়* ৮ম বর্ষ, ২৫তম গ্রীষ্ম-বর্ষা 'মহাফেজখানার তাত্ত্বিক দিক অথবা অভিলেখ বিজ্ঞান' শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত, পৃ. ১১২

৪ Dr. Shyamalendu Sengupta, Experiencing through Archives, Restoration of Memory and Repair of Records, New Delhi, 2004, পৃ. ৩১–৪৭

৫ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'T R Schellenberg'-এর পূর্ব কথিত গ্রন্থে

৬ Jenkinson, Hillary, A manual of Archive Administration, London, 1922, পৃ. ৫–৬

৭ তদেব

৮ Schellenberg T R , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৯ তদেব

১০ এই গ্রন্থে শেলেনবার্গ সতেরোটি অধ্যায়ে রেকর্ড, রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রিজারভেশন, অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন

১১ তদেব, শেলেনবার্গ-এর মতে 'Those records of any public or private institution which are adjudged worthy of permanent preservation for reference and research purposes and which have deposited or have been selected for deposit in an archival institution', পৃ. ১৬

১২ 'Experiencing through Archives' ইত্যাদি পূর্ব কথিত গ্রন্থে, পৃ. ৩৭

১৩ তদেব

১৪ Archivum (International Council on Archives), Vol XL, Archival Legislation, 1881–1994, পৃ. ৪৮–৪৯

১৫ তদেব, পৃ. ১১২–১১৩

১৬ Public Records Act 1993 (The Gazette of India, Extraordinary, Part II, December

22, 1993)

১৭ Archivum (International Council on Archives), Vol. XLII-এ প্রকাশিত নিবন্ধ 'Archival Losses and Their Impact on the Work of Archivist And Historians', পৃ. ১ অনুচ্ছেদ : ১

১৮ Experiencing through Archives, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯

১৯ লেখ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি স্যার হিলারি জেনকিন, টি. আর. শেলেনবার্গ ও ড. শ্যামলেন্দু সেনগুপ্তর উল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে।

২ সরকারি নথিপত্র : আঠারো-উনিশ শতক

১ Guide to the Records Vol I Calcutta, 1977

২ Sailen Ghosh, Archives in India, Calcutta, 1963, p 44

৩ তদেব

৪ তদেব, পৃ. ৪৫

৫ তদেব, পৃ. ১১৯, লন্ডন থেকে লেখা কোম্পানির চিঠির ক্রমিক সংখ্যা ২৮৪, মার্চ ৩, ১৭৫৮, প্যারা ৪২-৪৩

৬ তদেব, পৃ. ১২৮, ওই ক্রমিক সংখ্যা ২২১, নভেম্বর ১১, ১৭৫৭, প্যারা ৩

৭ Archives in India, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮ তদেব, পৃ. ১২৮, ওই ক্রমিক সংখ্যা ৩০৫

৯ Board of Revenue, June 13, 1815, No 42, Para 15

১০ Territorial Revenue, 1820, March 20, No 1

১১ তদেব

১২ তদেব, প্যারা ১২, ১৩

১৪ তদেব

১৫ তদেব

১৬ তদেব, প্যারা ৴, ৮

১৭ তদেব, নং ১, প্যারা ৩৬-৩৭

১৮ Archives in India, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১৯ Progs Presidency Committee of Records, March 31, 1826, No 1

২০ তদেব, নং ৩০৯

২১ তদেব, February 11, 1828, No 23

২২ ১৮২৭-২৮ সালে বিভিন্ন নথি কার্যালয়ের ওপর তৈরি প্রেসিডেন্সি কমিটির প্রতিবেদন

২৩ Board of Revenue, Dec 19, 1828, No 46

২৪ General Deptt. Oct 1860, Progs Nos 18 & 19, Circular No 6

২৫ Home (Public) Deptt Dec 1872, No 647, Archives in India, প্রাগুক্ত।

৩ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা : গঠন পর্ব : ১৯০৪--১৯০৯

১ Judicial Deptt., May 1902, Nos 79-82 'Disposal of Records belonging to a Magistrates office'

২ Political (Pol) Deptt., February 1910, Progs. 18

৩ তদেব

৪ তদেব ও Judicial Deptt., April 1904 Progs. 55

৫ Political Department, প্রাগুক্ত

৬ তদেব

৭ তদেব

৮ তদেব

৯ তদেব

১০ Deputation of special officer in connection with the re-organisation of Bengal Secretariat Record Room, Political (Pol) Deptt., Aug.1909, Progs. No. 16, K W File Sr No.1

১১ তদেব, প্যারা ৩

১১ক তদেব, প্যারা ৪

১২ তদেব, প্যারা ৫

১৩ তদেব

১৪ তদেব

১৫ তদেব

১৬ তদেব

১৭ তদেব

১৮ তদেব

১৯ তদেব, প্যারা ১০

২০ তদেব, রাজনৈতিক দপ্তরের অবর সচিব বি. এ. কলিন্সের প্রতিবেদন

২১ তদেব, প্যারা ৩

২২ তদেব

২৩ তদেব, মুখ্যসচিব এফ. ডবল্যু. ডিউকের 'নোট'

২৪ তদেব, প্যারা ৮

২৫ তদেব

২৬ তদেব, মুখ্যসচিবের বক্তব্য, তারিখ ২৭ মে, ১৯০৯

২৭ তদেব, সচিবদের সভা, জুন ৫, ১৯০৯

২৮ তদেব, Re-organisation of Record Room, Political (Pol) Deptt., Feb. 1910, Progs. No. 18, Para 6

২৯ তদেব, প্যারা ৭

৩০ তদেব, Destruction of useless papers
৩১ তদেব, 'Staff'
৩২ তদেব
৩৩ তদেব
৩৪ তদেব, Note on Mr Malpin's Report on the working of the Record Room etc 1909
৩৫ তদেব
৩৬ তদেব
৩৭ তদেব
৩৮ তদেব
৩৯ তদেব
৪০ তদেব, K W Files. A Feb 1910 No 18. Serial No 1
৪১ তদেব
৪২ তদেব, Appointment of Keeper
৪৩ তদেব
৪৪ তদেব
৪৫ তদেব
৪৬ তদেব।

৪ শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা পরিচালনবিধি : ১৯১০

১ Political (Pol.). August 1910. Progs No 2
২ তদেব, Progs No 4
৩ Political Deptt . September 1910. Progs No 20

৫ শ্রীনাথের সংস্কার পর্ব : ১৯১০--১৯১৬

১ Political Deptt . (K W) A Progs . February 1915. No 25
২ তদেব
৩ তদেব, প্যারা ২
৪ তদেব, প্যারা ৩
৫ তদেব, প্যারা ৪
৬ তদেব
৭ তদেব, প্যারা ৫, ৬
৮ তদেব, প্যারা ৭
৯ তদেব
১০ তদেব

১১ তদেব

১২ তদেব

১৩ Political (records) Deptt., Progs B, Nov., No 16

১৪ তদেব।

৬ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১৯২০–২০০০

১ Proceedings of the Indian Historical Records Commission First Annual General Meetings, Simla, March, 1919

২ Political (Records) Department, Progs B, October 1919, No 61

৩ তদেব

৪ Annual Report of the Work done in the Bengal Secretarial Record Room for the Year 1920

৫ তদেব, ১৯২৯

৬ তদেব, ১৯৩১ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর. বি. র‍্যামসবোথাম ওই চিঠি লেখেন মার্চ ৮, ১৯৩২

৭ Political (Records) Department, Progs B, August 1935, Nos 62–66

৭ক তদেব

৮ Political (Records) Department, 1936, Progs B, February, Nos 28–35

৯ তদেব, আরও দেখা যেতে পারে Progs B, July 1936 No 23

১০ Home (Political Confidential) File No W III 8/40

১১ Home (Records) Deptt Progs B, May 1948, Nos 6–7
'Supply of Information regarding organisation of the Records Branch of the Home Deptt's duties of it's officers required by the Administrative Enquiry Committee'

১২ Home (Records) Department, Progs B, January 1946, No 50, Order No 7071, October 22, 1945

১৩ স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রস্তাবিত মহাফেজখানার গঠন সংশ্লিষ্ট বিষয় ও অন্যান্য সমালোচনা আমি সংগ্রহ করেছি 'Annual Report of the National Archives for the year 1946' থেকে

Home (Records) Department, Progs B, February 1949, Nos 107–108

১৪ Home (Constitution and Election) Department, Progs B, December 1951, Nos. 538–39

১৫ Home (Records) Department, Progs. B, January 1941, Nos 49–50

১৬ তদেব

১৭ Educational (Records) Department, Progs. B, February 1962, Nos. 1–34

১৮ Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal 1955–56,

p. 1–3

১৮ক Educational (Archives) Deptt., Progs. B. April 1981, Nos. 1–18

১৯ প্রাগুক্ত, Educational (Records) Deptt., Progs. B. February 1962

২০ তদেব

২১ A note on the Progress of Archival work in the state Archives of West Bengal from January 1961 to 1966 প্রাগুক্ত, Education (Archives) Department 1981

২২ তদেব।

২৩ ১৯৮১-র লেখ্য সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর শুভেচ্ছা বার্তা, কলকাতা ১৯৮১।

৭ গবেষণাবিধি

১ Political (Records) Deptt., Progs. B, October 1915, No. 6, with K. W. file

২ Board of Revenue (Misc. Branch) File No. 275, 1915

৩ Political (Records) Deptt., 1928, K. W. file No. 3R-1/27

৪ তদেব

৫ তদেব, Progs. B, November 1928, No. 19–42, K. W. file No. 3R 1/1928

৬ Home (Records) Deptt., Progs. B, November 1938, No. 37, 'Proposed amendment of the Rules regarding access to the Records in the Custody of the Bengal Secretariat Record Room'

৭ তদেব

৮ তদেব

৯ তদেব

১০ Home (Records) Deptt., 1938, Progs. B, January Nos. 104–05

১১ তদেব

১২ Chief Minister Deptt. (Records) Progs. B, March 1949, Nos. 22–30

১৩ তদেব

১৪ তদেব

১৫ তদেব

১৬ State Archives of West Bengal : Historical Research Rules, 1977 (এরপর H R R)

১৭ তদেব, Research Rules, 1981

১৮ H R R প্রাগুক্ত

১৯ H.R.R ধারা 6, 7a

৮ কয়েকজন গবেষক

১ Political (Records) Deptt., Progs. B, July 1922, Nos. 29–40

২ প্রতুল গুপ্ত, দিনগুলি মোব, পৃ. ৮৫, কলকাতা ১ বৈশাখ ১৩৯২, পৃ. ৮৫

৩ Annual Report of the Bengal Secretariat Record room 1924

৪ তদেব

৫ Political (Records) Deptt , Progs B, January 1931, Nos 145-92

৬ তদেব

৭ তদেব

৮ তদেব, জুলাই ৭, ১৯২৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠি লেখেন ৪৮/২/২ বলরাম দে স্ট্রিট থেকে

৯ তদেব

১০ তদেব

১১ তদেব, ব্রজেন্দ্রনাথ ওই চিঠি লেখেন ১ ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে

১২ তদেব

১৩ তদেব

১৩ক তদেব

১৪ তদেব

১৫ তদেব, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে আগের মতন লিখেছিলেন ' a mass information on the subject may be gathered from the proceeding of the Judicial Deptt

১৬ তদেব

১৭ তদেব

১৮ তদেব, ওই নির্দেশ মুখ্য সচিবের দপ্তরের রাজনৈতিক উপসচিবকে জানানো হয

১৯ তদেব

২০ তদেব, বিভাগীয় মন্তব্য ২০ সেপ্টেম্বর ২৮-এ বলা হল 'The Hony' advisor has strongly recommended to waive the new rule 4 in favour'

২১ তদেব

২২ Political (Records) Deptt , Progs. B, April 1935, No. 6

২২ক তদেব

২৩ Political (Records) Deptt , Progs B March 1930, No. 31-36

২৪ Political (Records) Deptt., Progs B, February 1941, No 34-35

২৫ Political (Records) Deptt , Progs B, June 1936, No 32-38

২৬ তদেব

২৭ তদেব, Progs B Nov 1937, No 28

২৮ তদেব

২৯ Home (Records) Deptt , Progs B, May 1938, No 24-28

৩০ তদেব

৩১ Political (Records) Deptt , Progs B, March 1930, Nos. 31-39

৩২ তদেব

৩৩ তদেব, গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ছিল *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar* Vol 1

৩৪ Home (Records) Deptt , Progs B, November 1936, Nos 38

৩৪ক তদেব

৩৫ Home (Records) Deptt Progs B, November 1939, Nos 1 2

৩৬ তদেব

৩৭ তদেব, Progs B, January 1937, November 1939, Nos 68–71

৩৮ File Register, Home (Records) 1944, 45, 46

৩৯ Home (Records) Deptt , Progs B, 1941, Nos 44–45

৪০ Home (Records) Deptt , File No 4C 7/1948 নিয়ম অনুযায়ী নথিটি ধ্বংস করা হয় ১৯৫৪তে

৪১ Education (Records) Deptt , Progs B, September 1956, Nos 9–37

৪২ Home (Records) Deptt , Progs B, November 1949, Nos 8 11

৪৩ তদেব, অধ্যাপক বাগচী সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য File Register 1944, Home (Records)

৪৪ তদেব, এই সময় পুষ্পময়ী সম্পর্কে ক্ষুব্ধ 'রেকর্ডরুম' সহকারী যা লিখেছিলেন It is learnt that Miss Bose has left Berhampore for good There is no way keeping the file in our pending shelf for an indefinite period

৪৫ তদেব

৪৬ দ্রষ্টব্য ফাইল রেজিস্টার, স্বরাষ্ট্র (রেকর্ডস) দপ্তর ১৯৫০ ও শিক্ষা (রেকর্ডস) দপ্তর, ১৯৫২–১৯৬০

উল্লিখিত গবেষকদের গবেষণার বিষয় যা ছিল

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি	Economic History of Bengal during first four decades of the 19th Century
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন	Indian literature in the 19th Century
অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত	Land Revenue History of Bengal
অধ্যাপক রণজিৎ গুহ	The Economic and Social History of Bengal
অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরি	Bengal in 1857-59
অধ্যাপক এ. ডব্লিউ মামুদ	Impact of Economic Factors on the Social and political History of 19th Century India
অধ্যাপক তপনমোহন চ্যাটার্জি	Old vernacular Decuments
অধ্যাপক অনীল শীল	Growth of Nationalism inIndia
মি. ব্রেযার. বি. ক্লিং	Land Revenue Policy
মি. জন. এইচ. ব্রুমফিল্ড	The Bengal legislative council, 1912–1935

মিসেস জেনিফার এন. ব্লুমফিল্ড .

৪৭ Education (Records) Deptt Progs 13, June 1961, Nos. 25–112

৪৮ তদেব পরিশিষ্ট

৪৯ তদেব

৫০ Education (Records) Deptt Progs B, June 1954, Nos 24–26

৫১ Education (Records) Deptt. Progs B, April 1954, Nos. 5–6

৫২ তদেব

৫৩ তদেব

৫৪ তদেব

৫৫ তদেব

৫৬ Education (Records) Deptt Progs B, March 1957 Nos 3–4

৯ রেকর্ডরুম বা মহাফেজখানা ও ঐতিহাসিক নথিপর্ষদ

১ Indian Historical Records Commission – A retrospect, 1917–1948

২ ভারতীয় নথিপর্ষদের ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সম্মেলনে সভাপতি স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষণ, লাহোর, ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃ. ১, অনুচ্ছেদ ১

৩ Resolutions of the Indian Historical Records Commission 1919–1948, Govt of India, Delhi 1949

৪ তদেব

৫ Guide to records 1758 1858, Vol I, Calcutta, 1979

৬ ঐতিহাসিক নথিপর্ষদের ১৯২৩ সালে কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত

৭ তদেব, পৃ. ৪৪–৪৫

৮ তদেব, আলিগড়ে অনুষ্ঠিত পর্ষদের বিশতম অধিবেশনের তৃতীয় সিদ্ধান্ত

৯ Political (Records) Deptt , Progs B, Oct 1929, Nos 1-15 আরও দেখা যেতে পারে স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষণ, প্রাগুক্ত
নথিপর্ষদের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের 'শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি' দপ্তরের সচিবের কাছে ব্রজেন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করে যা লেখা হয়েছিল ' Mr Brajendra Nath Banerjee, an enthusiastic student of History and author of several books based on original and unpublished records, may be appointed as a corresponding member of the commission for the Calcutta Centre He has been carrying on research work in the Imperial Record Deptt Since 1923 and regularly contributes papers to the annual session of the commission.'

১০ পর্ষদ সরাসরি লিখেছিল : 'Owing to financial stringency the annual session of the IHRC have been in abeyance since 1931', Home (Records) Deptt , Progs B, July 1938 Nos 23–47

১১ Home (Records) Deptt , Progs. B, February 1945, Nos 4–37

১২ তদেব
১৩ তদেব
১৪ তদেব
১৫ তদেব
১৬ তদেব
১৭ তদেব
১৮ স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষণ, প্রাগুক্ত
১৯ তদেব
২০ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত পর্ষদের পঞ্চম সিদ্ধান্ত
২১ Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal (1951–1952) Appointed by the Govt. of West Bengal Review of the work done by the ad-hoc Regional Records Survey Committee 1945–1950 এর পর থেকে R R S C লিখব
২২ তদেব, পৃ. ১
২৩ তদেব
২৪ তদেব
২৫ তদেব, পৃ. ২
২৬ তদেব, পৃ. ২
২৭ R R S C. ১৯৪৯–৫০, Appointed by the I. H. R. C. p. 1–10
২৮ তদেব
২৯ তদেব
৩০ উদ্ধৃতি, R R S C., 1951–52, p. 3
৩০ক 'বাঙালনামা', তপন রায়চৌধুরী, *দেশ*, ২ আগস্ট ২০০৬, পৃ. ৫৪
৩১ R R S C., 1951-52, তদেব
৩২ তদেব
৩৩ তদেব, ওই চারজন গবেষক ছিলেন অধ্যাপক এন. বি. রায়, অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক তড়িৎকুমার মুখার্জী, অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্ত
৩৪ তদেব
৩৫ তদেব, ১৯৫২–৫৩, পৃ. ১
৩৬ তদেব
৩৭ তদেব
৩৮ তদেব, পৃ. ৩–৪
৩৯ R R S C., 1955–56, 'Report of an Investigation of the Gauripur Raj Estate Archives.'
৪০ তদেব, ড. অরুণকুমার দাশগুপ্ত সেন্ট জোনস চার্চের নথিপত্র দেখার পর যা লিখেছিলেন তাঁর প্রতিবেদনে : 'It has a fine collection of old records. The Authorities deserved to be congratulated for the excellent preservation of these valuable papers', p. 31

৪১ তদেব, ১৯৫৮–৫৯, পৃ. ১
৪২ তদেব, পৃ. ১, ৩, ৫
৪৩ তদেব, পৃ. ১
৪৪ তদেব
৪৫ অরুণ দাশগুপ্ত ইতিহাস চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে, পৃ. ৯–১১
A tribute to a mentor Narendra Krishna Sinha (1903 1974), W B State Archives, Govt of West Bengal, 2004
৪৬ The State Archives Review, Vol I, 2004, পৃ. ১০১, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা সচিবের স্বাক্ষরিত ওই স্মারক প্রচার করা হয়েছিল, ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৯। সরকারের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র সম্বন্ধে ওই নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল
৪৭ বার্ষিক নথি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকা, Glimpses of Calcutta, কলকাতা ১৯৯০, পৃ. ৩–৪।

১৩. আর্কাইভস ও এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

১ Guide to the Records in the National Archives of India, part I (Introduction) National Archives of India New Delhi 1959 p & para 2
২ Political (Records) Deptt, Progs B, August 1936 No 56–61
৩ তদেব
৪ তদেব
৫ তদেব, বিভাগীয় মন্তব্য ১৩.৩.৩৬
৬ তদেব, বিভাগীয় বক্তব্য ও কিপারের মন্তব্য ১৯.৩.৩৬
৭ তদেব
৮ তদেব
৯ তদেব, পরিশিষ্ট ২১।

১৪. শেষের কথা

1 Home (Records) Department, January, Prog B, 1952, No 50–52
2 Education (Records) Department, Progs B, 1955, No 100–130

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ক

১. ১৯২৮-এ যেভাবে 'আর্কাইভস' গড়ার কথা লিখেছিলেন ড আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম

২. ১৯২৮ সালে বাংলা সচিবালয়ের নথিপত্রের শ্রেণিবিভাগ

৩. মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম-এর অন্বেষা বিধি : ১৯২৮, ১৯৩৮

৪. সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ের আবেদনপত্র

৫. গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য বাবু যোগেশচন্দ্র বাগলের অনুরোধপত্র, গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি

৬. কিপার অভ রেকর্ডস্‌-কে বাবু পূর্ণচন্দ্র দে 'উদ্ভট সাগর'-এর আবেদনপত্র, পূর্ণচন্দ্রের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সুপারিশ

৭. কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী ও গবেষক ড. জে. কে. মজুমদারের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শংসাপত্র

৮. ১৯৩০-এর কালে মহাফেজখানায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছিল

৯. প্রথম মহিলা গবেষক মিস হেলেন জীন চ্যাম্পিয়নের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি

১০. বহরমপুরে মহাফেজখানার গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসুর আবেদন, সুপারিশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র

১১. পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদের সদস্য তালিকা

১২. ১৯৩৬-এ যে চিঠি দিল্লির 'ইম্পেরিয়াল রেকর্ড অফিস'-এ পাঠানো হয়নি

১৩. অক্টোবর ১৯৪৫ ও রেকর্ডরুম : কৌলীন্য বৃদ্ধি

১৪ 'রেকর্ডরুম'-এর দপ্তর বদল : খুব জরুরি ছিল?

১৫. 'রেকর্ডরুম'-এর নূতন ঠিকানা

১৬. রাজ্য মহাফেজখানায় গবেষকদের তালিকা : জানুয়ারি ১৯৬১—জুলাই ১৯৬৬; ১৯৭৭—১৯৮০।

১. ১৯২৮-এ যেভাবে 'আর্কাইভস' গড়ার কথা লিখেছিলেন ড. আর. বি. র‍্যামস্‌বোথাম

From

R. B. Ramsbotham, Esq., M.B.E., M.A., B.Litt.,

To

J. R. Blair, Esq., I. C. S.

Deputy Secretary, Political and Foreign Deptt.,

Government of Bengal.

Chinsura, the 22nd January, 1928.

Sir,

I have the honour to submit for your consideration suggestions for the establishment of a permanent policy which the Government of Bengal may be advised to frame for the preservation and administration of the archives in its possession. These suggestions contain only the main lines which, in my judgement, the policy of Government should embody, and I beg leave to submit that the Keeper of the Records should be requested to state how far the existing methods of preserving the archives conform to the principles now suggested; and what adaptations, dictated by local conditions, in his opinion are necessary. It will then be possible to frame and establish a definite "Archives" policy which will not be exposed to fluctuation with successive official changes.

2. It is as well at this point to consider primarily what the duties of an archivist are. The archivist's duty is first and foremost the safe preservation of the archives entrusted to his care; this is his first and most important duty. When he has done all that is necessary to protect and preserve his archives, he may consider their historical or other use; but he is and must be firstly the servant of his archives, and secondly, of those who wish to makc use of those archives. In this connection I would quote the opinion of Mr. H. Jenkinson, of the Public Record Office, one of the foremost archivist of modern times .. "Most of the bad, sometimes damaging, work which has been done upon the archives in the past, from the "methodizing" of them down to the publication of expensive calendars conforming so closely to the

desires of one generation of students that they were quite useless for the purposes of the next—most of the bad and dangerous work done in the past may be traced to external enthusiasms iJesulting in a failure on the part of the archivist to treat archives as a separate subject."

If this opinion is accepted, as I think it must be, it follows that it is not the duty of the archivist to decide what publications the Public requires or what are most needed for Historical research. His opinion, if asked, may be freely given and his advice is bound to be of value in guiding research workers, but these aspects are primarily outside his duty as an Archivist.

3. I submit, therefore that the Records Department should cease forthwith to spend money in the editing and publication of records, as being outside the recognised sphere of their work. The money thus saved may be diverted to employing extra typing hands who should be given the work of copying those records which give indication of becoming undecipherable from decay of the paper, failure and discolourisation of ink, or any other cause. In this way, the contents of valuable and perishing records will be preserved.

4. The actual housing of the archives themselves requires careful consideration. The present conditions not ideal, but they might be much worse. The main objections to the present housing appear to be :

(a) the rooms are too dark and are badly ventilated;

(b) the blocks containing the archives are separated from each other, involving in one case considerable distances for the fetching and replacing of archives;

(c) insufficient space for repairing work :

(d) absence of search rooms.

It is probable that these conditions cannot be entirely altered, but very material improvement can be made by improving the lighting and ventilation of the upper portion of the blocks in which the archives are housed, and by a free use of vacuum cleaners, with brush attachments. Free circulation of air is of the greatest importance in preserving the life of documents.

In this connection it is desirable to leave in every floor where archives are stored in a clear space sufficient for cleaning them, without having to remove them from the block. The artificial lighting

appears to be quite satisfactory, and the methods of protection in this respect efficient.

5. The danger of fire to archives is generally more probably from outside than inside causes. Fire protection to some extent can be effected by ready direct communication with the Fire Brigade Stations, by frequent and unannounced rehearsals of fire drill, by the prohibition of smoking and introduction of inflammable material, and by the employment of asbestos, steel, and concrete as much as possible in the construction of the buildings.

6. In view of the great importance of housing the archives as satisfactorily as possible I suggest that the Government of Bengal should follow the practice of the Public Record Office in London, and should appoint a senior Officer of the Record Keeping Department to be officer in charge of Floors. This Officer would be subordinate to the Keeper of the Records, and his duties would be under the supervision of that Officer.

The Officer in charge of Floors, would be directly responsible for the housing of the archives. He would be required to see that the archives were kept clean, that the places in which they are deposited were properly lighted and ventilated, that proper precautions against fire were in force in the blocks under his charge; except for seeing that documents in need of repair are sent to the repairing Department, the Officer in charge of Floors would not be responsible for the issue of documents : this responsibility would lie with the Keeper of the Records.

The actual administration of the Floors Department can be dealt with in detail in a separate note if the suggestion of appointing such an officer is deemed worthy of exploration.

7. Government's main policy therefore towards the Archives, as I understand it will be one primarily of protection and preservation. With the use made of those archives by scholars, students, and others, it is also concerned, but in a secondary degree.

It is, in general, the duty of Government through its Record Department to provide facilities under proper restrictions for the examination of archives. This is best done by the establishment of rooms in which such work may be carried out. Such rooms are usually called Search Rooms, and are placed in the personal charge of experienced Officers of the Records Department who are required to

be present during the whole time during which the rooms are occupied by students.

The details necessary for the transference of archives to and from the Floors their protection from improper handling and use, the qualifications and conditions to be required from those who wish to study in the Search Rooms need not at this point be discussed. It is sufficient to say that such search rooms are essential, firstly for the preservation of the archives themselves and secondly for the convenience, and indeed, necessity of those who wish to study the archives.

Search rooms are usually classified under three heads

(a) Legal, in which legal documents can be examined on payment of a fee,

(b) Departmental, in which departmental records can be inspected or studied. A specific permit from the particular department whose records are desired for investigation is usually required before the documents in question are produced.

(c) Historical and literary, to which admission is given by ticket under certain restrictions and conditions where historical and literary documents can be inspected and studied.

8. The subject of repairs requires special mention. for it constitutes a sub-department of its own. The technical skill and knowledge required in the restoration and preservation of documents is such that it may properly be termed a craft, and should be paid for at craftsman's rates. In Bengal, the archives consist almost entirely of paper documents, whose preservation presents very considerable difficulties. From what I have seen the Record Department of the Government of Bengal is doing good and skilful work but it is sorely handicapped in its task of repairing damaged documents by the absence of any proper room in which repairers can work. I saw repairs being carried out in a roofed-in verandah which may be satisfactory between the months of November and May, but is liable to be unsatisfactory between the months of June and October. In my opinion, it is very desirable to place the repairs, definitely under one officer, as a separate department of the Record Office, with its own room, and under definite regulations, with a regular record kept of all documents sent into the repairing room, and of the date and nature of the repairs effected.

9. In conclusion, I beg leave to recapitulate briefly the suggestions submitted in this letter. They are

(i) That the Government of Bengal should frame and adopt a fixed policy for the protection, preservation and maintenance of the archives in its possession

(ii) that it should be a definite feature of that policy not to publish or edit, as part of the duties of the Record Office, any document among the archives in its possession

(iii) that under due restrictions and with proper precautions, the archives should be available to the public for study, examination, or, investigation, and that proper rooms should be set aside for this purpose

(iv) that the ventilation and lighting of the blocks in which the archives are deposited should be examined by architectural experts in company with Officers of the Record Department; that a modern system for the systematic cleaning of the documents and archives, as well as of the blocks in which they are placed, should be instituted, and that a senior Officer, known as the Officer in charge of Floors, should be placed in charge of the blocks containing the archives and be responsible for their proper administration. This Officer will be subordinate to the Keeper of the Rocords

(v) that the work of repairing the records shall be re-organised under an officer who shall be definitely in charge of this department, but subordinate to the Keeper of the Records ; and that a proper room shall be definitely set aside for those engaged in this important work.

10. In this letter I have not attempted to explain in detail the re-organisation which will be required if these suggestions seem practical for use in the Bengal Record Department. If Government considers that the policy now adumbrated is worthy of closer examination I am ready, if required, to submit in greater detail, plans for the re-organisation of the Record Department, which the introduction of these suggestions will render necessary,

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. R. B. Ramsbotham

২. ১৯২৮ সালে বাংলা সচিবালয়ের নথিপত্রের শ্রেণিবিভাগ

১৯২৮-এ বাংলা সচিবালয়ের 'রেকর্ডরুম'-এ সংরক্ষণযোগ্য নথিপত্রের শ্রেণিকরণ। নথিপত্রের এই শ্রেণিবিভাগ অবশ্যই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না।

[সূত্র : Pol. (Records) Deptt., B, Nov. 1928, No. 43]

Proposed classification of
papers in the Record Room.

....

Nature of papers.	Period of Preservation
"A" cases	
1. Correspondence with the Government of India and Secretary of State regarding the treatment of old records	
2. Important questions regarding the organization and work of the Record Room.	Permanent
3. Annual reports of the Record Room.	
4. Rules for the management of the Secretariat Record Room	

"B" cases

To be preserved permanently

1. Permanent establishment — apointment, promotion, leave etc.
2. Applications for certified copies of records or production or inspection of records and replies thereto where questions of principle are involved.
3. Transfer, receipt or exchange of original records.
4. Distribution of Proceedings volumes and Record Room publications—original or revised orders of a permanent nature.
4. Important or standing orders relating to the work of the Department

e.g. printing of records
presslisting of records
repair & preservation of records
consolidation of indexes
arrangement, classification and cataloguing of records

6. Circular orders of Government of a permanent character
7. Catalogue of Books in the Record Room Library.

"B" papers

To be preserved for 12 years.

1. Temporary establishments
2. Withdrawal of money from Provident Funds
3. Advances for house building
4. Exchange of copies of documents with the India Office
5. Office notes, progress reports etc. regarding consolidation of indexes.

"C" papers Unrecorded to be preserved for 3 years

1 Entire files consisting of correspondence on unimportant routine matters.

2. Notes etc. relating to matters of office routine.

3 Unimportant periodical returns and reports.

4. Conduct and discipline of staff—except serious cases in which entries have been made in service books.

5. Grants of travelling allowance for taking records.

6. Applications for appointments.

7. Purchase of furniture and office requirements.

8. Purchase of books.

9. Material for preserving and storing records.

10. Distribution of Proceedings volumes and Rocord Room publications (except original or revised orders of a permanent character).

11. Recovery claims.

12. Purchase, cleaning and repair of typewriters.

13. Printing and supply of forms.

14. Petty repairs to buildings, electric installation etc.

15. Applications for certified copies of records or production or inspection of records and replies thereto where no question of principle is involved and the case is settled by the orders issued.

16. Copies of orders issued by other Departments or Government and sent for information only.

17. Requisition for the production of records in Courts or for Government officers and replies thereto, provided the rocords have been returned.

18. Transfer of 3rd year records by the Departments of the Secretariat.

19. Stationery.

20. Telephones.

21. Budget estimates.

22. Livery to Peons.

23. Circular orders of a temporary character.

24. Petitions and memorials.

25. Summons to appear as witness in Courts.

26. Quarterly reports of the Current Record Room (Rule 49 (17) of the Record Room Rules)

27. Office notes and progress reports etc. regarding the various branches of work in the Historical Record Room.

৩. মহাফেজখানা বা রেকর্ডরুম-এর অন্বেষা বিধি : ১৯২৮, ১৯৩৮

Rules and Regulations governing the public use and inspection of the Records and Archives belonging to the Government of Bengal.

[These cancel rules 54-56 of the Rules for the Management of the Bengal Secretariat Record Room.]

1. The public have no right to see or have copies of records in the possession of Government, who reserve to themselves the right to refuse or modify any application.

2. The inspection or examination of such document as Government may permit to students and others shall be subject to the following conditions and regulations.

3. The inspection and examination shall be carried out in the Search Room set apart for the purpose at specified hours.

4. The hours of attendance and admission shall be from 11 a.m. till 4-30 p.m., except on Saturdays, when they shall be from 11 a.m. till 1-30 p.m.

5. The Search Room shall be open only to authorised persons every day, except Sundays and such days as are declared to be Government holidays.

6 Persons wishing to obtain information from or copies of the records should apply in writing to the Keeper of the Records, Writers' Buildings, Calcutta, stating their occupation and the object for which the information or copies are required

7. Every person wishing to inspect any document shall first obtain a student's ticket by making a written application on the prescribed form to the Keeper of the Records. Government of Bengal, Writers' Buildings, Calcutta. The forms can be obtained from the Keeper of the Records.

8. Each application must be accompanied by a recommendation, on the prescribed form, to be obtained from the Keeper of the Records.

Applicants who are not British subjects must submit a recommendation from their Consul or the Political Agent of the State to which they belong.

9. Each ticket will be issued for a period of six months only.

Renewals for six months at a time may be obtained, subject to Government's consent.

10. Government reserve to themselves the entire right to decide whether a document or archive shall be issued for inspection. No reasons will be given in case of refusal, but the final decision for refusal shall rest with the Deputy Secretary to Government in the Political Department

11. Documents of exceptional value and documents in a fragile condition shall only be produced subject to such conditions as the Keeper of the Records shall, in the particular case, think requisite for their safety and integrity. No such documents shall be issued for the use of students where certified copies exist. Not more than four documents will be issued at one time to a student.

12. No person shall lean upon any records, documents or books belonging to the Bengal Government's archives, or place upon them the paper on which he or she is writing. The utmost care must be exercised in handling all books and documents.

13. No person shall make any sort of mark, in pencil or otherwise, upon any record, document, or book belonging to the Bengal Government's archives.

14 No ink or indelible pencil shall be used by any person, admitted to the search room ; nor shall any typewriter, portable or otherwise, be permitted in the Search Room.

15. No tracing shall be made of any record or document issued for examination without the written permission of the Deputy Secretary to the Government of Bengal in the Political Department.

16. Silence, as far as possible, is to be maintained in the Search Room.

No umbrellas, sticks or bags shall be taken into the Search Room. No food shall be eaten in the Search Room; no pan is to be chewed there Spitting and smoking are strictly prohibited, and in no circumstances is it permitted to strike a match in the Search Room

17. Records and documents, when done with, or at closing time, shall be returned in person by the individual to whom they have been issued to the Officer in charge of the Search Room, together with the slip* issued by the Keeper of Records when the document was handed over for examination

---

*Each document required by a student should be issued with a printed tally, half to be retained by the Issuing Officer, half to be given to the student and returned by him with the document after use or at the close of the day

B.G Press—5-7-1928—745M—400—L.M.M

18. The Officer in charge of the Search Room is empowered to exclude persons from the Search Room for—

(i) wilful breach of the foregoing rules and regulations ;

(ii) persistent disregard of the officer's authority ;

(iii) damage of any sort to any record or article belonging to the Government of Bengal ,

(iv) language, conduct, habits, dress or anything else offensive, or likely to cause offence, to other occupants of the Search Room ;

Provided always that the exclusion of any person shall be notified in writing to the Deputy Secretary, Government of Bengal, Political Department, whose orders shall be final.

19. If a search is to be made by the Record Room staff the applicant is required to deposit a searching fee at the rate of Rs. 60 a month or Rs. 2 a day, to be deposited in advance with the Cashier of the Secretariat. On the deposit being made, the search will be made by an assistant and the information wanted will be furnished to the applicant, if, after inspection of the records and consultation with the Department concerned, it is considered that there is no objection to this being done. Any balance will be refunded by the Accounts Department on the order of the Keeper of the Records

20. No information and no copies of documents may be given and no person may be permitted to make a copy of any document without reference to the Department concerned

21. The charge for copies made by the Record Room staff will be at the rate of two annas per 100 words ; such copying charges must be paid in advance.

সংশোধিত অন্বেষা বিধি : ১৯৩৮

Rules and Regulations governing the public use and inspection of the Records and Archives belonging to the Government of Bengal.

[These Rules apply to bonâfide students of history and research scholars only and are incorporated under rules 65 and 76 of the Rules for the Management of the Bengal Secretariat Record Room.]

1. The public have no right to see or have copies of records in the possession of Government, which reserve to themselves the right to refuse or modify any application.

2. The inspection or examination of such documents as Government may permit to students and others shall be subject to the following conditions and regulations.

3. The inspection and examination shall be carried out in the Search Room set apart for the purpose at special hours.

4. The hours of attendance and admission shall be from 11 a.m. till 4-30 p.m., except on Saturdays, when they shall be from 11 a.m. till 1-30 p.m.

5. The Search Room shall be open only to authorised persons every day, except Sundays and such days as are declared to be Government holidays.

6. Persons wishing to obtain information from or copies of the records should apply in writing to the Keeper of the Records, Writers' Buildings, Calcutta, stating their occupation and the object for which the information or copies are required.

7. Every person wishing to inspect any document shall first obtain a student's ticket by making a written application on the prescribed form to the Keeper of the Records, Government of Bengal, Writers' Buildings, Calcutta. The forms can be obtained from the Keeper of the Records.

8. Each application must be accompanied by a recommendation, on the prescribed form, to be obtained from the Keeper of the Records.

Applicants who are not British subjects must submit a recommendation from their Consul or the Political Agent of the State to which they belong.

9. Each ticket will be issued for a period of six months only. Renewals for six months at a time may be obtained, subject to Government's consent.

10 Government reserve to themselves the entire right to decide whether a document or archive shall be issued for inspection. No reasons will be given in case of refusal, but the final decision for refusal shall rest with the Deputy Secretary to Government in the Political Department.

11 Documents of exceptional value and documents in a fragile condition shall only be produced subject to such conditions as the Keeper of Records shall, in the particular case, think requisite for their safety and integrity. No such document shall be issued for the use of students where certified copies exist. Not more than four documents will be issued at one time to a student

12 No person shall lean upon any records, documents or books belonging to the Bengal Government's archives, or place upon them the paper on which he or she is writing. The utmost care must be exercised in handling all books and documents.

13. No person shall make any sort of mark, in pencil or otherwise upon any record, document, or book belonging to the Bengal Government's archives

14 No ink or indelible pencil shall be used by any person, admitted to the Search Room ; nor shall any typewriter, portable or otherwise, be permitted in the Search Room

15 No tracing shall be made of any record or document issued for examination without the written permission of the Deputy Secretary to the Government of Bengal in the Political Department.

16 Silence, as far as possible, is to be maintained in the Search Room

No umbrellas, sticks or bags shall be taken into the Search Room No food shall be eaten in the Search Room , no pan is to be chewed there Spitting and smoking are strictly prohibited and in no circumstances is it permitted to strike a match in the Search Room

17 Records and documents, when done with, or at closing time, shall be returned in person by the individual to whom they have been issued to the Officer in charge of the Search Room, together with the slip* issued by the Keeper of Records when the document was handed over for examination

18. The Officer in charge of the Search Room is empowered to exclude persons from the Search Room for—

*Each document required by a student should be issued with a printed tally, half to be retained by the issuing officer, half to be given to the student and returned by him with the document after use or at the close of the day

B G Press—1936-37—1683A—200

(i) wilful breach of the foregoing rules and regulations ;

(ii) persistent disregard of the officer's authority ;

(iii) damage of any sort to any record or article belonging to the Government of Bengal ;

(iv) language, conduct, habits, dress or anything else offensive, or likely to cause offence, to other occupants of the Search Room ;

Provided always that the exclusion of any person shall be notified in writing to the Deputy Secretary, Government of Bengal, Political Department, whose orders shall be final.

19. If a search is to be made by the Record Room staff the applicant is required to deposit a searching fee at the rate of Rs. 60 a month or Rs. 2 a day, to be deposited in advance with the Cashier of the Secretariat. On the deposit being made, the search will be made by an assistant and the information wanted will be furnished to the applicant, if, after inspection of the records and consultation with the Department concerned, it is considered that there is no objection to this being done. Any balance will be refunded by the Accounts Department on the order of the Keeper of Records.

20. No information and no copies of documents may be given and no person may be permitted to make a copy of any document without reference to the Department concerned.

21. The charge for copies made by the Record Room staff will be at the rate of two annas per 100 words ; such copying charges must be paid in advance.

22 Any person who uses the records for purposes of historical research and publishes any article or work based on them shall deposit in the Bengal Secretariat Record Room one copy of each work immediately after publication.

৪. সরকারি দলিল দস্তাবেজ দেখার জন্য বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ের আবেদনপত্র

48 / 2 / 2, Boloram De Street,
Calcutta, 2nd July, 1926.

The Keeper of Records,
Government of Bengal.

Sir,

I shall be extremely thankful to you if you kindly grant me permission to consult some of the documents relating to the Committtee of Circuit, as detailed in the Press List, Vol II

I might say that I have been conducting searches among the Imperial Records for some time but I am sure if I were allowed access to the documents mentioned above, they would throw a flood of light on the subject of my study.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Brajendra Nath Banerji

48 / 2 / 2, Boloram De Street,
Calcutta, 7th July, 1926.

The Keeper of the Records of the Government of Bengal.
Calcutta

Sir,

I am in receipt of your letter No. 360 R.R dated 6th instant

The records of the Committee of Circuit which I am desirous of consulting are in respect of the Sannyasi risings in Bengal and Munni Begam, the wife of Nawab Mir Jafar, as I have in view the publication of monographs on these subjects

I am a bona fide student of Indian History working under the guidance of Prof Jadunath Sarkar, C I E. and have already published "Begam Samru" and "Rajah Ram Mohun Roy's Mission to England" based on unpublished records of the Government of India.

I trust the above information is what you require.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Brajendra Natha Banerji

---

48 / 2 / 2, Boloram De Street,
Calcutta, 16th July, 1926.

The Keeper of the Records of the Government of Bengal.

Sir,

On consulting the Proceedings of the Committee of Circuit relating to the Sannyasi disturbances in Bengal it strikes me that a search conducted among the records of the Judicial Department would bring to light further materials on the subject, and I solicit the necessary permission for this I shall also be glad if you kindly grant me permission to examine the records of the Judicial and Education Departments relating to Rajah Rammohun Roy and Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar respectively, to enable me to publish monographs on these two Indian worthies

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Brajendra Natha Banerji

1, Clive Street
Calcutta, 25th August, 1926

The Keeper of the Records of the Government of Bengal.

Sir,

I shall be extremely thankful to you if you kindly grant me permission to consult the Revenue records of the Government of Bengal from 1775—1858 to enable me to collect materials on the following subjects :

Sannyasi Disturbances in Bengal

Lutf-un-nisa Begam — Wife of Nawab Siraj-ud-daula

Mani Begam — Wife of Nawab Mir Jafar

Rajah Rajendra Lal Mittra

Rajah Radhakant Deb Bahadur.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Brajendra Nath Banerji

1, Clive Street,
Calcutta, 14th September, 1928.

Department	
Branch	
File No.	
Number	
Date of Receipt	
...y No.	344

The Deputy Secretary

to the Political Department

Government of Bengal.

Sir,

I have been working as a historical student among the records of the Bengal Government for the last two or three years, in spite of the difficulties due to my being an employee of a Mercantile firm, which does not make it possible for me to attend the Record Office during the prescribed hours. Your predecessor, Mr. S. N. Roy, I.C.S., however, was kind enough to issue special instructions, permitting me to conduct research work among the Bengal Government records on all Saturdays only between the hours of 1-30 and 4-30 p.m. This arrangement, as far as I know, never caused any inconvenience to that section of the staff, who stays in the Record Office up to 4-30 p.m. on Saturdays, as I used invariably to send in my requisitions a day ahead. Under the revised Record Office rules, brought into force recently, I beg to apply to you for the favour of continuing the same permission to work on Saturdays from 1-30 to 4-30 P.M.

My researches among State Records are well known to Principal Ramsbotham to whose learned journal - "Bengal: Past & Present" - I contribute regularly. The latest result of my work among the Bengal records, viz., "The Dawn of New India", (a copy of which I beg to present to you) has been well-spoken of by Dr. Barnett in the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. The soundness of my work as a student of history will be seen from the enclosed printed sheet.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Brajendra G.

120/2, Upper Circular Road,

Calcutta, 9th July, 1934.

...	Poll
	Records.
Number ... File	46/36 4
... Receipt	10. 7. 36
...	152

The Keeper of the Records

of the Government of Bengal,

Bengal Secretariat.

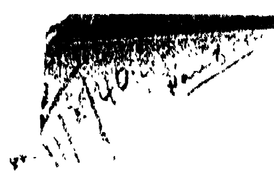
Sir,

I shall be obliged if you will kindly allow me to consult the pre-Mutiny records of the Education Department, including those of the General Committee of Public Instruction. They are likely to contain a good deal of information on the worthies of the early nineteenth century - a subject with which I am interested.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Brajendra Nath Banerji

৫. গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য বাবু যোগেশচন্দ্র বাগলের অনুরোধপত্র, গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের অনুলিপি



Department of Home	
Branch	Records
File No.	4C-6/40
No. in File	1
Date of receipt	11 3 40
Diary No	145

To
The Keeper of Records,
Government of Bengal

Sir,

I beg to state that I was allowed to consult records in connection with my research work regarding early nineteenth-century education in Bengal in 1935. But owing to my engagements elsewhere I could not continue it for long. I now want to resume my research work. Therefore, pray a fresh ticket may be issued to me for the same purpose.

My previous ticket is enclosed herewith.

I have etc.
Your most obedient Servant
Jogesh Chandra Bagal

104, Hari Ghose Street
Calcutta 11-3-40

বাবু যোগেশচন্দ্র বাগলের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি

D

Student's Ticket of Admission to the Records Department Search Room, Government of Bengal.

This ticket is valid for 6 Calendar Months from the date of issue. It may be **renewed** on application to the Keeper of Records, if the application is approved.

Babu Joges Chandra Bagal

is permitted to use the Search Room of the Records Department, Government of Bengal, subject to the conditions imposed, and to such alterations and limitations as may from time to time and without previous notice be enforced.

Date 5/6/35

J C Dawson
Keeper of Records

B G Press—30-6-1928—720M—1,000—C. C. C

৬. কিপার অভ রেকর্ডস্-কে বাবু পূর্ণচন্দ্র দে 'উদ্ভট সাগর'-এর আবেদনপত্র পূর্ণচন্দ্রের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সুপারিশ

Department	Political
Branch	Record
File	4C/11/35
No.	
[illegible] of Receipt	19.10.35
Diary No.	254

To
The Keeper of the Records
Govt. of Bengal
Calcutta.

Sir
With reference to your letter no. 582 R.R dated 12th Sep. 1935 I beg to say that I have been collecting materials for the purpose of writing the History of Calcutta. And in that connection I desire to consult records relating to Gokul Chunder Mitra and Madanmohan.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Purnachandra Uddhatasagar

10B Nebubagan Lane
Calcutta
19.10.35.

C

Recommendation.

I recommend from personal knowledge [illegible]

to be a fit and proper person to be allowed access as a student to the Search Room of the Government of Bengal Records Department.

Signed [illegible]

Address [illegible]

Qualifications

Date [illegible]

B G. Press—26-6-1928—719M—300—C. C. C.

৭. কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবহারজীবী ও গবেষক ড. জে. কে. মজুমদারের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর শংসাপত্র

Bar Library Club,
Calcutta, 12/4/33.

I have much pleasure in stating that Dr. J.K.Majumdar, Bar-at-Law is well-known to me. He has been carrying on research work for some time in various subjects, including History. I most gladly support his application for permission to use the records in the Imperial Records Department.

(Sd) Shyama Prosad Mukerjee.

৮. ১৯৩০-র কালে মহাফেজখানায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছিল

(a) Administrative History of Bengal 1813—53

(b) History of the Hooghly College

(c) History of the Calcutta Medical College

(d) Life of Raja Ram Mohan Roy

(e) History of old Calcutta

(f) Raja Ram Mohan Roy and his father Ram Kanta Roy

(g) Particulars about Edward Fletcher, John Fletcher, John Taylor and Sir H. Fletcher

(h) Evolution of Local Self-Government in India

(i) History of the Mayurbhanj State

(j) Early Land Revenue System in Bengal & Bihar

(k) History of the Eden Gardens and the Calcutta Cricket Club

(l) History of the Early Surveys in India

(m) History of the Sinha Sarma family of Susang, Mymensingh

(n) Some social customs in Bengal, e.g , Dharna, Child sacrifice, human sacrifice etc.

(o) Life of General Claude Martin

(p) History of Assam

(q) Growth of Indian Judiciary

(r) History of Indian Agriculture in the 19th Century

(s) History of Indian Constitutional Development

(t) Family History of Ray Ram Chandra Sen of Somra, connected with the family of the Diwan to the Board of Revenue, Hooghly, in connection with a book named"Chand Rani".

(u) History of the Fort William College of Bengal

(v) Growth of the English Constitution in India

৯. প্রথম মহিলা গবেষক মিস হেলেন জীন চ্যাম্পিয়নের গবেষণাকক্ষ ব্যবহারপত্রের প্রতিলিপি

D

No.

Student's Ticket of Admission to the Records Department Search Room, Government of Bengal.

This ticket is valid for 6 Calendar Months from the date of issue. It may be renewed on application to the Keeper of Records, if the application is approved.

Miss Helen Jean Champion

is permitted to use the Search Room of the Records Department, Government of Bengal, subject to the conditions imposed, and to such alterations and limitations as may from time to time and without previous notice be enforced.

Home (Records) Dept

Date 5th November 1940

[signature] 5/11/40

Keeper of Records.

B. C Press—30-6-1928—729M—1,000—C. C. C.

১০. বহরমপুরে মহাফেজখানার গবেষণাকক্ষ ব্যবহারের জন্য শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসুর আবেদন, সুপারিশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র

B

To the Keeper of the Records

Government of Bengal.

I beg leave to apply for a Student's ticket enabling me to inspect documents in the Search Room of the Government of Bengal Records Department. I promise to comply with the rules and conditions in force. The subject of my research is Education in Bengal, with special reference to Women's Education since the time of East India Co

I am/~~am not*~~ ~~a British~~ subject of Indian Dominion

I append a duly signed recommendation.†

Name (in block letters) (MISS) PUSHPAMOYEE Bose

Address Maharani Kashiswari G. H. School

Berhampore West Bengal

Signature Pushpamoyee Bose

Date 11. 2. 49.

* Persons who are not British subjects applying for permission to use the Search Room must obtain the recommendation of their Consuls, or Political Agents before such permission will be considered.

† The recommendation should be obtained from some High Educational Officer like the Vice-Chancellor of a University, the Director of Public Instruction, Principal of a Government College, etc.

Department	Home
	Records
File No	4C-1/49
No. in File	1A
Date of receipt	12.2.49
Diary No.	156

C

Recommendation.

I recommend from personal knowledge *The*
Miss Freshpan ...
to be a fit and proper person to be allowed access as a student to the Search Room of the Government of Bengal Records Department.

Signed *A. Bhattacharyya B.E.S.*

Address *Berhampore Court*
W. Bengal.

Qualifications *B.A., B.T.*

Date *10. 2. 49.*

B. G. Press—1938-39—12915A—600.

১১. ভারতীয় ঐতিহাসিক নথি পর্ষদ মনোনীত পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদের সদস্য তালিকা (১৯৪৯-৫০)

১. স্যার যদুনাথ সরকার, সভাপতি

২. ড. আর. সি. মজুমদার, এম. এ., পিএইচ. ডি. আহ্বায়ক
বিপিন পাল রোড, কলকাতা ২৬।

৩. ড. এন. কে. সিনহা, এম.এ., পিএইচ.ডি., সম্পাদক
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. কিপার অভ রেকর্ডস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বহরমপুর

৫. পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, এম.এ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

৬. ড. এ.পি. দাসগুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি., ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি
পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বি.এ., বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা

৮. মি. মহীবুল হাসান খান. বি.এ. অনার্স (লন্ডন), রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গাল
৫/সি স্যান্ডাল স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নং ৪, কলকাতা

৯. ড. পি. সি. গুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি.
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. ড. এম. এল. রায়চৌধুরী, এম.এ., ডি.লিট.
লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১১. ড. আই.বি. ব্যানার্জী, এম. এ., পিএইচ. ডি.
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. ড. এ.সি. ব্যানার্জী, এম.এ., পিএইচ.ডি.,
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. ড. এস.পি. সেন, বি এ. অনার্স (লন্ডন), ডি. ফিল
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. ড. ডি. এন. ব্যানার্জী, এম. এ.
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. ড. ডি সি. গাঙ্গুলী, এম.এ.
কিউরেটর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা

সহযোজনে সদস্য
শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, বি.এ., ১২০/২, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা
শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম.এ চুঁচুড়া
শ্রী তপনকুমার রায়চৌধুরী, এম.এ.
সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ, কলকাতা এবং শ্রী নির্মাল্য বাগচী, এম.এ. বহরমপুর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মনোনীত আঞ্চলিক নথি অনুসন্ধান পর্ষদের সদস্য তালিকা (১৯৫৮-৫৯)

১. ড. এস.এন. সেন, এম. এ., পিএইচ. ডি., ডি. লিট
২. ড. আর. সি. মজুমদার, এম. এ., পিএইচ.ডি.
৩. অধ্যাপক এস. সি. সরকার, এম (অক্সন) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
৪. ড. এন. কে. সিনহা, এম.এ., পিএইচ ডি., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. ড. সুধাকর চ্যাটার্জী, এম.এ., পিএইচ.ডি., বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ড. ইউ. এন. ঘোষাল, এম. এ., পিএইচ.ডি., এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল
৭. ড. ডি.সি. গাঙ্গুলী, কিউরেটর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল
৮. ড. এম. এল. রুনওয়াল, অধিকর্তা, জুলোজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া, কলকাতা
৯. শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১০. ড. পি.সি. গুপ্ত, রিডার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. ড. এ.সি. ব্যানার্জী, লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১২. ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা
১৩. ড. এস.পি. সেন. লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪. ড. সি.সি. দাসগুপ্ত, এম.এ., পিএইচ.ডি., অধ্যক্ষ, দার্জিলিং সরকারি মহাবিদ্যালয়
১৫. শ্রী এম.বি. রায়, এম.এ., রিডার, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১৬. শ্রী তড়িৎকুমার মুখার্জী, এম.এ., সহকারী অধ্যাপক, টাকি সবকারি মহাবিদ্যালয়
১৭. শ্রী বিনয় ঘোষ, এম.এ., রক্‌ফেলার গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৮. শ্রী এস. কে. সরস্বতী, এম.এ., রিডার, ইতিহাস বিভাগ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯. শ্রী নির্মলকুমাব বসু, অধিকর্তা, অ্যান্‌থ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া, কলকাতা
২০. শ্রী মানিকলাল সিন্‌হা. সচিব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা
২১. শ্রী রাসবিহারী রায়, অধীক্ষক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, মেদিনীপুর ও সম্পাদক *মেদিনীপুর পত্রিকা*
২২. কিপার অভ রেকর্ডস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

১২. ১৯৩৬-এ যে চিঠি দিল্লির 'ইম্পেরিয়াল রেকর্ড অফিস'-এ পাঠানো হয়নি

1936
Government of Bengal

Enclosures :	To The Secy. to the Govt. of India Dept of Education, Health and Lands, New Delhi.	Department	Political
Maps or plans		Branch	Records
		File	
Spare copies :	**Subject** Transfer of Imperial Record Department to New Delhi	Number	
		Issue number	
		Date of issue	

Reminders issued :
1st No. ... ., dated ..
2nd No. .. .. , dated
3rd No. ...., dated . .

The August 1936

(Confidential)

Sir

I am directed to refer to the correspondence resting with your letter No 17-1 / 35E (I.R.D.) dated the 15th July 1936 on the subject of the transfer of the Imperial Record Deptt. to New Delhi In this connection I am to invite the attention of the Govt of India to the following facts relating to the administrations of the Govt of India and of Bengal and the nature of their records.

In the earlier period of the Company's administration the term Bengal usually devoted the three Provinces of Bengal, Bihar and Orissa which were generally governed by the same Nawab As the Company's territories extended, Ceded and Conquerred Provinces, Sagor and Nerbuda Territories, Provinces of Arakan and Tenasserim etc., were gradually

added to the Bengal Presidency and administered by the Governor-General of Fort William in Bengal and his Council appointed under the India Act of 1773 who exercised the function of the Supreme and Central Govt. in India as well. The apparent reason for the supremacy of the Govt. of Bengal over all other Provinces was that the acquisition of Bengal enabled the Company to establish and consolidate the British Empire in India. Govt. of Bengal held the supreme authority until the Charter Act of 1833 vested the supreme control of the administration of India in a Governor-General and his Council in 1834. The existence of the Govt. of India as a separate body from the Govt. of Bengal therefore practically dates from 1834, and from that time separate series of consultation were started for the Govt. of India while the existing series continued for the most part to record the proceedings of the Govt. of Bengal. Inspite of this change joint Secretariat for India and Bengal lasted until the Governor-General decided in April 1843 to separate them completely leaving the latter to conduct all the details of its administration in the Depts of Revenue, Judicial and General. These details included all business connected with the administration of Civil and Criminal Justice, management of Police, Public Works of a civil description, medical and ecclesiastical administration and collection of revenue in all its branches of Land Revenue, Customs, Opium, Salt, Abkari, Post Office, Education and Internal and External Marine etc Govt. of India however retained exclusively in their own hand certain branches of administration such as Military, Foreign etc. and exercised general supervision over the departments left with the Local Govt. When the separation of the Secretariats was effected most of the early Revenue and Judicial Deptt records were left with the Govt. of Bengal while the Govt. of India took charge of the records of all other Deptts though many of them concerned the Local Govt

(2) From What has been said above it will appear that the early records of some branches of the Local Administration with which they are even now concerned are in possession of the Govt. of India. So long as the complete records were available in Calcutta though at separate places and under different control, no appreciable difficulty, from administrative point of view, was felt by the Local Govt

But as it has now been decided to transfer the Imperial Record Dept. to New Delhi it is apprehended that such transfer would cause much difficulty to Local Administrations who will have to make reference in every case to Delhi involving information in early records. This will not only cause delay in disposal of cases but also do damage to records during their transmit to and from Bengal. It will also shut up the doors of research to local students who may have earnest desire to collect materials for writing history of various subjects relating to Bengal.

(3) I am therefore to request that you will be so good as to consider, with the permission of H.E the Governor-General in Council, the desirability in view of the circumstances stated in the foregoing paragraphs, of maintaining a branch of the Imperial Record Deptt. in Calcutta with the early records of the Company's Administration particularly of the Home Deptt.—Public, Public Works Deptt., Separate Revenue and Military Board etc., which have a local interest from administrative and historical point of view and deal with affairs relating to Bengal, or in the alternative, of transferring to the Local Govt. one set of those records where a duplicate one exists either in the—of proceedings volumes or in original consultations.

I have etc.,

D.S

১৩. অক্টোবর ১৯৪৫ ও রেকর্ডরুম : কৌলীন্য বৃদ্ধি

GOVERNMENT OF BENGAL
HOME DEPARTMENT
POLITICAL

ORDER
No. 7071 P.
Calcutta, the 22nd October 1945.

Read Resolution No. 2073 A.R. dated the 29th September 1945, creating the Chief Minister's Department with effect from the 22nd October 1945 :-

Ordered that (i) The undernoted branches of the Home Department are transferred to the Chief Minister's Department with effect from the 22nd October 1945. The designation that they will assume is noted against them :

(1) The Constitution and Elections Branch will continue to be known by that name.

(2) The Appointment Branch will be known as the General Administration Branch.

(3) The Communal Ratio Office will merge into the Establishment Branch

(4) The Accommodation and Requisition Branch will form the nucleus of the Common Services Branch.

(ii) The administrative control of the—

(a) Bengali Translator, and

(b) Secretariat Record Room is transferred to the Common Services Branch of the Chief Minister's Department.

(iii) (a) The post of Cabinet Assistant.,

(b) the services of Mlv. Agha Ali Haider, and Upper Division Assistant of the Home (Political) Department, and

(c) the services of Mlv. Ahmedullah and Babu Provangshu Kumar Basu, clerks of the office of Private Secretary to the Honorable Chief Minister, are also transferred to the Chief Minister's Department.

Sd. H.S.E. Stevens
Chief Secretary to the Govt. of Bengal.

to

১৪. 'রেকর্ডরুম'-এর দপ্তর বদল : খুব জরুরি ছিল?

সংযোজন : ৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL.
HOME DEPARTMENT.
CONSTITUTION AND ELECTIONS.

ORDER.
No. 2669-A.R.

Calcutta, the 1st October, 1951.

Subject :- Transfer of the Record Room Branch from the Home Department to the Education Department.

The Hon'ble Chief Minister has been pleased to direct that the Records Branch shall cease to be a part of the Home Department and shall be attached to the Education Department of this Government.

Jt. Secy. to the Govt. of West Bengal.

No. 2669/1(32)-A.R.

Copy forwarded to the Home Political Deptt. for information and necessary action.

Jt. Secy. to the Govt. of West Bengal.

স্বাধীনতার উত্তরকালে (১৯৫১) পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় সংগ্রহালয় বা বর্তমান মহাফেজখানার নথিপত্র স্থানান্তরণের সংশোধিত সময় সারণি যা এখন অনুসরণ করা হয় না

Department.		Date of transfer to the Record Room.
(1) Education	...	1st week of April.
(2) L. & L. Revenue	...	1st " " May.
(3) Agri. For. & Fisheries	...	2nd " " "
(4) Finance	...	1st week of June.
(5) Com. & Industries	...	2nd week of June.
(6) Local Self-Government	...	1st " " July.
(7) Medical & Public Health	...	1st " " "
(8) C.C.R. & R.	...	2nd " " "
(9) Labour	...	3rd " " "
(10) Home(Poll.)	...	1st " " August.
(11) Home(Police)	...	2nd " " "
(12) Home (G.A.)	...	1st " " September.
(13) Home (Jails)	...	2nd " " "
(14) Home (Publicity)	...	3rd " " "
(15) Home (Passport)	...	4th " " "
(16) Home (C & E)	...	4th " " July.
(17) Home (Transport)	...	3rd " " June.
(18) Home (Press)	...	1st " " December.
(19) Home (C. R.)	...	2nd " " "
(20) Judicial	...	1st " " October.
(21) Legislative	...	1st " " November.

১৫. 'রেকর্ডরুম'-এর নূতন ঠিকানা

Appendix A

No...

DECISION IN CABINET

held on Thursday, the 14th June, 1956.

Education Department.

Subject:

32, Accommodation of West Bengal Record Office.

The Chief Minister placed before the Cabinet the proposals of re-organisation of Record Office i.e., proper housing of State Records and their utilisation for Research. The Cabinet accordingly approved the purchase of the premises No.6, Bhowani Dutta Lane, Calcutta, belonging to the late Suresh Chandra Majumdar, at a price not exceeding Rs. 5.7 lakhs. The actual price will be settled by negotiation with the present owners. The Record Office will accommodate the records now housed in the Secretariat Buildings. The total area occupied by these records is about 11,000 sq. ft.

The building constructed by Shri Majumdar has an area of 20,000 sq. ft. The building will, therefore, accommodate the whole of our Record office. The building which is two storied can be built up to 6 storeys. The Cabinet agreed to the proposal. It was also decided that the payment may be made in instalments. A sum not exceeding Rs. 2.5 lakhs may be paid this year.

True Copy.

Sd. S.K. Chatterjee
17.7.57.
Cabinet Secretary

Calcutta.

No.

Decision in Cabinet

held on 22nd January, 1958.

Education Department

Subject: 70. - Accommodation of West Bengal Record Office.

In modification of the Cabinet decision of the 14th June, 1956, the Cabinet directed that the property, viz. 6 Bhabani Dutta Lane, Calcutta, should be acquired through Land Acquisition proceedings at a price determined in course of such proceedings.

B C R
Chief Minister

Calcutta

The 31 January, 1958.

WGP 3748 7336B-5M

১৬. রাজ্য মহাফেজখানায় গবেষকদের তালিকা : জানুয়ারি ১৯৬১—জুলাই ১৯৬৬

	গবেষক		গবেষণার বিষয়
1	Sri N Kaviraj	..	"Social and Economic History of Bengal in the 19th Century".
2	Sri Subas Sinchan Roy	..	Administrative – Judicial History of Bengal (1793 – 1835)
3	Sm Kalpana Bishi	...	The role of Press in the Indian National movement (1883 – 1904)
4	Sri Arun Kumar Majumdar	...	"Relation of East India Company and Bhutan 1765 – 1865"
5	Sri Amiya Kumar Roy	.	"Indian History – Indian National Movement (1905 – 1930)
6	Sri Keshab Chandra Chowdhury	..	Municipal administration and its development in Calcutta
7.	Sri Panchanan Saha	. .	Indentured Labour 1835 – 1900
8	Sri Arun Commer Bose	...	India's fight for freedom abroad – 1900 – 1920
9	Sri Ved Prakash	..	"The Sikhs in Bihar"
10	Sm. Sujata Ghosh	...	"The growth of political consciousness in India from 1858 – 1885"
11.	Mr. Warren – Mr. M. Gunderson	.	"Intellectual History of Bengal in the 19th Century"
12	Sri David Kopf	. .	"Fort William College and the origin of the Bengal Renaissance 1800 – 1830"
13.	Sri V.G. Bidkar	.	"India's relations with Tibet from 1870 – 1900
14.	Sm. Sujata Roy Chowdhury	...	"Public opinion in Bengal 1830 – 1870"
15.	Sri R. Collier	...	"Mutiny of 1857"
16.	Sri Benode Sankar Das	..	"British rule in Jungle Mahals (1761 – 1803)
17.	Sri N. L. Basak	...	"History of Vernacular Education in Bengal 1757 – 1947"
18.	Sri Dilip Kumar Chattopadhyay	...	"Anglo Burdwan relations in the early period of Company's rule in Bengal"
19.	Sri Pradip Sinha	...	"Social History of Bengal in the 19th Century"

গবেষক		গবেষণার বিষয়
20. Sri Dilip Kumar Basu	...	"Indo Chinese Trade Relations in the 19th Century"
21 Sri C.A.Martin, Hony, Secretary, Armenian Association, 5, Outram Street, Calcutta	...	"Publication of a complete history of Armenians in India from the earliest times – East India Moghul period up-to-date
22. Sri Amalendu Bikash Sen	...	Administration of Civil and Criminal Justice (1861–1900)
23. Sri Sanat Kumar Bose	...	The origin and history of subordinate Services in Bengal during the period 1830–'60
24 Sri Amulya Ratan Chakraborti	...	Administrative History of West Bengal since 1857
25 Sri Hossainur Rahaman	..	"Hindu Moslem Relations 1900–1947"
26. Sri Ramesh Chandra Mitra	...	Education in Bengal in the 19th Century
27 Sri Amar Nath Datta	...	19th Century–Rammohan, Dwarakanath, Young Bengal
28. Sri Sarju Mahato	...	"The role of Christian Missions in Chotanagpur since 1945 A.D.
29 Dr. H. R. Ghosal	..	The East India Company's Commercial Recedencies in the Bengal Presidency (1784–1834)
30. Sri R M. Lahiri	..	"Law & Order in Bengal"
31. Sri V. N. Dutta	..	"Sutte (1800–1835)"
32. Sri Nishanka Ghosh	.	"The impact of Bengal Renaissance on contemporary Educational Thought'
33. Sri Sisir Ranjan Saha	...	Evolution of Police Administration in Bengal
34 Sri Sabya Sachi Bhattacharjee	...	Financial Policy of the Government of India (1858–1880)
35 Sri S. K. Majumdar	..	The History of Modern Bengal
36. Sri P. Kumar	...	Administrative history of Chotanagpur 1767–1919
37. Sri Angshuman Mukherjee	...	The Opium trade in India in the 19th Century
38. Sri Nalini Ranjan Mitra	..	Freedom movement in Bengal
39. Mr. Frits Lehmann	...	Social and Intellectual conditions in Behar during the 18th Century

গবেষক		গবেষণার বিষয়
40. George D. Bearce	...	The culture of India in transition 1739–1800
41. Sri Kirti Nath Chaudhuri	...	India's foreign trade 1828–1860
42. Dr B Sasmal	..	The political history of India
43 Sm. Banee Sarkar	...	Some Aspects of Bengal Renaissance
44 Sri Sadhan Bhattacharjee	..	The evolution of boundaries of Uttar Pradesh
45. Sri S. P. Sinha	...	History of Cheros of Palamou
46 Dr. John R McLane	..	Agraian History of 18th & 19th Century, Bengal
47 Dr P. J. Marshall	...	The Servants of the East India Co in the 18th Century
48 Sri S. P. De	.	The Problem of labour in Assam in the 19th Century
49 Dr. C. B Tripathi	.	Indo-American Trade Relations, 1784-1833
50 Sri Phanindra Nath Banerjee	.	The Evolution of Law & Justice in Bengal (from W Hastings to Cornwallis)
51. Dr Blair B Kling	..	Dwarkanath Tagore, 1795–1846
52 Dr. V.C.P Choudhury	..	Comprehensive History of Bihar (Under the auspices of the K P Jayaswal Research Institute, Patna)
53 Sri Naresh Kumar Arora		English Trade in Bengal, 1783–1833
54 Shri Shyamananda Banerjee	.	The first sedition case against the Bangabasi, 1891
55 Shir Brahmananda Pratap Barua		British Relations with Chittagong Hilltracts & Hill Tippera, 1801–1900
56 Shri Santosh Kumar Chakraborty		The District of Burdwan (Socio-Econ in the 19th Century)
57 Miss Manju Gupta	..	Society & Politics in Bengal, 1857–1885
58 Shri Goutam Chattopadhyay	..	Middle class awakening in Bengal in the 19th Century
59 Shri Krishna Lal Basu	..	Rural Self Govt. in West Bengal
60 Shri Santimoy Roy	...	Freedom Movement in India

গবেষক		গবেষণার বিষয়
61 Mrs. E Lutzker		Dr W.M. Haffkine, the eminent bacteriologist
62. Shri Sadananda Choudhury	..	The Salt Policy of the British in Orissa
63 Shri Nagendra Mohan Prosad Srivastava	...	Influence of International event on the growth
64 Dr. (Mrs) Hamida Khatun Nagvi	..	Social & Economic condition of Oudh, 1775–1850
65 Shri Asit Kabi	.	Socio-Economic & Cultural conditions of 19th & 20th Centuries
66 Shri Deb Kumar Chakraborty		Manbhum under E.I. Co.
67 Shri Naranarayan Das	.	The Social history of Bengal in the 19th Century
68. Dr Panchanand Mishra	..	Indo-American Trade Relations in the 19th Century
69. Shri Lalit Kr. Bhattacharjee		Political History of the Hazaribagh District during the E I Co from 1765–1858
70 Shri Saktibrata Ghosh	.	William Carry, His literary activities & associates

গবেষকদের তালিকা : ১৯৭৭—১৯৮০

	গবেষক	গবেষণার বিষয়
1.	Ahmed, Smt Jahida	Education and Society in Bengal 1920–1935
2.	Angami, Mr R	Nagaland
3	Ahmed, Mr. Wakil	Nineteenth-Century Bengali Literature.
*4.	Arnold, Mr D. J	Poor Europeans in India, 1750–1947.
5	Bagchi, Smt Bandana	Land System and Agrarian Relation in Dinajpore, 1772–1888.
.	Bandyopadhyay, Smt Anjana	Netaji's Socio-Political Philosophy.
	Banerjee, Shri Debabrata	Aspects of Agrarian Legislation in 19th Century Bengal
8.	Banerjee, Shri Dhiraj	Land Reform Problem, 1885–1910
9	Bandyopadhyay, Shri Durga	Subhas Chandra Bose
10.	Bandyopadhyay, Smt. Gitasree	Gandhi and Bengal Politics, 1929–41
11.	Bandyopadhyay, Shri Himendu Sekhar	Agricultural Marketing in Bengal during the second half of the 19th Century.
12	Bandyopadhyay, Shri Matisa	Nagaland and Nagas, 1832–1947
13	Bandyopadhyay, Smt Naraya	Outcast Calcutta . A History of Mass Labourers in Calcutta, 1870-1930
14	Bandyopadhyay, Shri Raghabendra	Dacca 1760–1840
15	Banerjee, Shri Ramaprasad	History of the Revolutionary Movement in Bengal, 1900–1946
16.	Banerjee, Smt. Rita	Economic Policy of Government of Bengal, 1872–84
17	Banerjee, Shri Sekhar	Rural Society of Bengal Study of Some West Bengal

	Villages, 1872–1921.
18. Banerjee Shri Sunil Kumar	Biography of the Late Harinath Dey.
19. Bandyopadhyay, Smt. Tapati	Role of Hindu Nobility at the Darbar of Bengal Nawabs, 1756–65.
20. Banerjee, Dr. Tarasankar	Trade and Commerce in Assam
21. Barui, Dr. Balai Chandra	Opium, Indigo and Salt Trade in the 19th Century.
22. Basistha, Shri Premangsu	Political and Economic Development in Bengal and Burma during the 19th and 20th Centuries.
23. Baistha, Shri Soumendra	Trade Relations between India and Nepal
24. Bose, Shri Amit	Role of Workers and Peasantry in Bengal, 1925–34
25 Basu, Shri Basabendra	The Municipal History of Calcutta in the 19th and 20th Centuries
26. Basu, shri Biplab	Compilation of a Source Book of Trade Union Movement in India, 1918–47.
27 Basu, Shri dipak Kumar	Calcutta Improvement Trust
28. Basu, Smt. Dipika	National Movement in Bengal, 1885–1935
29 Basu, Smt Hena	Class, Caste and Politics in Calcutta, 1800–1870
30 Basu, Shri Manindralal	The Sannyasi and Fakir Movememnt in North Bengal, 1763–93.
31. Bose, Shri Mihir Kumar	Subhas Chandra Bose
32. Basu, Shri Mridulkanti	Life and Times of Bankim Chandra.
33. Basu, Shri Nirban	Working-Class Movement in Eastern India, 1937-47
34. Basu Shri Pankaj Kumar	Postal System during the days of East India Company.
35. Basu, Shri S. K.	Sepoy Mutiny in Assam

36.	Basu, Shri Sobhan	Social and Cultural History of Bengal during British Rule.
37.	Bose, Shri Soumendra	Rabindranath Tagore.
*38.	Bose, Shri Sugato	Agrarian Society and Politics in Bengal, 1885–1953.
39.	Basu, Shri Sujit	West Bengal Public Policies and their Implementations, 1947–55.
40.	Basu Roy, Shri Jayanta	Land Tenure System prior to the Abolition of Zamindari System.
*41	Berwick, Mr John P.	Student and Bengali Society, 1880–1922.
42.	Bhadra, Shri Gautam	Some Socio-Economic Aspects of the Town of Murshidabad, 1760–1830.
43.	Bhattacharya, Smt. Anima	Compilation of Population Estimates in the Earlier Decades of the 19th Century.
44	Bhattacharya, Smt. Archana	Economic History of India
45	Bhattacharya, Shri Banikanto	Modernisation of Tripura Administration, 1863–1972
46	Bhattacharya, Shri Chandi Charan	Netaji Subhas Bose.
47	Bhattacharya, Shri Dipankar	Peasant Unrest in Bengal and Bihar 1937–47.
48.	Bhattacharya, Shri Jayanta Kumar	Late 19th Century Agricultural Condition in India
49	Bhattacharya, Shri Panchugopal	Social Impact of Administration, 1900–1947.
50.	Bhattacharya, Shri Provat Kumar	Proscribed Literature/Drama during the British Regime.
51.	Bhattacharya, Shri Prabir Kumar	Labour Movement in Bengal, 1929–47.
52	Bhattacharya, Shri Sukumar	Bengal Land Law and Rent Act of 1859.
53	Bhattacharya, Smt. Sudakshina	Boom and depression in the Internal Economy of Bengal and their Effects on Internal Economy

54. Bhowmik, Shri Saroj Kumar	Rural Policy in Bengal, 1792–1816.
55. Biswas, Smt. Kalpana	Protest Drama in a Colonial Country.
56. Biswas, Shri Sunil Baran	The Doctrine of Resistance in Indian Political Movement up to 1910.
57. Brahma, Shri Sujit Kumar	Maharaja Birchandra Manikya and His Times, 1862–1896.
58. Cassels, Miss Nancy, G.	Collection of Pilgrim Tax at Jagannath Temple in Orissa, 1806–41.
59. Chakraborty, Shri Amalendu	Bengal Muslims in the 19th Century.
60. Chakraborty, Shri Animesh	Bengal Provincial Civil Service, 1833–1905
61. Chakraborty, Shri Asimpada	Analysis of the Role of Performance of Mahamedan Legislators of Bengal, 1905–47.
62 Chakraborty, Shri Asok	Presidency Bank and the Imperial Bank.
63 Chakraborty, Shri B. C.	British Relation with the Hill Tribes of Assam.
64 Chakraborty, Shri Bhaskar	Local Roots of Indian Politics in Bengal
65 Chakraborty, Smt. Chhanda	State of Education in the 19th Century, in Certain Districts of Bengal
66 Chakraborty, Shri Dipesh	Labour Relation in Bengal, 1870–1928
67 Chakraborty, Smt. Malabika	Bengal Famines, 1896–1897
68. Chakraborty, Shri Nipendranath	Freedom Movement in India and Baghajatin's Role.
69 Chakraborty, Smt. Papia	Concept of Progress · A dichotomy in 19th Century Bengal.
70 Chakraborty, Shri Prabir Kumar	Bengal Famine
71 Chakraborty, Smt. Rama	Administrative History of Burma, 1886–1947

72.	Chakraborty, Shri Shyamal	Railways and Economy of Bengal, 1854–1900.
73.	Chakraborty, Shri Tridib Kumar	Regional Identity and Disparity Growth.
74.	Chanda, Shri Bhaskar	Santhal Revolt.
75.	Chanda, Shri Pulak Ranjan	Poet Gobinda Chandra Das and His Times.
76.	Chanda, Shri M. K.	Muslim Education and Press in the First Half of the 19th Century.
77	Chattopadhyay, Shri Asok	Bengal Tenancy Laws, 1859–1885.
78.	Chatterjee, Shri Atri Kumar	Crimanal Justice in the 19th Century.
79.	Chatterjee, Shri Basudev	Rural Crime and Social Change in Bengal, 1770–1868.
80.	Chattopadhyay, Smt. Chhanda	British Land Policy in North India, 1858–68.
81.	Chatterjee, Dr. Haraprasad	Indians in Ceylon.
82.	Chattopadhyay, Shri Kanai Lal	Brahmo Reform Movement 1838–83
83	Chattopadhyay, Smt. Nilanjana	Medical History, 1906–47.
84.	Chatterjee, Shri Partha	Nationalism in Bengal in the 20th Century
85	Chatterjee, Shri Rakhahari	C R Das and the Indian Labour Movement.
86	Chatterjee, Smt Ruma	De-industrialisation in Eastern India.
87	Chattopadhyay, Shri Subrata	Police Criminal Justice in Bengal, 1854–1913
88	Chattopadhyay, Shri Suman	Police Criminal Justice in Bengal, 1854–1913
89	Chatterjee, Shri Suranjan	Genesis of an Industrial Labour Force in Eastern India, 1800–1850
90.	Chowdhury, Smt Amita	Political Ideas of Subhas Bose.
91.	Chowdhury, Dr Benoy Bhusan	Peasant Economy
92	Chowdhury, Shri Debaprasad	Economic History of Northern Region of India
93.	Chowdhury, Smt. Gopa	A study of the Social Reform

		Movement in Bengal, 1820–1937
94	Chowdhury, Shri Nanigopal	Revenue Policies of the East India Company.
95.	Chowdhury, Shri Pradipta Kumar	Economic History of Orissa, 19th and early 20th Centuries.
96.	Chowdhury, Shri Sibdas	Asiatic Society and the Beginning of Research and Investigation of Scientific Lines in India.
97	Chowdhury, Shri Vijay Chandra	The Sources of History of Modern Bihar and Prasad Bihar Aristocracy.
*98	Commander, Mr Simon	The Social and Economic Structures of North India, 1782–1820.
99	Coomar, Smt. Anita	Derozio and His Disciples, 1825–40
*100	Cooper, Miss Adrienne	Share Croppers and Share Cropping Movement in Bengal, 1930–40.
101	Das, Shri Amal Kumar	The Bengal Muffussil Towns in the Second Half of the 19th Century.
102	Das, Shri Arunendra	Shri Aurobindo and Freedom Struggle with Special Reference to War and Post-War Development, 1939–46
103.	Das, Shri Baishnav Chandra	Land Reforms in Orissa, 1950–75
104	Das, Shri Basanta	Freedom Movement in Midnapore
105	Das, Shri Bibhuti	Freedom Movement in Midnapore.
106	Das, Prof Binod Sankar	Economic History of Orissa
107	Das, Shri Bishnupada	Some Aspects of Socio-Economic Changes in South West Bengal, 1751–1805
108	Das, Shri Gopinath	Cyclones and Related Natural Calamities of the East Coast of India.
109	Das, Shri Narendranath	Freedom Movement in

		Midnapore.'
110.	Das, Shri Rabindra Kumar	Orissa under British Rule in the 19th Century.
111.	Das, Shri Sudip	Indian Ideals of Secularism
112	Das, Shri Sunil Kumar	Socio-Political Movements in India, 1900–1947.
113	Das, Shri Suranjan	Agitational Politics in Calcutta, 1905–17
114	Das, Shri Ujjal Kanti	Social Changes in South-West Bengal
115 .	Dasgupta, Shri Abijit Sankar	Changing Pattern of Stratification and Economic Organis ation.
116.	Dasgupta, Shri Ajit Kumar	The Home Rule Movement, 1911–21
117	Dasgupta, Shri Atishranjan	Hindu-Muslim Relationship in 18th-Century
118.	Dasgupta, Shri Bhaskar	Damodar Canal Tax Movement and Political Development in Burdwan
119	Dasgupta, Smt Chhaya	Growth of Radical Ideas in Bengal.
120	Dasgupta, Shri Kalyan Kumar	J M. Sengupta and Indian Politics, 1919–33.
121	Dasgupta, Smt. Nanda	Administration of Bengal under the First Lt. Governor.
122.	Dasgupta, Shri Ratan	Genesis of Industrial Working Classes in Eastern India, 1800–1850
123.	Dasgupta, Shri Ranajit	Development of Industrial Labour Force, in India, 1850–1947.
124.	Dasgupta, Smt Sandhya	Compilation of Population Estimates for Early 19th Century.
125.	Dasgupta, Shri Swapan	Midnapore, 1907–34.
126.	Deb, Smt. Jhunu	The Port of Calcutta, 1775–1883.
127	Dutta, Shri Abhijit	Bengal Revolt : Titumir—A case study.
128	Dutta, Shri Amarnath	Young Bengal, 1830–1850
129.	Dutta, Shri Debaprasad	Vernacular Education, 1854–1995.
130	Dutta, Smt. Chhaya	Subhas Chandra Bose.

131.	Dutta, Smt. Jharna	Social Changes in Cachar.
132.	Dutta, Smt. Kasturi	Indian National Movement.
133.	Dutta, Prof. P N.	Impact of the West on the Khasis and Syntags.
134.	Dutta, Shri Rajat Kumar	Nature and Structure of Peasant Economy in Bengal, 1757–1793.
135.	Dutta, Shri Utpal	Regional Identity and Disparity of Growth.
136.	Dutta Roy, Dr. B.	Economic Foundation of the British Annexation of the Khasi and Jayanti Hills.
137.	Dev Roy, Smt. Rama	Compilation of Population Estimates of the Earlier Decades of the 19th Century.
138.	Dey, Shri Krishnaprasad	British Capitalism and Rice Trade in Bengal, 1850–1900.
139.	Dharmapal, Shri	Revenue and Judicial Aspects of India, 1750–1860.
*140.	Duikar, Mr. Edward	Naxalite Movement in West Bengal, 1967–71. N
*141.	F isch, Mr. George	Bengal Criminal Courts of Circuit, 1790–1830.
*142.	Fonseca, Rev. C.	Partition of Bengal, 1904–1907.
*143.	Gabriel, Miss. Ruth	Interaction Between Hindu Pandits and British Orientalists.
144.	Gambhir, Shri Surendra	Emigration of Indian Labour to British Guyana I.
*145.	Gammal, Mrs. Carmel	Politics in Bengal, 1937–47.
146.	Gangopadhyay, Smt. Asha	Life of Pandit Rajendralal Vidyabhusan, 1903–25.
147.	Ganguli, Smt. Indrani	History of Burdwan, 1872–1939.
148.	Ganguli, Dr. Nisith	Sir Charles Tegart, 1901–32.
149.	Ghatak, Smt. Maitreyi	Agrarian structure : Tension Movement and Peasant Organisation in Bengal.
150.	Ghatak, Smt. Tapati	Emigration of Indian Indentured Labour into Mauritius.

151.	Ghosh, Shri Amitava	Advent of Steam Power in India
152.	Ghosh, Ananda Gopal	Origin and Development of British Administration in Maldah since 1813.
153.	Ghosh, Dr. (Smt) Anjali	Agrarian Relation and Migration from Bengali to Burma in the 19th and 20th Centuries.
154.	Ghosh, Smt. Basanti	Desopran Sasmal and His Times
155	Ghosh, Shri Parimal	Emergence of an Industrial Labour Force in Bengal, 1855–1930.
156.	Ghosh, Shri Prabir	Economics.
157	Ghosh, Smt Satyabati	Administration of Bengal in the Time of Sir Richard Temple, 1874–77.
158.	Ghosh, Smt. Tridib	Collection of materials on Netaji Subhas Bose and S. C Bose.
159.	Ghosh, Shri Sarbari Kumar	Comparative Study in Educational Experiments in Bengal and Bombay, 1813–53
160.	Ghosal, Shri Tulsi Charan	Indian Educational policy during the Rule of the East India Company.
*161.	Gordon, Mr. Leonard	Nationalism in India, 1920–47.
162.	Goswami, Smt. N.	Lease and sale Deeds of Forest Lands around Shillong
163 .	Goswami, Shri Shrutidev	Aspects of Revenue Administration in Assam, 1826–74.
*164.	Greenough, Dr. Paul	Native and European Attempts to Eradicate Small-pox in Bengal.
165.	Grover, Prof. B. R	Pre-British Mughal Sanads.
*166.	Gourley, Mr. Stephen Nicholas.	Emergence and Development of Modern Work force in Bengal, 1860–1923.

167.	Guha, Shri Nikhilesh	Adoption problem and British Imperialism in Mysore.
168.	Guha, Dr. Ranajit	Social and Economic History of Bengal.
169.	Guha, Smt. Shivani	Sarat Chandra Bose and Struggle for National Revolution.
170.	Gupta, Shri Amit Kumar	Political Mobilisation, Social Structure and Changes.
171.	Gupta, Dr. Hiralal	Revenue System and Administration of Saugar and Narmoda Territories.
172.	Gupta, Smt. Ranita	Orissa in the 19th Century.
173.	Haldar, Shri Pareshnath	Surendra Nath Banerjee and His Times.
*174.	Hees, Mr. Peter	Sri Aurobindo.
*175.	Hill, Mr. Gohn L	Administration and Politics of A. P. Macdonell (1865–1908).
*176.	Hill, Mrs. K. Roy	The Canadian Image in India.
177.	Hore, Shri Amiya Kanti	Sir John Peter Grant.
178.	Hossain, Md. Ibadat	British Rule in the Bengal Province and Peasant Problem
179	Hota, Shri Dibyendubikash	Revolt of Titumir.
180.	Jacob, Dr H. K. S.	Relation Between India and South-East Asia in the Second Half of the 18th and First Half of the 19th Centuries.
181	Jadav, Shri Kamalesh Sing	Judical administration in the Benaras Region, 1775–861.
182.	Jagga, Shri Lajpat	The Labour Movement in the Railways, 1919–37.
183.	Jha, Shri Pranab Kumar	Social and Economic History of Sikkim
184.	Jha, Shri Sailendranath	The Gurkhas of Nepal and the British Indian Army. 1814–1947.
185.	Jit, Shri Nabin Kumar	Peasant Movement in Orissa, 1803–95.

186.	Kanjilal, Smt. Anuradha	Changing River Courses of West Bengal.
187	Kar, Shri Sisır Kumar	Proscribed Bengali Literature.
188.	Kaviraj, Shri Naraharı	Social and Economic History of Bengal in the 19th Century
*189.	Kawai, Mr. Akinobu	Bengal Zamindars, 1785–1941.
190.	Kejriwal, Mr, O. P	Asıatic Society of Bengal, 1784–1883
*191.	Kenna, Mr. Chrıstopher	Bandıtry and Thuggy ın North India in the 18th and 19th Centuries.
192.	Khan Amanul Hoque	Political Ideas and Actions of A.K. Fazlul Huq.
*193.	Kowjlowski, Mr Gregory C	Public and Publıc Endowments in Indian Society, 1858–1919.
194	Koyal, Shrı Sıvaji Sundar	Tribal History, 1830–1900.
195.	Kumar, Shri Arup	Famines and Reliefs in Chotanagpur, 1886–1967.
196.	Kumar, Shri Pabitra	Netajı Subhas Bose
197.	Kundu, Shri Ashok Kumar	Bankim Chandra Chatterjee, 1850–1900.
198.	Kundu, Shri Sakti Kumar	Growth of Urban Conglomeration in West Bengal.
199.	Lal, Mr. Rımawia	Administrative History of Lushai Hills, 1890–1947.
200.	Lal, Shri Briju	Migration and Social Changes in U. P., 1870–1920.
201.	Lal, Shri Joychandra	Wages and Prices in West Bengal Presıdency durıng Early British Period, 1773–1883.
202.	Lahiri, Smt. Krishna	Education of Women in Bengal, 1849–82.
203.	Lahiri, Shri Pradıp	Political Thoughts of the Muslims of Bengal, 1818–1947.

204.	Lahiri, Shri Pratap Sankar	Mass Movements in Bengal, 1927–42.
205.	Lyndah, Mr. L. G.	Collection of Materials for Meghalaya.
206.	Muhammad, Mr. Abhas	Development of Urdu Journalism in Bengal.
207.	Mahanti, Smt. Bidyut	Economic History of Orissa in the 19th Century.
208.	Mahapatra, Smt. Digambari	Impact of British Administration on the Tribals of Keonjhar, 1800–1909.
209.	Mahapatra, Shri Madanmohan	Changing Society in Tribal Tract, 1859–97.
210.	Mohiuddin Sheikh, Mr. Muhammad	Modern Orissa.
211.	Maitra Dr. Suresh Chandra	Bengal, 1801–56.
212.	Maiti, Shri Nanigopal	Agararian Society of Midnapore, 1762–93.
213.	Mazumdar, Shri Asok Kumar	Political Parties and Tebhagha Movement in Bengal.
214.	Mazumdar, Shri Debabrata	Revolutionary Tension in Bengal, 1920–37.
215.	Mazumdar Dr Niharkana	Bengal, 1921–37.
216.	Mazumdar, Shri Pradip Kumar.	Trade and Economy of Bengal from 1720 to 1835.
217.	Mazumdar, Shri Sachindra Nath	Christianity in Nadia District, 1831–62.
218.	Mazumdar, Smt. Sweta	Regional Identity and Disparity of Growth.
219.	Mazumdar, Smt. Swagata	History of Banking.
220.	Mallik, Shri Satcori	Political History of Bengal, 1912–25
221.	Mallik, Shri Samar	Millennium Movement among Santhals, 1855–1990.
222.	Mallik, Shri Samar	Revenue History of Bengal.
*223	Malley, Mr. Edward Allan	Agrarian Relation in West Bengal (1839–1947) : Change and Stability.
224.	Mandal, Smt. Archana	Sir George Campbell's Administration in Bengal.
225,	Mandal, Shri Rampada	Economic in the District of Bankura 1765–1887.

226.	Mandal, Shri S. K	Crime, Corruption and Criminal Justice in Bengal, 1797–1834.
227.	Misra, Shri Lakshi Sankar	History of Administration of Gorakhpur, 1801–56.
228.	Mishra, Mrs. Puspalata	Public Utility work in Chotanagpur during the East India Company's Rule.
229.	Mishra Shri Ramdev	Development of Transport and Communication in Bihar during the 18th and 19th Centuries.
230.	Mitra, Smt. Basanti	Swadeshi Movement.
231 .	Mitra, Dr. Devendra Bijoy	Decline of Cotton Industry in Bengal, 1757–1840.
232.	Mitra, Dilip Kumar	Life and Achievements of Ray Ram Brahma Sanyal Bahadur
233 .	Mitra, Shri Hitendra Mohan	Cultural History of Bengal in the 19th Century.
234	Mitra, Smt. Ira	Bengal Politics, 1937–47.
235.	Mitra, Smt. Manasi	Agrarian Society in Bihar. Continuity and Change, 1787–1840.
236.	Mitra, Smt. Monjusree	Rabindranath and Bengal Renaissance.
237.	Mitra, Shri Sugata	District Administration of Bengal, 1786–1837.
238.	Mitra, Shri Udayan	Bengali Middle Class Rise and Development, 1800–1850.
239,	Mukhia, Mr. Naranath	Indo-Nepalese Frontier in the 19th Century.
240.	Mukhopadhyay, Shri Ajoy Kumar	Social Change in Bengal in the Second Half of the 19th Century.
241.	Mukhopadhyay, Shri Alok	History of Howrah from the early 19th Century.
242.	Mukhopadhyay, Shri Ambarish	Labour Movement in India.
243.	Mukhopadhyay, Shri Anish	Growth and Stagnation of Silk Industry in the Maldah Region.
244.	Mukhopadhyay, Shri Anshuman	Studies in the History of Oudh, 1765–1856.

245.	Mukhopadhyay, Shri Apurba	Problems and Prospects of Education in Barasat. Sub-Division as a Sample for Rural West Bengal in the 19th and 20th Centuries.
246.	Mukhopadhyay, Shri D	The Role of Deputy Commissioner in British Administration : A Case study of Khasi Hills.
247.	Mukhopadhyay, Smt. Enakshi	The Bengal Economy, 1757–1813.
248.	Mukhopadhyay, Shri Gopal	Fluctuation in the External Trade of Bengal and Their Impact on the Economy, 1793–1818.
249.	Mukherjee, Shri Gourchandra	Nineteenth-Century Renaissance in Bengal and its Influence on Indian Education.
250.	Mukherjee, Shri Jiban	The Role of Bengali Women in the Freedom Movement of India, 1885–1947.
251.	Mukherjee, Smt. Manashi	History of the Revolutionary Movement in U. P. 1915–1931.
252.	Mukherjee, Shri Manjugopal	Indian National Movement, 1918–1930.
253.	Mukherjee, Smt Mukul	Aspects Agrarian Changes in Bengal in the 19th Century.
254.	Mukherjee, Shri Narayan	Growth of Education in Bengal Between 1920–1947.
255.	Mukherjee, Shri Pratap Chandra	Bengali Literature during Partition of Bengal.
256.	Mukherjee, Shri Rathis	Bengali Legislative Council : Growth and Working 1862–1920.
257.	Mukherjee, Shri Sadhan Kumar	The Indian Career of C. E. Trevelyan.
258.	Mukherjee, Dr. Saugata	Agriculture and Capital Formation in the Eastern Region, 1900–1950.
259.	Mukhopadhyay, Shri Subodh	Social and Political History of Bengal in the First half of the 19th Century.

260.	Mukhopadhyay, Shri Tarun	The Peasant Economy of Orissa, 1803–66
261.	Mustafi, Shri Asok Kumar	Thomas Paine and India
262.	Nag Shri Ajit Kumar	Role of Khulna People in India's Fight for Freedom
263.	Nag, Shri Bijoy Kumar	Sarat Chandra Basu and Struggle for National Revolution.
264.	Nag, Shri Ramendranarayan	Indian Administration, 1920–47.
*265.	Nariaki, Mr. Nakazato	Agricultural History of Bengal, 1885–1905.
266.	Padhy, Shri Subhas Chandra	British Relation with Chiefs and Rajas of Orissa.
267	Phari, Shri Gopal Kumar	Development of Modernity in Howrah—A Local Renaissance study, 1901–47
268	Paul, Shri Pradip Kumar	Political Thoughts of the Muslims of Bengal, 1818–1947.
269	Paul, Shri Prosanta	Life and Works of Rabindranath Tagore.
270	Paul, Shri Susantaranjan	C. F. Andrews and Subhas Chandra Bose 1920–38.
271	Paul, Smt Tirtha	Bengal under the First Two Lt Governors
272.	Panda, Shri Barid Baran	Studies in the Socio-Economic History of South-West Bengal Presidency in the 19th Century.
273	Panda, Shri Chittaranjan	Agrarian Structure of Midnapore, 1900–47
274	Panda, Smt. Dipti	Trade and Commerce in the Orissa Ports, 1866–1900.
275	Panda, Shri Haris Chandra	British Policy towards the Orissan Princely States during the First Half of the 19th Century
276.	Paramanik, Shri Nemai	Gandhi and the Indian Revolutionaries.
277.	Pati, Shri Biswaranjan	Colonialism and Rise of Nationalism · A Case Study of Orissa, 1930–35

278.	Patnaik, Shri Jaganath	The Feudatory States of Orissa under British Rule.
279.	Patnaik, Shri Santanu Kumar	Social Change in 19th Century Orissa.
280.	Patra, Shri Narahari	Agricultural Settlement in North Bengal in the 19th Century.
281.	Paty, Shri Chittaranjan	History of Seraikella and Kharswan, 1707–1957.
*282.	Phillips, Mr. Newman	Settlement of Land in and around Shillong as well as relevant documents relating to Meghalaya.
283.	Pradhan, Shri K. H.	History of British Residency in Nepal 1829–43.
284.	Prajapati, Shri S. L.	Revenue Administration of Assm, 1826–38.
*285.	Prindle, Mr. Carol	East Bengal Districts from post-Mutiny to pre-Partition year.
286	Purakait, Shri Biswaranjan	Elementary Education, 1919–47
287.	Purakait, Shri Mihirranjan	Social and Political Thought of Bankim Chandra.
288.	Ramsarma, Shri Tulsi	Revolutionary, Movements in Eastern U. P and Bihar, 1906–31.
289.	Rath, Shri Bijoy Chandra	Peasant Unrest in the Princely States of Orissa, 1937–48.
290	Raut, Shri, Sanjib Kumar	Economy and Class Structure of the Politics of Provincialism and Nationalism in Modern Orissa.
291.	Ray, Shri, Abhikranjan	Presidency Bank and Imperial Bank.
292.	Ray, Shri Ashis Kumar	Political Development in Eastern Bengal and Burma since 1870.
293.	Ray, Shri, Ashok	Agrarian History of Assam.
294.	Ray, Smt. Bina	Estimate of National Income and Capital formation in India, 1850–1900.

295.	Ray, Shri, Gopal Chandra	Bankim Chandra.
296.	Roy, Dr. Jayanta Kumar	Indian Administration, 1920–47.
297.	Roy, Smt. Kabita	Public Health in Bengal, 1921–47.
298.	Roy, Shri Mukul	Economic and Social Development in West Bengal, 1850–1950.
299.	Roy, Shri Prodyot Kumar	Dewan. Ramcamul Sen, 1783–1844.
300.	Roychowdhuri, Ladlimohun	Indian Judicial System during 1772-1833.
*301.	Reid, Mr. John	Service Records of Certain Military Officers.
*302.	Rule, Mrs. Paulin	Crime and Society in Calcutta, 1860–1940.
303.	Rymbaim Shri R. T.	Biography of King Naugbase.
304.	Saha, Dr. Panchanan	Compilation of source Book on Indian Trade Union Movement.
305.	Saha, Shri Prabhat Kumar	Some Aspects of Malla Rule In Bishnupur, 1596–1806
306.	Saha, Smt. Rubi	Land Revenue Policy, 1885–1920.
307	Sahay, Shri K. N.	Iron and Steel Industry in Chotonagpur · A Study of the Development Problem.
308	Sahgal. Smt. Gita	Politics in Bengal, 1905–35.
309	Sahu, Shri Murali	A Survey of the Political, Social and Economic History of Kolhan.
310	Samad, Md. Abdus	Burdwan Raj
311.	Sammadar, Shri Ranjit Kumar	Local Revolts of Bengal.
312	Santra, Shri Manas	Land Revenue Administration in Birbhum, 1765–1858.
313.	Sanyal, Smt. Aparna	Bengal Politics with Special Reference to Terrorism, 1920–40.
314	Sanyal, Shri Dilip	Bengal Agriculture, an Ecological study.
315.	Sarkar, Smt. Aparna	Subhas Chandra Bose

316	Sarkar, Smt. Arati	Economic History of Burma, 1817–1949.
317	Sarkar, Shri Chandi Prasad	Bengal Muslims, 1916–37
318.	Sarkar, Shri Krishna Kanto	Peasants, Political Action in 24 Parganas.
319.	Sarkar, Shri M. K.	Bagha Jatin.
320.	Sarkar, Smt Rima	Medical History of Bengal, 1875–1947.
321.	Sarkar, Dr. Sumit	Social Bases and Nature of Gandhian Nationalism.
322.	Sarkar, Smt Tanika	Politics and Society in Bengal, 1927–37.
*323.	Sato, Mr. Hiroshi	Economic and Social History of Bengal, 1920–47.
324.	Sen. Shri Amit Jyoti	Evolution of Colonial Education Policy.
325.	Sen. Prof. Asok	Economy and Policy of Bengal in the 18th Century.
326.	Sen. Shri Partha Sarathi	Social Base and Ideology of Revolutionary Terrorism in Bengal 1905–35.
327.	Sen Shri Ranajit Kumar	Bengal Zamindars in the 18th Century.
328	Sen. Smt Ratnasree	Growth of a Landed Middle Class in Bengal and their Role in Politics, 1850–1900
329	Sen Shri Suchibrato	History of the Santhals and Agrarian Condition of the Jungle Mahal.
330	Sen. Smt. Shiela	Gandhi and Problem of Minority in Indian Politics.
331.	Sen. Shri Sukomal	Working Class Movement in India.
332	Sen Smt. Swapna	Indo-Bhutan Trade, 1865–1910
333	Sengupta, Smt. Devjani	Peasant Movement in West Bengal, 1936–69.
334.	Sengupta, Sm. Gunja	Sugar Industry · Its Growth in Eastern India, 1830–1930
335	Sen Roy, Shri Bikash Kumar	Nepalese in India in the late 19th Century.
336.	Sen Sarma, Shri Sunil Behari	History of Irigation, Drainage Control and Associated Subjects.

337.	Sharma, Shri Girija Sankar	Growth and Development of a Business Community in Bikaner.
338	Sharma, Prof. Manju	History of Lac Industry from the Middle of the 18th Century.
339.	Sharma, Smt Manorama	Socio-Economic Changes in Assm, 1860–1900
340.	Sharma, Shri Saktipada	History of the Co-operative Movement in Bihar 1904–37
341.	Shrivastava, Shri A. K.	Coal Mining in Chotanagpur.
342	Shrivastava, Smt. Subha	Muslim Peasants' Response to the Pakistan Resolution : Bengal Region
343	Shullai, Smt W N	The English and the Jayantia
344	Sing, Shri Bhawagati Saran	History of Modern Industries in Bihar, 1833–58.
345.	Sing, Shri Damodar Prasad	Complaints and Enquiries Against British Civil Servants under the East India Company
346	Sing, Smt Durga	Some Aspects of British Administration in Orissa during the 19th Century
347	Sing, Dr A P	Economic History of Bihar.
348	Sing, Shri Rashbehari	Dhalbhum under the East India Company
349.	Singha Roy, Smt Suhita	Nationalist Movement in Bengal . Economic and Social Factor, 1858–1945.
350.	Sinha, Smt Durga	Partition of Bengal (1905) and its Annulment.
351	Sinha, Shri Kunal	Vernacular and English Press in Bengal, 1885–1922
352.	Sinha, Dr Pradip Kumar	Social History of Bengal in the late 19th and early 20th Centuries.
*353.	Smalley, Mr Allen Edward	Agrarian Relation in West Bengal, 1939–47.
354.	Som, Smt Reba	Congress Politics.

*355.	Staples, Mr. Arthur Cahrles	Shipping between Calcutta and Australia, 1800–1820.
*356.	Strauss, Mrs. Claudia	Property Rights in the 18th Century Bengal.
357.	Subramanium, Smt. Lakshmi	The West Coast in the 18th Century.
358.	Sur, Dr. Nikhil Kumar	Saltpetre Trade and Industry in Bihar.
359.	Syed, Md. Reza Alikhan	Contribution of Murshidabad to the Development of Urdu Language, 1700–1947.
360.	Syiemlich Mr. D. R.	The Constitutional Development in the Khasi and the Jayantia Hills, 1826–1947.
361.	Taniguchi, Mr. Shinkichi	Social and Economic History of Bengal Since the 18th Century.
362.	Tham, Mrs. E. G.	Khasi State and British Rule since 1847
*363.	Ushuda, Mr. Masayuki	Babu Aswini Kumar Dutta of Barisal.
*364.	Ushuda, Mrs. Wakako	Education History of Bengal.
*365.	Vanasehendel, Mr. H. W	Socio-Economic Mobility in Bangladesh.
366.	Verma, Shri S. K.	The History of British Administration in Santhal Parganas, 1765–1871.
*367.	Webster, Mr. Antony	British Trade and Policy in the Malay Archipelago, 1780–1830.
*368.	William Orr, Mr. Alstair	Agriculture in Bengal Presidency, 1793–1901.
*369.	Wills, Mr. John, E	English Trade from India to China.
*370.	Wise, Mr. James Joseph	Intellectual History of Nadia in the 19th Century.
*371.	Zilly, Mrs Aditi	Socio-Economic Background for Desertion of Villages, 1800–1911

তারকা চিহ্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় / প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের জন্য দেওয়া হল।

পরিশিষ্ট : খ

১. জেনারেল কমিটির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণের চাকরির আবেদনের অনুলিপি, 'অনুলিপি'তে স্বাক্ষর স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের

২. ১৯০৫-র উত্তাল দিনে সরকারের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে *অমৃতবাজার* পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষের বক্তব্য

৩. ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে-র গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ বিষয়ে সরকারি ভাষ্য ও হরিনাথ দে-র বক্তব্য

৪. প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে ই.এফ. ওটেনের নিয়োগ

৫. সরকারি শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ

৬. ৯৩/১ আপার সারকুলার রোড়ে 'এক্সপেরিমেন্টাল গার্ডেন' (বসুবিজ্ঞান মন্দির) প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সাহায্যের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবেদন ও সরকারি সাহায্য

৭. কলকাতার অচেনা ছবি

৮. একশো বছর আগে (আগস্ট, ১৯০৯) কলকাতা ময়দানের সীমা

৯. ১৯২২-এ আইনজীবী হিসেবে মহিলাদের নিয়োগে লিঙ্গ বৈষম্য অবসানের চেষ্টা : সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি

১০. সরকারি বর্ণনায় দীনেশ গুপ্তের শেষকৃত্য : দুটি টাকা ও এক পেয়ালা চা

১১. মহাকরণ মানচিত্রে সচিবালয়ের রেকর্ডরুম—১৯৩৭ সাল

১২. রেকর্ডরুম যেভাবে গড়ে উঠেছিল—১৯৪৪ সালে

১৩. ঐতিহাসিক নথিপত্রের সংস্থানগত পরিবর্তনে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রস্তাব।

১. জেনারেল কমিটির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণের চাকরির আবেদনের অনুলিপি, 'অনুলিপি'তে স্বাক্ষর স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের

T. A. Wise Esqr.
Secy to the Government
Sanscrit College.

Sir,

With due deference I beg to
submit that since the date of Hurry Prosaud
Turkopunchanun's illness (professor of the first Grammar
Class) I have been discharging with your permission
the duties of his Office. That I have acquitted
myself creditably, will, I hope, on enquiries being
made to the Assistant Secretary, be amply testified
by him. Now I regret to inform you that the
worthy professor has departed this life 3 days
since so I beg to offer myself a candidate for the
situation. As to my qualifications and conduct
I herewith annex a Copy of the Certificate granted
to me by the Law Committee after having
passed the ordeal of a scrutinizing examination

2.

I further beg to observe that I have under-gone the ordeal and obtained the Certificate 3 years prior to the prescribed term of 12 years which the Regulations of the College ... for the acquisition of a knowledge in the different branches taught there - With respect to my knowledge of General literature a reference to the annual reports of the College ... ... you. In conclusion I beg to observe that as I have received my education at the College I have a right in preference to others to obtain patronage from you and to lay pretensions to any situation that may occur in the institution -

I have the honor
to be Sir
your most obt Servt
Issur Chunder Shur
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণ:—

Calcutta
14 Sept 1840

২. ১৯০৫-র উত্তাল দিনে সরকারের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে *অমৃতবাজার* পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষের বক্তব্য

Amrita Bazar Partika Office
Calcutta, 9 July 1905

Dear Sir, - I am much obliged to you for your inviting me to the conference of the Editors and the Secretaries to be held on Monday next to consider the subject of supplying official information to the Press. Deeply interested as I am in the movement, it would, I fear, not be possible for me to attend the meeting, as I am suffering from an attack of severe tooth-ache which is yet in an acute stage. I am not aware whether you have got any scheme or not, but I doubt not you know that efforts, made in this direction previously attended with success, the reason whereof was that the Press was not satisfied with the quality of the information supplied to it. To ensure the success of the movement, it is therefore essential that facilities should be given to the conductors of newspapers to obtain such information as is really worth having. Whether it is possible or not, with the Official Secrets Act unrepealed, it is for the Government to decide. But this much is certain that the movement will not have its desired effect if an attempt is made to keep the Press satisfied with unimportant informations, as the North Americans were sought to be won over by the distribution of glass-beads. In short, if you can so arrange as to supply the Press with information which the public really value, then your excellent efforts are likely to meet with tolerable measure of success. I sincerely trust, you have a really good and practical plan to offer to the Press.

From my past experience on the subject, what I humbly feel is that the appointment of an officer like the defunct Press Commissioner may meet the requirements of the case to a considerable extent. This officer, it is desirable, should be an Indian, say, one like Babu Gyan Chunder Choudry or Babu Surendra Nath Mittra, one who is thoroughly trained in the Secretariat work, and is by nature courteous and sympathetic. He will act as a medium between the Press and the Government and issue press communiques of his own motion as well as supply information to any member of the Press when the latter wants it from him. He may also contradict, in a friendly spirit any incorrect information when he finds one in a newspaper. In this way it may be possible for him to bring about a rapproachement between the Government and the Press.

To a minor extent, some good result may also be secured by fol-

lowing the method of Mr. Risley which was tried in 1892. Unfortunately just now I cannot give you any definite idea about Mr. Risley's scheme.

Here is a subject of complaint to which I beg to draw your attention. Sometimes official papers of public importance containing no official secrets are withheld from the Press for reasons which are not known. Take for instance, the letter of the Hon'ble Mr. Carnduff on the rural primary schools, reproduced in yesterday's "Patrika" from the "Sangibanee" newspaper. Now, I humbly think, copies of such absolutely innocent documents ought to be distributed to the Press as early as possible. Similarly, the Press is yet quite in the dark as regards the measure of the 'Village Government', though the movement was started about a year and half ago The Press should be acquainted with the fullest details regarding this and other similar matters of public importance. Here is another small matter When the Lieutenant-Governor delivers a public speech, copies of it are not sent to all but only to two or three daily papers. Now, I have no doubt, that this is done without His Honour's permission, for, he is incapable of making any such invidious distinction between one daily paper and another.

In conclusion I beg to offer my sincere thanks to you for your kind efforts in helping the Press and I wish every success to the movement.

Yours Affly
Motilal Ghose

[অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিভাগ, সেপ্টেম্বর ১৯০৫, প্রসিডিংস বি : ২২৮-৫০]

৩. ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে-র গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ বিষয়ে সরকারি ভাষ্য ও হরিনাথ দে-র বক্তব্য

Edn 3380   4 March/07 No 91

Gov t Bengal, Executive Form No. 360 (New).

	Govt. of {190 } Bengal.	Department	General.
Enclosures. 2 Sets.	From A. Earle, Esq., I.C.S., The DIRECTOR of PUBLIC INSTRUCTION, BENGAL.	Branch	Edu
		File No.	5 I/1 of 07
Plans:	Subject:	Number in File	1
Spare copies:		Date of receipt	24/12/06.
		Diary number	5/632

No. 2/967

To the SECRETARY to the GOVERNMENT of BENGAL,
General DEPARTMENT.

Dated Calcutta, the 23 December 1906.

Sir,

DEPARTMENT

I have the honour to forward herewith in original the accompanying application, dated the 12th December 1905, from Mr. Harinath De, Professor, Presidency College and at present officiating Principal of the Hooghly College offering himself as a candidate for the post of librarian of the Imperial Library, Calcutta, which has fallen vacant owing to the death of Mr. J. Macfarlane.

2. After careful consideration of Mr. Harinath De's application I am of opinion that he might reasonably be given a trial in the post under consideration. He has, as is well known, a great knowledge of languages, and he has also a very considerable knowledge of books. Both these

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
[signature]
Director of Public Instruction, Beng

হরিনাথ দে'র বক্তব্য

PA

Have we received any letter

Chinsurah
28. 1. 1907

Dear Hornell,

I intend coming up to Calcutta tomorrow to attend the meeting of the Council of the Asiatic Society.

I understand that the Government of India has already sent a letter to the Govt. of Bengal about my appointment as Imperial Librarian. I shall feel much obliged if you will kindly make the necessary enquiries.. I do not understand the cause of all this delay in sending me the information through the proper channel.

A word from you to your expedite matters.

Thanking you in anticipation

Yours sincerely
Harinath De

W.W. Hornell Esq.

File 3/1/07 30/1/07

রেকর্ডস (এডুকেশন) মার্চ ১৯০৭
প্রসিডিংস নং, ৯১ - ৯৬।

৪. প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে ই.এফ. ওটেনের নিয়োগ

INDIA OFFICE, LONDON.

PUBLIC

16TH JULY, 1909.

No. 103.

TO HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

My Lord,

With reference to the letter of the Secretary to the Government of India in the Home Department, No.35 dated the 3rd September 1908, I have to inform Your Excellency in Council that I have appointed Mr. Edward Farley Oaten B.A., LL.B., of Sidney Sussex College, Cambridge, to the Indian Educational Service as a Professor of History in Bengal.

2. I enclose one part of his agreement, together with copies of his application and testimonials.

3. He sails for Calcutta by Peninsular and Oriental Steamship "Simla" on the 1st September next.

I have the honour to be,

My Lord,

Your Lordship's most obedient humble Servant,

Sd Merly Blackburu



Bengal Secretariat.

D. O. No. 115 T.G.

Darjeeling, the 29th June 1909.

My dear Fell,

In reply to your demi-official No.124, dated 19th June 1909, regarding the appointment of Mr. E.F.Oaten, B.A., LL.B. (Cantab.) to the Indian Educational Service, I am desired to say that it is proposed to post Mr. Oaten on his arrival in India to the Presidency College, Calcutta.

Yours sincerely,

Sd. J. G. Cumming,

28-6.

G. R. H. Fell, Esq., I.C.S.,

Deputy Secretary to the Government of India,

Home Department.

জেনারেল (এডুকেশন) আগস্ট ১৯০৯,
প্রসিডিংস্ বি ; ৫৬-৫৮।

৫. সরকারি শিল্পকলা মহাবিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ

No. 884

Government of India,
DEPARTMENT OF EDUCATION.

Simla, the 15 May

From

The Hon'ble Mr. L. Porter, C.I.E., I.C.S.,
Secretary to the Government of India,

To

The Secretary to the Government of Bengal,
General (Education) Department.

Sir,

In reply to your letter no. 2226, dated the 25th March 1913, I am directed to say that, subject to the approval of the Secretary of State, the Government of India sanction the appointment of Mr. A.N. Tagore, Vice-Principal, School of Art, Calcutta, to officiate as Principal of that institution from the 6th January 1913 to the 1st October 1913, and the grant to him of an acting allowance of Rs. 100 a month during this period.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
L. Porter
Secretary to the Government of India.

[জেনারেল (এডুকেশন) মার্চ ১৯১৪,
প্রসিডিংস্ বি, ৩৫৮-৬৭।

৬. ৯৩/১ আপার সারকুলার রোডে 'এক্সপেরিমেন্টাল গার্ডেন' (বসুবিজ্ঞান মন্দির) প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সাহায্যের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবেদন ও সরকারি সাহায্য

Presidency College,
Calcutta, 4th December, 1915

Dear Mr. Lyon,

May I call at an early date to ask your advice about my new opportunities for work ? I can not help feeling a little sad in the severance of connection with the Institution which I served for 31 years, Have I been able to serve the Government and my country equally well ? I should like to know.

2. It is customary in publication of the Royal Society to describe one's position with reference to the special work. Would it be possible in a formal or informal communication to me from Government to have my future duty referred to as the Director of Bio-physical Research ? Occasions would often arise in my future visit to Europe to describe my present duties under Government.

3. It would perhaps be beat at this juncure to have the orders of the Government about facilities of research which I may expect at the Presidency College, as regards rooms and occasional loan of apparatus. I have dreams of some day being able to build an Institute where the inevitable expansition of my work in many directions will not be hampered for want of space But this may be long in coming, since the resources on which I counted have undergone serious depreciation on account of the war I am, however, certain that my dreams will come ture

4 It would also be advisable to begine the building of the workshop for construction of apparatus and of photo-technic appliances and for electric testing I have been put in an embarrassing position in being obliged to send an evasive answer to the courteous request of the English and American Universities for supply of apparatus. Apart from other considerations a feeling of obligation would have enabled us to secure better terms and better supervision for Indian students in

5 I intend to hurry on the building of the workshop on the land of experimental garden in Calcutta under my general supervision Have I your permission for this and could I draw half the grant of Rs. 25,000/ for immediate expenses and the other half before the 31st March 1916, by which time I shall have the work fully completed ?

Yours sincerely
J. C. Bose

The Hon'ble Mr P C Lyon C S.I.

General (Education) Feb 1916 Proceedings B. 316-17

GOVERNMENT OF BENGAL

From

The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I., I.C.S.,
Offg. Secretary to the Government of Bengal,

To

The Dr. J C. Bose, C.S.I., C.I.,

Sir,

I am directed to convey the sanction of the Government to the construction of a workshop, for the prosecution of your researches, on your own land situated in 93/1 Upper Circular Road, Calcutta, and to the payment to you of a sum of Rs 15,000/- out of the non-recurring grant of Rs. 25,000/- sanctioned by the Government of India, Department of Education, in their letter No. 1601, dated 16th November 1915.

2. I am to add that the grant is made on the condition that if the workshop is not used as such for the prosecution of the researches on which you are engaged, at the end of five years, Government will sell the building, giving you or your executors the right of pre-emption. The Accountant General, Bengal has been informed.

3 The charge will be met from the amount of Rs. 25,000/- added to the grant under "22 Education" for 1915-16 by the Government of India in the Education Department.

Deparment letter No. 1801, dated the 16th November 1915.

I have the honour to be,

Sir
Your most obedient servant,
Sd/- K. C De.
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

[জেনারেল (এডুকেশন) ফেব্রুয়ারি ১৯১৬, প্রসিডিংস্ বি; ৩১৬-১৭

৭. কলকাতার অচেনা ছবি

Dated Calcutta, the 26th March 1918
From–THE REV. HERBERT ANDERSON, Calcutta,
To–The commissoner of Police, Calcutta

The following statement upon commercialized prostitution amongt Indians in Calcutta is based upon experience gained during residence in the city since 1889 A few weeks ago, at your request, I began a more careful and systematic investigation into the conditions as they exist to-day, and it will become time before that enquiry will be concluded. I have, however, visited a number of typical brothels in the different parts of the city, have conversed with about fifty prostitutes, have seen for myself the conditions, and sifted the evidence upon which the conclusions, herewith sent, are based It seems desirable not to wait longer before furnishing you with an interim report.

IMMORALITY AND PUBLIC OPINION–The practice of prostitution in Calcutta especially among Indians has always been an undesirable feature of its civic life. In a comparison of conditions as they were 25 years ago and as they are to-day the contrast is striking and on the whole encouraging. On the one hand, prostitution has increased steadily in the number of women and girls actually engaged in it; but such increase has not been in any undue ratio to the increase of the city's population or the changes in its social and material conditions. There has been, on the other hand, a striking change for the better in some aspects of the public character of immorality, in the control of it, and in the steady growth of Indian public opinion. A quarter of century ago prostitution was regarded as necessary vice and Indian protests against the presence of brothels in public thoroughfares and respectable residential areas were rarely, if ever, heard. To-day a new standard of public decency exists, and enlightened Indian opinion seeks the co-operation of the Government and the city corporation for further improvement. It cannot be said that a sound consistent policy for dealing with commercialized vice has been settled or maintained, but the trend of opinion, civic and official is that the trade of vice should not be tolerated as an open organized and prosperous business. Although its entire elimination may be regarded as impossible, its growth and success as a trade can be seriously hampered, its publicity prevented, and everything in it that creates virtual slavery of womanhood, severely punished by law.

Causes of prostitutions.–It is not disirable to examine it this short statement the variety of factors that have made prostitution what it is in Calcutta to-day. These are complex and vast. The social system of the Orient, the economic factor, compulsion, seduction, pleasure, sexual inclination, feeble mindedness, these among other reasons have been mentioned to me by Indian prostitutes themselves as causes. The character of the city also as an eastern port, a military station, and a place where economic causes lead to a large numerical preponderance of the male over the female population are all factors in the situation.

Object of statement.–The object of this statement is to set forth some of the conditions of commercialized Indian prostitution in this city with a view to show to what extent evils similar to those described in the Bombay case of the Prostitute Akootai prevail, also to suggest remedial measures.

Statistical Data.–A considerable amount of statistical information is procurable from the Census returns of past decades. In the Census Volume of 1901, the following figures for Calcutta town and suburbs are given :–

Total of prostitutes 18,352–Hindus 16,185, Muhammadans 2,027, Christians 55 and others 85

The following paragraph is taken from the Census Report of 1911, paragraph 113, page 64, Volume VI of Census of India, 1911, City of Calcutta :–

The number returned as beggars, vagrants and prostitutes is noticeably large, viz., 24,155, of whom 4,044 are dependents In this category there are five females to every male The disparity of the sexes is due to the very large number of prostitutes, which amounts to 14,271, viz , 12,848 in Calcutta and 1,423 in the suburbs Large as this number is, it is 4,049 less than was returned in 1901.

The prostitutes of Calcutta represent $4\frac{1}{2}$ per cent of the total female population, and 21 per cent of the women who returned themselves as engaged in any occupation. The percentage calculated on the total female population however, gives a mesleading idea of the proportion of prostitutes, as it includes girls under 10 years of age, who are not old enough for a life of shame Excluding them, we find that 6 per cent. of the females of Calcutta are professional prostitutes : the actual number is probably even greater, for it is not every prostitute who is hardened enough to proclaim herself such, and many describe themselves euphemistically as maid-servants. The proportion is even higher among women aged 20 to 40 among whom

one in every 12 is a woman of ill-fame It may be added that no less than 1,096 girls under 10 years of age (997 in Calcutta and 99 in the suburbs) were returned as dependents on prostitutes, and it may fairly be assumed that they are being brought up to the same profession.

Special statistics of the castes and nationalities of the 14,271 prostitutes in Calcutta and the suburbs show that nine-tenths are Hindus, and that 2,962, or over one-fifths are Kaibarts The Baishnabs contrubute 1,770, the Kaysths 1,408, the Sadgopes 844 and the Musalman Sheikhs 803, one out of every 5 Baishnab females rerurned herself as a profesional prostitute Only 32 are Europeans or member of allied races, while 49 Jewesses and 55 Japanese The returns of birth-place show that these women mostly come from West Bengal (notably Midnapore, Hoogly and Burdwan), or were born in Calcutta and the neighbouring district of the 24-Parganas Only 322 are immigrants from Eastern Bengal, or less than the nember hailing either from Bihar and Orissa (744) or from the United Provinces (409) Of countries outside India, Japan has the largest share (55) and then Russia (30)

The latest approximate police returns for the whole of the city and suburbs, as supplied to the Calcutta Vigilance Committee by the Commissioner of Police in October 1915 are as follows –

Towns

It will be seen therefore that the brothels represented by these figures are scattered over the city, but that the chief centres are in the northern sections of the town

Nationality of Prostitute Class–The diversity of race among Calcutta prostitutes is extraordinary All parts of the east supply some victims The majority are Hindus and in Calcutta a large proportion come from the various districts of Bengal Bihar is strongly represented among up-country girls, but Bombay and the Punjab also supply a regular quota. There is the same diversity in regard to social status from which the girls have come, and in regard to their age and general appearance Fifty and 60 languages are spoken in Calcutta From the inquiry so far conducted it would appear that representatives of most of them are found in one or other of the city brothels.

Classes of prostitutes–There are many different classes of prostitutes which may be classified as independent, semi-independent and dependent. The first includes the individual prostitute class, dancing girls, kept mistreses, women found in the better class of brothels, and also a large section of the poorest type living in single rooms in busti tenements The second or semi-independent are a

numerous class who live in houses owned or supervised by mistresses to whom their relationship is often only that of tenant to landlady. The third are the dependent class of poorer prostitutes who are brothel inmates in virtual restrant, through debt or other causes and who have no real control over their daily earnings.

It is among this last class of prostitutes that conditions might be expected similar to those disclosed in the Bombay case. There is nowhere in Calcutta the conditions stated to be found in Bombay where the lower class prostitutes ply their trade behind barred doors or windows, nor have the houses visited recently by me shown any instance of inmates kept under lock and key. In the majority of cases it is a form of debt slavery that exists, and brutality, torture or any other form of cruelty is entirely dependent upon the character of the master or mistress for whom the girls ply their trade. The conditions are such that the desperate plight of the Bombay Prostitute Akootai is always a possibility and there are unfortunately few, if any, who would report such cases or help the unfortunate victims of a cruel system to secure police protection. A typical illustration of the usual conditions is furnished by brothel in Sandal Street. The mistress has five resident girls, two of whom rent godown each at Rs. 4 per mensem. All of them had been recruited from mufassal districts, Midnapore, Howrah, etc., or after being in Calcutta some time in another had been brought to their present situation. Each was in debt to the mistress for food, clothes, ornaments and other things for various another They could go away conditionaly on leaving security for the debt or paying it up. Half their takings went to the bariwalla who contrived as most of the class do, so to get the girls into control financially that they do not allow the debt to be paid off entirely. The youngest girl in this brothel was about 16. In recent investigations I have met occasionally women who had not left the premises they were in for a long time, but they said that they had nowhere to go and no desire to leave. While it would be too sweeping a statement to afirm that many of the women in the houses of prostitution are really in slavery, it is perfectly true that a proportion of them are in such virtual restraint that they do not know how to get free.

Pimps.–One of the most prominent characteristics of the lower class prostitution is the number of pimps associated with it In every section of the city where the vice is tolerated the male element is much in evidence. The Oriya appears to be largely represented in this connection. The pimp acts as advertiser. He strolls the streets, watches from the door-ways of brothels and any likely customer is dealt with first by him. He acts as 'bully' and whenever disagreement

or distrubance occurs in or near the brothels he is to the front for the interest of his employer. He usually has a be taken to another or several other houses. He also sometimes acts s procurer, the demand being considerable and police action in closing disorderly houses making changes in location necessary for girls

Besides the pimps there are brothel keepers, owners of houses, owners of garries and male relatives of the prostitutes themselves all with a pecuniary interest in the trade. It is surprising how difficult it is to trace the connection of men financially implicated with the prostitution now carried on. Power over the procurer, pimps or oher males financially implicated is an urgent need in the present situation.

Recruitment.–On the question of recruitment for Indian commercialized prostitution, the evidence shows that a proportion of women come voluntarily from public prostitution in mufassal towns or villages through reports given there of the better prospects afforded by city conditions, some usually widows, or those who have been seduced, or have fallen and are enceinte, go or are taken to the brothels as the only available place in their distress; and some are brought there by fraud, deceit or other illegal means. The mistresses or bariwallas are often old and has much experience. One woman in Sova Bazar Street has purchased her house, a large two-story residence with accommodation for ten women, each with a small room for herself, after five years' tenency and has now owned it for three years Another woman not far away, a lessee herself of a house with eight rooms, had been in residence for 40 years. In such cases they become well known and have no difficulty in recruiting the women they want or in sypplying other brothels

Prices.–The prices for prostitution depend upon the class to which the prostitutes belong and vary from two annas to Rs 15 to Rs. 20 per visit. To those who do not accept a double moral standard for men and women, who let moral principle and not expediency decide their attitude to the problem, and who feel the wrong done to a helpless child or woman as keenly as that done to a mother or sister of their own, it seems wicked that there should be hundreds of Indian women in Calcutta who sell their virtue for an anna or two, and for that have to do whatever clients, often the worse for drink may wish. On the other hand, the trade is associated with apartments beautifully furnished, fitted with electric lights and fans where payment has to be on a high scale. As with every marketable commodity, it is the demand that regulates the supply.

Drink.–On the connection of commercialized Indian vice with the drink traffic much might be written Drink is available in most of the

brothels, or can be fetched if desired Drink stimulates immorality and usually plays a part in that promiscuous relation between man and woman that results in disease. It is believed that if illicit sales could be prevented in the brothels of Calcutta, the revenue of the Excise Department would be severely affected This can only be prevented by suppreessing the brothel

Terms of employment.–On the subject of terms of employment of the class of prostitutes called dependent or semi-dependent the conditions vary Further investigation is necessary If the relation is only that of landlady or tenant–rent of the room occupied is paid Receipt books are kept and rents vary from Rs. 4 to Rs 16 per mensem In some cases girls have let their rent get behind for longer or shorter periods and so become debtors. In the cases in which the prostitutes are engaged by the mistress or bariwallee and become part of the establishment, the usual arrangement is stated to be that half takings are kept by the girl and half are given to the mistress In some places clients pay direct to the girl, in others direct to the mistress for the girl. It appears to be almost invariably the rule for such girls to be in debt to the mistress In a brothel near Wellington Square one girl had only been in the house for ten days, but her debt was Rs 25 for clothes and ornaments Several girls have stated that they owe Rs 150, Rs 200, or even more rupees And however much they gain by their trade the ability to repay, if it occurs, does not seem to be used In the cases of some prostitutes, the mistress claims some sort of relationship and on the basis of that claim takes all the earnings. In several such cases my suspisions have been aroused If proof were called for it would often be shown that such women or girls are often in virtual slavery to the establishment The mistress feeds the girls, gives drink to them and their customers, and runs up claims on various other accounts so that the meshes of circumstances can quickly be tied around any unfortunate and friendless girls or women cone introduced to brothel life. On the mistress' side there is always the fear that the girl employed may run away with clothes or ornaments of considerable value. In a recent case at Diamond Harbour when three girls ran away from a Calcutta brothel, this is what had occurred. It is therefore desirable on the mistress' part to make her employees contented with their lot, and I have met cases whre girls have been working for a period of years and apper happy and contented.

In certain brothels men appear to have special connection of employer to individual girls–they act as their pimps and in the batering as to price to be paid and use the income derived as their means of support.

Minor children in brothels –Still another prominent characteristic is the number of female children to be found in the brothels of Calcutta. All statistical data seem to me to underestimate the true conditions. In 1872, the Commissioner of Police estimated the prostitute community of number 7,000 and said there were 408 female children under 10 years of age in their control In 1904, the number was said to have increased to 729 In 1907, the Commissioner of Police gathered statistics showing that 1,042 girls under 14 years of age were in Calcutta brothels Lawful guardianship was not claimed in respect of 140 of these, but no attempt was made to check the correctness of the assertions advanced by prostitutes that they were the mothers of the other children , In my recent investigations so many girls of tender age have been found in a large proportion of the brothels visited that the figures for 1907 must be appreciably higher Recent police cases may have led to many of these being sent out of Calcutta for a time, and this was reported in more than one section of the city The supply of these children is stated to come from indecent parents and guardians who sell them; women to avoid the loss of caste has to dispose of illegitimate offspring; procuresses or prourers who have agents in districts outside Calcutta and can always find brothels at which to dispose of female children however obtained by them In a brothel, in Raja Harendra Krishna Lane, I was told of a woman named Sushila, who was an agent of this sort and the price of two or three small children recently purchased by her was stated to be Rs 5 to Rs. 10. The traffic in such children is necessarily due to he brothel system as at present carried on, and the opinion of a former Commissioner of Police is probably correct that at least 50 per cent of minor girls in Calcutta brothels are not in lawful guardianship.

Solicitation –The conditions are such in the chief public thoronghfares, such as Chitpore, that immorality is advertised with Oriental modesty Brothels are close to educational institution, places of worship, respectable residential quarters, squares, markets, etc , and in certain quarters every respectable pedestrian, including young men, children and students have to pass brothels on main thoroughfares whenever they wish to go A Brothel Special Committee of the Calcutta Corporation decided, in January 1916, that it was not possible to draw up a list of streets, which should be declared main thoroughfares under section 2 (i) (c) of Bengal Act III of 1907 because it would necesarily imply the general question of the localization of prostitution and the committee were strongly opposed to any such policy It was, in their opinion, better to have it everywhere than somewhere.

Solicitation in reference to Indian prostitution consists of self-advertisement from verandhas or on the street, at corner of gullies and occasionally is police reports. In sections of the city more Anglo-Indian and European than in the northern section Indian vice advertises itself more blatantly. A typical case is Uma Charan Das' Lane where at 11 to 1 at night conditions are more characteristic of the flagrant conditions depected in Bombay than anywhere else. It must be acknowledged, however, that taking the city as a whole the Indian prostitutes are always modest in demeanour and decent in apparel.

Effect of the war.–The excitement and restlessness created by the war have not visibly affected the Indian condition of prostitution in Calcutta. The large number of furlough soldiers quartered here has had its effect–as more heve been driven by gharriwallas or taken by pimps to Indian quarters to which they do not usually find their way, and they and the army heve suffered in consequence. The presence of soldiers on furlough has created a problem that demands consideration. So far as I have seen, the quarter in the neighbourhood of Colinga Bazar has been the cause of the greatest trouble. The whole of the area should be cleared of vice within the next three months if the number of soldiers on furlough sent to Calcutta is to remain as great as during 1917.

Venereal Disease —Upon one aspect of Indian prosititution in Calcutta no date is avilable. It is the aspect now receiving most emphasis in Britain viz., diseases consequent upon immorality. The present medical opinion of the effect of syphilis and gonorrhoea upon the community the affect is serious enough to make all civic authorities re-examine their conclusions. The Royal Commission Report should destroy the conspiracy of silence on a disease and death when they lie at the door veneral, extend and advertise the facilities for the diagnosis and treatment of the discases, prevent as far as possible marriages of persons infected and give a larger place in the education of the youth of the country to instruction in regard to moral conduct as bearing upon sexual relations. It is for Indian medical men to examine the conditions of Calcutta on venereal disceases in the light of the Royal Commission Report and to expose the menace to the physical and moral manhood and may judge by the number of quack medicines largely advertised in the Indian Press, diseases of this kind must be very common throughout the Indian community.

Remedial Measures.—The remedial measures desirable in Calcutta are—

(1) A closer policy which should be submitted by the authorities to Indian opinion for consideration, e.g.—

(a) The rescue and protection of female children, unlawfully obtained from brothels, the onus of proving lawful guardianship resting with the owner of the brothel or the woman with whom the child is living or both.

(b) Greater executive and judicial powers to the police authorities with necessary safeguards, to deal with procurers, pimps, and all males or females having any financial interest in commercialized vice. This should be wide enough to include the landlord or lessor of premises, exploiteers of both sexes, owners of drivers of vehicles who abet immorality and any who solicit on behalf of prostitutes. In special cases powers of deportation as used successfully with German Jews in Calcutta some years ago might be applied with advantage to Indian procurers.

(c) Further suppressive measures to compel the withdrawal of vice from its accustomed resorts thereby ensuring as has been so sucactual decrease of the number of vice resorts in active operation, (b) the actual decrease of the number of persons engaged in the business of porstittion, (c) the diminishing scope of the vice till it becomes no more than a temporary hazardous busincess conducted for the most part by individual prostitutes

(d) Some measures to free and protect the prostitutes class from the financial bondage of the present system so widely in vogue, with plans that will give some form of industrial occupation to children rescued or to prostitutes willing to be aided in this way. The difficult problem of the disposal of prostitutes when their vice resorts are dealt with is not insoluble. Many might return to the districts and conditions from which they have come A sympathetic treatment of the class itself is desirable.

(e) A medical programme for the treatment of venereal in connection with the Health Departent of the Corporation and the application of the recommendations of the Royal Commission on veneral discase to the condition of this city.

2. The financial aspect of these recommendations might be met by a public appeal with the promised aid of Governemnt if heartily responded to by the Indian community.

[No. 15]
File No. P. 14-B—3 (2) of 1917]

Nos. 99-100 P.J., dated Calcutta, the 11th January 1918
Memo by—H. R Wilkinson, Esq., I.C S , Under-Secretary to the Government of Bengal, Political Department.

Copy of the above forwarded to the Commissioner of Police, Calcutta, and the Inspector-General of Police, Bengal, for favour of an early report.

[No. 16]
File No. P. 14-B—3 (3) of 1917]

No. G. -3066-12 — 736, dated Calcutta, the 29th January 1918
From — R Clabke, Esq., Commissioner of Police, Calcutta,
To — The Chief Secretary to the Government of Bengal.

I have the honour to refer to your endorsement No. 99 P J., dated the 11th January 1918, forwarding a copy of letter No 885 C , dated the 14th December 1917, from the Government of India, Home Department, and its occurred in the city of Bombay I have been asked to given an opinion as to what extent evils similar to those disolosed in the Bombay case exist in Calcutta and what remedial measures I would propose to prevent such evils enquiries and a Sub-Committee under the presenency of Sir Charles Allen brothels This Committed a report and made several definite position to accept Since this date no special enquiries have been made in Calcutta, but I have been for some time considering whether some section cannot be included in the new Calcutta Police Act, which is now being drafted, to obtain some control over Calcuta brothels with special reference I do not consider that such compulsion or ill-treatment as has been brough to light in the Bombay case is in existence in Calcutta, but in order that I may be in a position to submit a full report to Government, I have asked a European and an Indian gentlemen, who have for some time interested themselves in the subject, to hold a non-official enquiry into the question and to let me know the result of their personal investigations As soon as this enquiry has been completed I shall report further to Government on the question

[No. 17]
File No. P. 14-B—3 (4) of 1917]

No 1936 C.—C -117-18, dated Calcutta, the 22nd February 1918
From — The Inspector - General of Police Bengal,
To -- The Cheief Secretary to the Government of Bengal

With reference to Political Department memorandum No 100 P J , dated the 11th ultimo, regarding the condition of brothels in Bengal and the subsequent reminder I have the honour to say that the matter is being treated as urgent and that my opnion will be submitted as soon as reports are received from all Deputy Inspectors - General. The reference made by the Government of India involves an enquiry in all districts of the Presidency and this is cansing delay I however, hope to send a reply at an early date

[No. 18]
File No. P. 14-B—3 (5) of 1917]

No 2261 C.—C -117-18, dated Calcutta, the 4th March 1918
From—The Inspector-General of Police, Bengal,
To—The Chief Secretary to the Government of Bengal.

In continuation of my letter No 1936 C , dated the 22nd ultimo, on the subject of the condition of brothels in Bengal, I have the honour to report after consultation with my officers that, except in the town of Howrah, there is no evidence that prostitutes ae subjected to the same form of restraint as in Bombay, although instances of maltreatment of prostitutes by brothel-keepers are not unknown With regard to Howrah, the Superintendent of Police reports that although such extreme cases as the one disclosed in the trial of Meroza Syed Khan have not hitherto come to notice, nevertheless in the lowest class of brothels cases of virtual restraint and confinement of girls, and their maltreatment by bullies or mistresses, are not uncommon.

2. Referring to the remedial measures suggested by the Commissioner of Police, Bombay. I doubt if the conditions in this province would justify or whether the power, if taken, would serve any useful purpose unless it is proposed also to take power to prohibit a person from maintaining a brothel, area would only result in his starting the same business in another locality I also doubt the

feasibility of creating a system of control over brothel-keepers, landlords, lessors and lessess. This would be a dangerous experiment, unless expensive supervisionary machinery was provided, and even then it would be difficult to prevent abuses and extorition. I would strongly deprecate employing the police to act as controllers of such establishments. The objections are too obvious to need mention. I think the remedy lies in amending the Disorderly Houses Act, Eastern Bengal and Assam Act II of 1907, which does not at present provide for the periodical inspections of brothes and in the absence of any such provision it is impossible to provide against abuses such as have come to light in the Bombay case I suggest the addition of a clause to the Disorderly Houses Act providing for the registration of brothels within the limits of the Bombay case. I suggest the addition of a clause to the Disorderly Houses Act providing for the registration of brothels within the limits of the municipality and for their inspection by a committee of Municipal Commissioners. I think this will be sufficient so far as this province outside Calcutta is concerned. I have no experience of the conditions in the town of Calcutta and it is possible that my suggestion will fail to meet the problem there. But I would suggest that any action taken in respect of Calcutta may be extended to the town of Howrah.

[No. 19]
File No. P. 14-B—3 (6) of 1917]

No. 315 P.J.—D., dated Calcutta, the 14th June 1918.
From—The Hon'ble Mr. J. H Keer, C.S.I., C.I.E., I.C.S.,
Chief Secretary to the Government of Bengal
To—The Secretary to the Government of India, Home Department.

I am directed to refer to Mr. Courtenay's letter No. 885 C, dated the 14th December 1917, enclosing copies of papers relating to the murder of a prostitute in brutal circumstances by a brothel-keeper in Bombay. The Government of India enquire to what extent evils similar to those disclosed in the Bombay case exist in Bengal, and what remedial measures the Governor in Council would propose.

2. The general question of the regulation of prostitution in Calcutta has been for some time under consideration in connection with a contemplated amendment of the Calcutta Police Act, and I am to submit, for the information of the Government of India, a note containing a valuable and moderate statement of the case, which has

been furnished to the Commissioner of Police by the Reverend Herbert Anderson, a well-known missionary and philanthropist, who has studied the question for many years. Conditions in Howrah are generally similar to those in Calcutta. In the mufassal there is no evidence of the existence of serious abuses, but the problem is essentially one of cities.

3. So far as Calcutta and Howrah are concerned, it may be inferred that, while in many cases the poorer prositutes are so much in debt to the keepers of the brothels in which they reside that they are virually in subjection to them and are peculiary liable to harsh treatment, no evidence of excesive or general ill-treatment or of conditions like those prevailing in Bombay has been found. The Governor in Council does not, therefore, think that any remedial measures are necessary in Bengal to deal with this particular point. As already stated, other aspects of the problem of prositution in Calcutta are under consideration, but it is unnecessary to discuss them here.

(পলিটিক্যাল (পুলিশ), জুলাই ১৯১৮, প্রসিডিংস্, ১৪-১৯)

৮. ১৯২২-এ আইনজীবী হিসেবে মহিলাদের নিয়োগে লিঙ্গ বৈষম্য অবসানের চেষ্টা : সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি

No. 4703G., dated Calcutta, the 20th June 1922.

From—A. A. Patterson, Esq , I.C.S., Offg. Registrar of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal Appellate Side.

To—The Secretary to the Government of Bengal Judicial Department.

Subject : Proposed removal of sex disqualification of women for enrolment as legal practitioners.

In continuation of the Court's letter No. 4005 G., dated the 19th May 1922, I am directed to forward herewith a copy of the note of dissent recorded by certain Judges of the Court on the above subject

Note on the question of the removal of sex disqualifloation of women for enrolment as legal practitioners.

We are of opinion that special considerations are to be found in the social customs prevalent in India why women should not be disqualified by reason of their sex from becoming lawyers The number of women, who would adopt the profession of the law, is not likely to be great. and the role which they might be expected to fiil would not be that a of Advocated in open Court, but rather that of advisers to other women under the resraints of the purdah, a role in which their services might be of great value.

We are, therefore, in favour of legislation for the removal of the sex disqualification.

Asutosh Mookerjee
T.W. Richardson.
C.C. Ghose.

The 14th June 1922

No 5381J , dated Calcutta, the 15th July 1922

From — H P Duval. Esq . I C S , Secretary to the Government of Bengal Judicial Department.

To — The Secretary to the Government of India. Home Department

I am directed to refer to Mr Tonkinson's letter No F 816 Judl dated the 17th February 1922, on the above-mentioned proposal, brought forward by Dr Gour in the Indian Legislative Assembly The Government of India ask for the views of the Governor in Council upon the question as also the views of such other authorities or Associations as this Government might think fit to consult

In reply I am to say that representative Associations and lawyers, and some selected District Judges, noted in the margin, were consulted and their replies are herewith enclosed for the information of the Government of India

The High Court, who were consulted direct by the Government of India, have also for warded their views at the request of this Government It will be seen that most of the Bar Associations and a majority of the Judges of the High Court are not in favour of thie proposal On the other hand, some District Judges the Incorporated Law Society and other Assoiciations view it with favour The main argument in support of the proposal is that as women have been successful in other professions and taken up branches of it without entering into the profession of the Law, and there is no just reason why, on general principles, women's claim to equality in such matters should be refused much in advance of public opinion in India The governor in Council has consulted all the Members and Ministers of this Government on the question whether the legal bar, which at present disqualifies women from enrolment view of the conflicting decisions on the subject this bar could not be effectively removed except by legislation—an opinion held too by the three Judges of the Calcutta High Curt who have recorded a note of dissent on the opinion of the majority of the Court His Excellency's Council agree with the opponents to the change on the ground that Government should not support a proposal of the nature which is far in advance of the general wishes of a community which does not appear to be anxious for its introduction The bar has only recently been removed in England and it remains to be seen what the result will be and caution should be exercised in introducting such western ideas into India

The minutes recorded by the Hon'ble Members and Ministers are forwarded herewith for the perusal of the Government of India

জুডিসিয়াল (জুডিসিয়াল) জুলাই ১৯২২
প্রসিডিংস এ, ৭৮-৭৯

৯. একশো বছর আগে (আগস্ট, ১৯০৯) কলকাতা ময়দানের সীমা

No. 245J. dated Calcutta, the 14th August 1909.

Notification — By the Government of Bengal, Judicial Department.

The following descriptions of the revised boundaries of Fort william, which have been approved by the Government of India, are published for general information ·

Description of the boundaries of Fort William,

Commonly known as the Calcutta Maidan.

Magnetic variation 146

Description	Direct distance in feet.
Stone No. 1 is situated at low water-mark of the river Hooghly at the south side of Chandpal Ghat, thence the houndary follows the south side of Chandpal Chat to No. 2.	
Stone No. 2 is situated at the top and on the south side of Chandpal Chat and west side of the Strand thence the boundary crosses the strang to no.3	92
Stone No 3 is situated at the junction of Esplanade Row with the Strand, thence the boundary run along the south side of Esplanade Row to no. 4	870
Stone No. 4 is situated on the south side of Esplande Row opposite the west entrance into the Town Hall compound, thence the boundary runs to No 5	190
Stone No 5 is situated opposite the Town Hall 50 feet to the rear of the Bentick Statue, thence the boundary runs to No. 6	192
Stone No. 6 is situated on the south side of Esplanade Row opposite to east entrance to the Town Hall compound, thence the boundary follows the bend of the road to No 7.	291
Stone No. 7 is situated at the West side of Government Flace, West. at the point Esplanade Row and about 48 fest tothe north of the balustrade, thence the boundary follows the balustrade to No 8	424

Stone No. 8 is situated at the junction of Auckland Road with the Eden Gardens Road, thence the boundary crosses the Eden Gardens Road to No. 9.	134
Stone No 9 is situated at the north corner of the enclosure of the Canning Statue, thence the boundary follows the enclosure to No.10.	257
Stone No. 10 is situated at the east corner of the enclosure of the Canning Statue, thence the boundary crosses the Lawrence Road to No. 11.	137
Stone No. 11 is situated at the south side of the Lawrence Road at the west corner of the enclosure of the Lawrence Statue, thence the boundary follows the pillars and chains in front of the Lawrence Statue to. No. 12.	122
Stone No. 12 is situated at the south side of the Lawrence Road at the east corner of the enclosure of the Lawrence Statue. thence of the Lawrence Statue, thence the boundary orosses the road to No 13.	175
Stone No 13 is situated at the north corner of the enclosure of the Hardinge Statue, thence the boundary follows the enclosure to No. 14	241
Stone No 14 is situated at the north corner of the enclosure of the Hardinge Statue, thence the boundary crosses Government Place. East, to No 15	179
Stone No 15 is situated at the footpath at the north side of the Ochterlony Road at the junction with Government Place East, thence the boundary follows the footpath on the east side of Government Place, East, to No. 16	541
Stone No. 16 is situated at the junction of Government Place, East, with Esplanade Row, thence the boundary follows the railing slong the south side of Esplanade Row to No. 17.	994
Stone No 17 is situated at the junction of Esplanade Row with Chowringhee Road thene the boundary runs to stone No 18 on the west side of Chowringhee Road.	561
Stone No. 18 is situated at the junction of Ochterlony Road with the Chowringhee Road, thence the boundary runs as before to stone marked. M.B	1.523

Stone marked M.B. is situated near the south-east corner of Monohur Dass tank thence the boundary runs as before to No. 20.	1,346
Stone No 20 is situated at the north corner of the balustrade of the Circular Road round the Outram Statue, thence the boundary passes along the east of the Outram Statue, and runs as before to No 21	497
Stone No 21 is situated at the south end of the balustrade of the Circular Road round the Outram Statue and near the north-east corner of the General's tank thence the boundary runs as before to No 22	620
Stone No 22 is situated on and at the end of the balustrade near the south-east corner	1,548
Stone No 23 is situated near the north-east corner of Elliot's tank thence the boundary crosses the Cathedral Road and runs as before to No. 24	1,060
Stone No 24 is situated at the junction of Theatre Road, thence the boundary runs as before to No 25	949
Stone No 25 is situated at about 18ft to the east of the south-east corner of the Cathedral railings, thence the boundary runs as before to No 26	595
Stone No 26 is situated at the west corner of Russa Road at its junction with Lower Circular Road, thence the boundary runs westward along the south side of Lower Circular Road to No 27	519
Stone No 27 is situated on the south side of the Lower Circular Road, thence the boundary runs westward along the south of Lower Circular Road to No 28.	795
Stone No 28 is situated on the south side of Lower Circular Road thence the boundary runs westward along the south side of Lower Circular Road to No 29.	1,328
Stone No 29 is situated at the north west corner of the General Hospital compound at the junction of Bhawanipore Road with Lower Circular Road, thence the boundary crosses Bhawbanipur	Road

Stone No. 30 is situated at the north-east corner of the Military Hospital compound on the west side of Bhawanipore Road at its junction with Lower Circular Road, thence the boundary runs along the west side of Bhawanipore Road to No. 31.	604
Stone No. 31 is situated on the west side of Ehawanipore Road about 200 yards from its junction with Lower Circular Road, thence the boundary runs along the west side of Bhawanipore Road to No. 32.	260
Stone No. 32 is situated on the west side of Bhawanipore Road at the southeast corner of the Military Hospital compound, thence the boundary follows the south wall of the Military Hospital compound to No. 33.	853
Stone No. 33 is situated at the south-west corner of the Military Hospital compound, thence the boundary follows the west wall of the Military Hospital compound to No. 34.	687
Stone No. 34 is situated at the north-west corner of the Military Hospital compound on the south side of Lower Circular Road, thence the boundary runs along the wall to No. 35.	290
Stone No. 35 is situated on the south side of Lower Circular Road close to the east gate of the Telegraph Department Store compound, thence the boundary follows the south side of the Circular Road to No 36.	542
Stone No. 36 is situated on the south side of Lower Circular Road at its junction with Belvedere Road, thence the boundary cuts the corner to No 37.	38
Stone No 37 is situtated on the east side of Belvedere Road near Lower Circular Road, thence the boundary runs along the east side of Belvedere Road to No. 38	413
Stone No 38 is situated on the east side of Belvedere Road, 15 feet from the north end of Zeerut Birdge, thence the boundary runs down to No. 39.	Varies
Stone No. 39 is situated at the low water-mark in Tolly's Nala, on the east side of Zeerut Birdge, thence the boundary follows the low water-mark of Tolly's Nala up to Kidderpore Birdge.	...

Stone No. 40 is situated at the low water-mark of Tolly's Nala on the north bank and at the west side of Kidderpore Bridge.	...
Brick pillar No. 41 is situated on the west side of Kidderpore Road, 330 feet from Kidderpore Bridge.	372
Brick pillar No. 42 is situated on the west side of St. George's Gats Road and to the north of its junction with Parsonage Road.	417
Brick pillar No. 43 is situated on the west side of St. George's Gate Road, 417 feet to the north of its junction with Parsonage Road.	283
Brick pillar No. 44 is situated on the west side of St. Geoge's Gate Road, 707 feet to the north of its junction with Parsonage Road.	305
Brick pillar No. 45 is situated on the west side of St George's Gate Road at its junction with clyde Row, thence the boundary follows the south side of Clyde Row.	404
Brick pillar No. 46 is situated on the west side of St. George's Gate Road at its junction with clyde Row, thence the bondary follows the south side of Clyde Row.	1,384
Brick pillar No. 47 is situated on the west side of Napier Road, 124 feet from the south-east corner of the compound of Marine House.	232
Brick pillar No. 48 is situated near the north-east corner of the compound of Marine House.	..
Stone No. 49 is situated at the lower water-level at the south side of Takta Ghat : from here the boundary follows the low water-mark of the river Hooghly up to No. 1 stone.	...

১০. সরকারি বর্ণনায় বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শেষকৃত্য : দুটি টাকা ও এক পেয়ালা চা

Confidential D/O No. *248 Con.*

Magistrate's house,

Alipore, the 31st July 1931.

My dear Reid,

I return herewith Ogilvie's D/O letter of the 14th instant regarding the execution of Dinesh Gupta.

2. Gupta was taken out of his cell, after the warrant had been read, at 4 A.M. by a party of European warders, who brought him to the scaffold as soon as he had poured a few pots of water over himself and changed into a pair of jail shorts. A party of Indian armed warders was drawn up in front of the scaffold. An opiate had been administered the night before, but, as he had not slept, it did not take effect and he was in full possession of his senses. Arrangements on the scaffold itself took very little time and it was barely a minute I think, before the drop fell. I am afraid I did not notice the point about adjusting the noose, but I could get the information from Patney if required. He was prevented from shouting.

3. After the body had hung for the prescribed time and an Assistant Surgeon had made the post mortem examination it was brought to the place of burning, which is a small walled enclosure within the jail, not now used. Here a pyre had been prepared with an ample supply of wood, ghee etc, and a priest and doms from the Keoratola burning ghat were in attendance. There was a little hitch at first over the ceremony of putting fire in the corpse's mouth, usually performed by the relatives. The priest at first said that he could not do this for a non-Brahmin, but he waived his objection on the promise of Rs 2/- extra and a cup of tea. The priest performed the necessary ceremonies and set the ~~fire~~ pyre alight.

4. A brother and a more distant relative turned up at the jail when the pyre had been burning about 2½ hours, and were admitted on giving undertakings to behave. When the body was finally consumed they each threw a pot of Ganges water over the ashes and retired. The ashes were then collected and put into 7 sacks, which were stored in a safe place. Great care was exercised in seeing that no ashes whatever were left about, and the place where the pyre had stood was covered over with earth.

5. The ashes were unostentatiously taken from the jail after dark that night at high tide to a motor boat waiting in the Nulla, which went straight up the Nulla into the Hooghly, where the ashes were thrown overboard in midstream by a Brahmin.

Yours sincerely,

To

R. N. Reid, Esq.,C.I.E., I. C. S.

P.S. A lock-up was maintained throughout the jail until the cremation was finished and the ashes removed, no prisoners being let out of their barracks except the cooks.

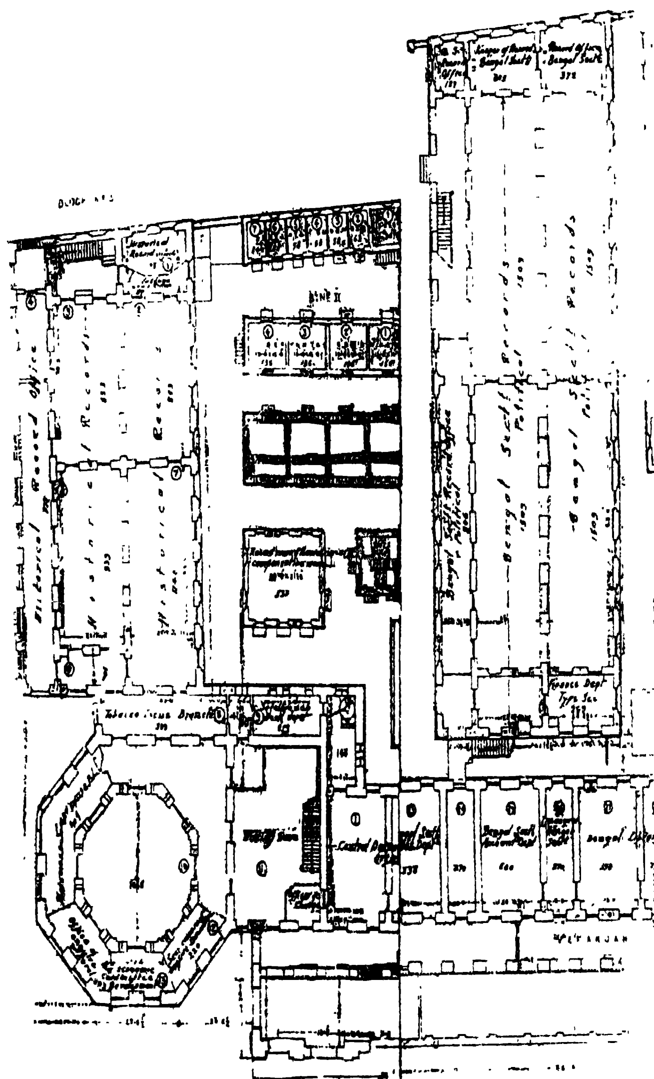
তথ্যসূত্র

রাজনৈতিক (রাজনৈতিক) দপ্তর, নথি নং ১৫, ১৯৩১

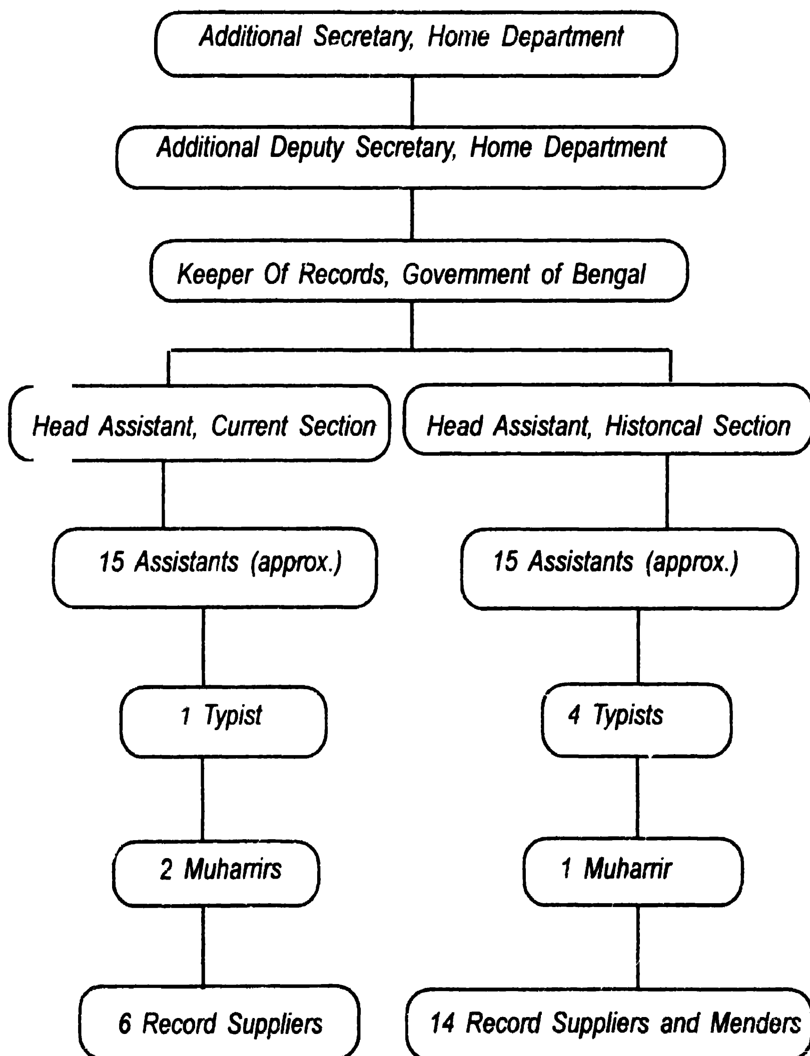
১১. মহাকরণ মানচিত্রে সচিবালয়ের রেকর্ডরুম—১৯৩৭ সাল

WRITERS' BUILDINGS, CALCUTTA
GROUND FLOOR PLAN

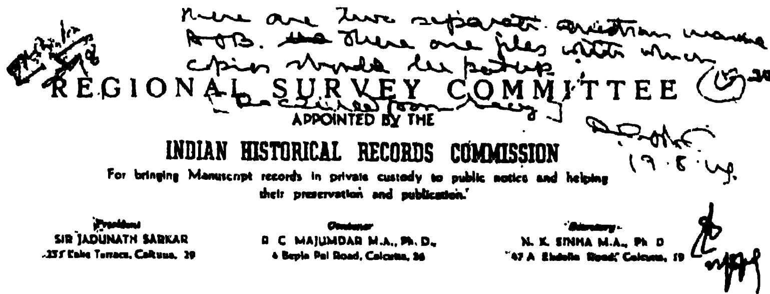
SCALE 20 FEET INCH



সাংগঠনিক কাঠামো : ১৯৪৪-এ বাংলা সচিবালয়ের মহাফেজখানা বা সরকারিভাবে 'রেকর্ড রুম' যেভাবে গড়ে উঠেছিল



১২. ঐতিহাসিক নথিপত্রের সংস্থানগত পরিবর্তনে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রস্তাব



REGIONAL SURVEY COMMITTEE

APPOINTED BY THE

INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION

For bringing Manuscript records in private custody to public notice and helping their preservation and publication.'

President	Convener	Secretary
SIR JADUNATH SARKAR	R. C. MAJUMDAR M.A., Ph. D.	N. K. SINHA M.A., Ph. D
255 Lake Terrace, Calcutta, 29	4 Bepin Pal Road, Calcutta, 26	47 A Ekdalia Road, Calcutta, 19

Ref - 15/49.

The 17th August, 1949.

To

The Secretary,
Home Department (Records), Government of West Bengal

Dear Sir,

The Regional Records Survey Committee for West Bengal, appointed by the Indian Historical Records Commission, learn with concern that it is proposed to hand over Bengal Government records upto 1834, now in the Bengal Government Record Office, to some other custody. These records, we learn, belong to the Government of India. In connection with a resolution on the centralisation of pre-Mutiny records, the President and the Secretary of the Research and Publication Committee of the Indian Historical Records Commission gave an assurance at the 8th meeting of the Research and Publication Committee that the physical transfer of provincial records to the Indian capital was not contemplated. We would be justified in thinking that the removal of these valuable papers connected with the history of Bengal from West Bengal is not under consideration.

2. We would suggest in this connection that this Committee may be put in charge of these records. We have heard that the National Library is being removed to Belvedere. If a room is set apart in this building with adequate shelf space it would be possible for the Committee to take charge of these records. The National Library has an incomparable collection of pamphlets and monographs bearing on the history of Bengal in the British period. With this library near at

PTO

-2-

hand and the records properly sorted and catalogued by us it would be possible to help materially in the furtherance of research work on the history of Bengal in the British period.

3. It would perhaps be necessary for the Government to make a small annual grant for the upkeep of these records. We feel that there is no other organisation better able to utilize these records than this Committee. The manuscripts and records in private custody collected by us could also be accommodated in this room. A very small staff consisting of one dusting bearer and one mender would perhaps be sufficient for the purpose. The watchman and the durwan of the National Library would naturally be responsible for their safety. The Director of Archives, in the course of his tours of inspection, would be able to supervise this work of the Committee.

Yours faithfully,

N K Sinha

Secretary, Regional Records Survey Committee for W. Bengal

Copy forwarded to the Director of Archives National Archives of India, New Delhi.